এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

অনুবাদ

এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর

অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট

রূপান্তর □ জাহিদ হাসান

স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং.........
তাং..../..../.....
SHAMIM

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট

ফ্রেন্ডশীপ লাইব্রেরী
স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং.........
তাং.../.../....

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

কুকুরের কান্নার মত খানিকক্ষণ একটানা শব্দ, তারপর পটপট করে কয়েকটা আওয়াজ। আবার বিমান আক্রমণ শুরু হলো নাকি, ভেবে তাড়াতাড়ি চোখ মেলতেই দেখি লম্বা আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে মুখের সামনে তুড়ি বাজাচ্ছে কাট। আমাকে চোখ মেলতে দেখে হাসল।

'আসলে মাঝে মাঝে এরকম এক-আধটু সেঁটে ঘুম দিতে পারলে যুদ্ধটাকে আর তেমন খারাপ লাগে না, কি বলো?'

হেসে সায় দিলাম ওর কথায়। আসলেই ব্যাপারটা তাই। ফ্রন্টে থাকার সময় ঘুমের চোদ্দপুরুষ ধারে কাছে আসার সুযোগ পায় না। ফ্রন্ট, সে তো এক আস্ত দোজখখানা। মাঝে মাঝে অবশ্য ওই দোজখ থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগ মেলে। এই যেমন আজকে। চোদ্দ দিন পরে বিশ্রামের পালা। ভোরবেলা চলে এসেছি ক্যাম্পে। ফ্রন্ট থেকে পাঁচ মাইল পেছনে। এসেই যে যেখানে পেরেছি, ধপাস্। এই দুপুর পর্যন্ত মরার মত ঘুমোলাম। তাকিয়ে দেখি, জেগেছি কেবল আমি আর কাট। ওপাশে, এ ওর গায়ে পা তুলে নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছে ক্রপ, মুলার, লিয়ার, জাদেন, ডেটারিং আর হাই।

আমাদের ক'জনার মধ্যে সবারই বয়স প্রায় উনিশ, শুধু ডেটারিং আর কাট ছাড়া। ওদের দু'জনেরই বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কাটের নীল চোখ, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। আমরা একবাক্যে ওকে ওস্তাদ মানি। ওর মত চালাক আর ধুরন্ধর লোক দুটো দেখিনি। সবকিছুতে দারুণ চৌকস। ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যাবে আর সবচেয়ে কম

পরিশ্রমে কি করে কাজ হাসিল করা যাবে, সেসব ওর নখদর্পণে। তবে সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ওর, সেটা হলো ফ্রন্টের অবস্থা কি করে যেন ও আগে থেকে টের পায়। ওর এই গুণের জন্যে কতবার যে বিপদ থেকে বেঁচে গেছি তা বলার নয়। ওর পুরো নাম কাটজিনস্কি, আমরা বলি কাট।

ডেটারিং যুদ্ধে আসার আগে ছিল চাষী। ওর মাথার মধ্যে চাষবাস ছাড়া আর কিছু নেই। যুদ্ধ করবে কি, সারাক্ষণ বউ আর জমির চিন্তা।

'চলো, খাবার সময় হয়ে গেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল কাট।

'হ্যাঁ, চলো, এই তোরা সব উঠলি?' হাঁক ছাড়লাম বাকিগুলোর উদ্দেশে। পাশ ফিরে শোয়া ছাড়া বিশেষ বিকার দেখা গেল না ওদের মধ্যে। পশ্চাদ্দেশে লাথি কষাতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সবাই, জাদেন ছাড়া।

'খেতে গেলাম, ও ব্যাটা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক প্রাণ ভরে।' খাবার পাত্র হাতে নিয়ে রওনা দিলাম ক্যান্টিনের দিকে। অর্ধেক রাস্তা আসতেই দেখি উদ্‌ভ্রান্তের মত 'সব বুঝি শেষ হয়ে গেল' ভাব নিয়ে ছুটে আসছে জাদেন। হাতে খাবার পাত্র।

এককালের তালার কারিগর জাদেন এখন আমাদের দু'নম্বর কোম্পানির সৈনিক। প্রথম দিনেই ওর নাম হয়ে গেছে 'নররাক্ষস'। খেতে পারে বটে, একেবারে পেট ফাটিয়ে। ওর পাকস্থলী বোধহয় কান পর্যন্ত লম্বা। দেখতে লিকলিকে, শুধু পেটটা ছাড়া। খাওয়া শেষ হলে সেটা একটা দেখার মত জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। ও যখন খেতে বসে, মনে হয় ফড়িং বসেছে একটা। খাওয়া শেষ করে যখন ওঠে তখন একেবারে নাদাপেটা কুমির। হাঁসফাঁস অবস্থা।

দু'নম্বর কোম্পানির সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে ক্যান্টিনের সামনে। একে তো খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, তার ওপর খাবারের এমন সুঘ্রাণ বেরোচ্ছে যে নাড়িভুঁড়ি একেবারে ছিঁড়ে পড়ার দশা।

লাইনে সবার আগে দাঁড়িয়েছে অ্যালবার্ট ক্রপ। ছোটখাট মানুষ, ভাবনাচিন্তা মাথায় খুব পরিষ্কার খেলে, সে জন্যেই বোধহয় ল্যান্স

কর্পোরালের ওপরে আর ওঠা হয়নি। তারপরে রয়েছে মুলার, সারাক্ষণই বইপত্র বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পিঠে। উদ্দেশ্য, যুদ্ধ থামলেই পরীক্ষা দেবে। সুযোগ পেলেই বই খুলে বসে, এমনকি ফ্রন্টেও। বৃষ্টির মত গোলা পড়ছে তার মধ্যেও সে নিউটনের সূত্র আওড়ায় বিড়বিড় করে। মাঝে মাঝে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, 'গোলার দিকে খেয়াল রাখিস, মনে রাখবি, নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুর গতিপথই একটি উপবৃত্ত।' মুলারের পেছনে লিয়ার, দাড়িটাড়ি রেখে বেশ ভারিক্কি চেহারা বানিয়েছে একখানা। ওর পেছনে আমি, পল বোমার। আমরা চারজনই একসাথে পড়তাম, একসাথে ঢুকেছি সেনাবাহিনীতে। আমার পেছনে জাদেন, তার পেছনে হাই ওয়েস্থাস। যুদ্ধে আসার আগে হাই গর্ত খুঁড়ে কাঠকয়লা তুলে বিক্রি করত। ওর হাতের থাবা এত বড় যে আস্ত একটা পাউরুটি হাতের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বলে, 'বল তো আমার হাতের মধ্যে কি?' ওর পরে দাঁড়িয়েছে ডেটারিং, তারপরে আমাদের ওস্তাদ কাট।

বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি ক্যান্টিনের সামনে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। ওদিকে খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হবার জোগাড়। বাবুর্চি ব্যাটা বসে বসে ঝিমোচ্ছে তো ঝিমোচ্ছেই। শেষ পর্যন্ত পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল কাট, 'ওহে হাইনরিখ, তোমার তরকারির ডেকচিটা নামাও এবার, মাংস মটরশুঁটি যে গলে হালুয়া হয়ে গেল!'

'উঁ, কি বললে,' দয়া করে যেন শুনছে এমন একটা ভাব নিয়ে আধখানা চোখ মেলল হাইনরিখ, 'হুঁ, তা সবাই আগে আসুক।'

'এসে গেছি সবাই,' জাদেন ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল।

'তুমি যে এসেছ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বাকি সবাই আসুক।'

'বাকি সবাই তোমার ঘ্যাঁট খেতে আর আসছে না আজকে, জনাকয় হাসপাতালের অতিথি আজ, বাকিগুলোর হাড় থেকে এতক্ষণে ঘাস গজিয়ে গেছে।'

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই হকচকিয়ে গেল হাইনরিখ জিনজার, 'এদিকে আমি যে দেড়শো জনের রান্না করে বসে আছি।'

'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না,' জিনজারের পেটে খোঁচা মেরে

বলল ক্রুপ, 'নাও তাড়াতাড়ি শুরু করো, প্রাণভরে খেয়ে নিই একদিন।'

জাদেনের দিকে তাকিয়ে দেখি হাসিটা দু'কানে গিয়ে ঠেকেছে, ইঁদুরের মত চকচক করছে চোখমুখ। উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে তোমার কাছে দেড়শো জনের জন্যে রুটিও আছে?'

বোকার মত ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল জিনজার।

'আর সসেজ?'

'হ্যাঁ।'

'তামাকও?' এবার জাদেনের গলা ভেঙে গেল আনন্দে।

'হ্যাঁ।'

'ইয়াহ্ হু,' খুশিতে নাচতে শুরু করল জাদেন, 'সবার জন্যে ডবল খাবার আজকে।'

এতক্ষণে জাদেনের খুশির কারণটা বুঝল জিনজার। কড়া গলায় বলল, 'জ্বি না, স্যার, সেটি হচ্ছে না।'

'কি, এতবড় কথা,' আমরা ঘিরে ধরলাম ওকে, 'কেন হবে না, বুড়ামিয়া?'

'দেড়শো জনের খাবার আশি জনে খেতে পারে না।'

'পারে কি পারে না দেখাচ্ছি তোমাকে।'

'ঠিক আছে সুপটা নিতে পারো পুরোটাই কিন্তু বাকি জিনিসপত্র আশিজনের মত নিতে হবে।'

এবারে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল কাট, 'একদিনের জন্যে হলেও হাতের মুঠিটা একটু খোলো। তুমি কি আশিজনের রেশন এনেছ নাকি? এনেছ দুই নম্বর কোম্পানির জন্যে। এবার ভাল করে চোখ মেলে দেখো, আমরাই দুই নম্বর কোম্পানি। সুতরাং এবার সুড়সুড় করে খাবারগুলো ছাড়ো দেখি! খিদেয় মারা যাবার অবস্থা!'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল ধাক্কাধাক্কি। ভিড়ের জন্যে যারা দূরে পড়ে গেছে তারাও প্রাণপণে উৎসাহ দিচ্ছে, 'লাগাও, লাগাও কষে, ওর পেট ফুটো করে দাও। ব্যাটা খাবার দেবে না!'

ওর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই কারও। থাকার কথাও নয়। ফ্রন্টে খিদেয় যখন পেট জ্বলেপুড়ে ছারখার হবার দশা, তখন জিনজারের নামে গালাগাল শুনলে ওর চোদ্দপুরুষ কবর ছেড়ে উঠে আসত। ওর গাফিলতির জন্যেই খাবার ঠিকমত পৌঁছোয় না, পৌঁছল তো ঠাণ্ডা বরফ। ওর কাজ হচ্ছে ফ্রন্টের যতটা সম্ভব কাছাকাছি খাবার পৌঁছে দেয়া। কিন্তু ব্যাটা একটা ভিতুর ডিম। কামানের পাল্লার অন্তত আধমাইল দূরে থাকবে। কাজেই আমাদের কোম্পানির লোককে ছুটতে হয় অনেক দূরে। বাবুর্চি বটে এক নম্বর কোম্পানির।

কয়ে দু'ঘা দেবার পাঁয়তারা শেষ হবার আগেই শোনা গেল, 'কি ব্যাপার, কি হচ্ছে ওখানে?' ফিরে তাকালাম সবাই। দেখি আমাদের লেফটেন্যান্ট। তাড়াতাড়ি সরে এলাম। জিনজার ওদিকে পোশাক টোশাক ঠিক করায় ব্যস্ত।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

খুলে বললাম সবই, এই এই ব্যাপার।

'তা ঠিক, কালকে আমাদের ক্ষতি হয়েছে খুব।' জিনজারের দিকে ফিরল লেফটেন্যান্ট, 'ঢাকনাটা একটু সরাও।' জিনজার ঢাকনাটা সরিয়ে নিতেই উঁকি দিল লেফটেন্যান্ট, 'বাহ্ চমৎকার দেখাচ্ছে তো সুপটা!'

'দেখাবে না, মাংস আর চর্বি দিয়ে রান্না করা হলে চমৎকার না দেখিয়ে যাবে কোথায়,' ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল জাদেন। মিটিমিটি হাসল লেফটেন্যান্ট। পরিষ্কার বুঝল আমাদের মতলবটা কি। আর না জানার কথাও নয়। আমাদের মত সৈনিক থেকেই লেফটেন্যান্ট হয়েছে সে।

দু'পা হেঁটে ডেকচির কাছে এসে ঢাকনা সরিয়ে দু'বার ঘ্রাণ নিল লেফটেন্যান্ট। তারপর বলল, 'বাহ, বেশ খোশবু ছুটেছে তো! বেশ ভাল করে এক প্লেট পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আর যা আছে দিয়ে দাও সব। অনেকদিন না খেয়ে আছি আমরা।'

ভ্যাবলাকান্তের মত জিনজার শুধু বলল, 'জ্বি, স্যার।'

লেফটেন্যান্ট চলে যেতেই আমরা ঘিরে ধরলাম ওকে, 'দাও, দাও, তাড়াতাড়ি দাও। মুখখানা প্যাঁচার মত করে রেখেছ কেন, তোমার গাঁট থেকে দিতে হচ্ছে নাকি? ভাবখানা যেন স্টোর তোমার বাবার সম্পত্তি!'

জাদেন এর মধ্যে এক চামচ সুপ নিয়ে এসেছে। জিনজারের কাছে গিয়ে বলল, 'নাও, খেয়েই দেখো না, চমৎকার স্বাদ হয়েছে!'

জিনজার এক ঝটকায় সরিয়ে দিল ওর হাত। আর একটু হলেই স্যুপ ছিটকে জাদেনের জামায় পড়েছিল আর কি।

'দাও, তোমাদের পাত্রগুলো দিতে থাকো,' মুখখানা হাঁড়ির মত করে বলল জিনজার।

শেষ পর্যন্ত রাগের চোটে খাবার যা প্রাপ্য ছিল তা তো দিলই আরও আধ পাউণ্ড করে মধু দিয়ে দিল সবাইকে। ভাবখানা এমন যেন 'এসব আমার কাছে কিছুই না'।

'তোমার নিজের জন্যে কিছু রেখেছ তো?' ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল জাদেন, 'না থাকলে আমার কাছ থেকে খানিকটা ধার নিতে পারো।'

ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করল জিনজার।

এরই মধ্যে বাটি ভর্তি করে বারতিনেক নেয়া হয়ে গিয়েছে। এমন ঠেসে খেয়েছি যে পেটে একটা মটরশুঁটি রাখারও জায়গা নেই। জাদেন আর মুলার কোথা থেকে একটা বড়সড়ো হাত ধোয়ার গামলা জোগাড় করে এনেছে, জিনজার সেটাও ভর্তি করে দিয়েছে। ওটা নিয়ে এখনও মুখ চালাচ্ছে দু'জন। জাদেন খাচ্ছে ওর কান পর্যন্ত পাকস্থলী এখনও ভরেনি বলে আর মুলার খাচ্ছে 'ভবিষ্যতে কখন দুর্ভিক্ষ পড়ে যায়, কে জানে' মনে করে।

ওদিকে জিনজার পড়েছে বিপদে। ব্যাটা প্রথমে বাড়তি খাবারটুকু দিতে চায়নি, এখন ভেবেই পাচ্ছে না ডেকচি খালি করবে কি করে। ডেকচি খালি না হলে কফি তৈরি করতে পারছে না। তাই খানিকক্ষণ পর পরই চেঁচাচ্ছে, 'সুপ শেষ হয়ে গেল, আর লাগবে নাকি কারও?' গত

আধ ঘণ্টা ধরে ওর এই চেঁচানি শুনছি।

আমাদের খাবার ভাগ্য খুলে যাবার কারণ হচ্ছে, গতকাল আমাদের ক্ষয়ক্ষতিটা খুব বেশি হয়ে গেছে। না হলে আমাদের প্রুশিয়ানদের অত শখ নেই যে এমন জামাই আদরে খাওয়াবে। কালকে ফ্রন্টে ছিলাম মোট দেড়শো জন। মাঝরাতের পর থেকে বৃটিশদের এমন ভারি গোলাবর্ষণ আর বোমাবৃষ্টি শুরু হলো যে একেবারে সপ্তনরক ভেঙে পড়ল মাথায়। কোনরকমে যে যেভাবে পারে গোলার গর্তে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেঞ্চে ঘাড় গুঁজে কাটিয়ে দিলাম সময়টা। ফেরার পর গুণে দেখা গেল আশিজন মাত্র অক্ষত, বাকিদের কিছু হাসপাতালে। অন্যরা খতম।

এমন ভরপেট খাওয়ার পর শরীর কি আর চলতে চায়! কোনরকমে গড়াতে গড়াতে শোবার খাটিয়া পর্যন্ত পৌঁছেই ধপাস। কাট একটা চুরুট ধরিয়ে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছে। ওর দেখাদেখি আমরা সবাই সিগারেট ধরালাম। আজ প্রাণভরে ধোঁয়া ছাড়া যাবে। সব কিছুর বরাদ্দ আজ ডবল। দশটা মোটা চুরুট, কুড়িটা সিগারেট আর দু'পাতা তামাক। কাটের সিগারেটের সঙ্গে আমার তামাক পাতা বদলাবদলি করেছি। এখন সারাদিন ধরে ফুঁকলেও সিগারেটগুলো ধ্বংস করতে পারব না।

'আহ্, ঘুম নামছে দু'চোখ ভরে।' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমে একেবারে বিকেল।

চমৎকার কাটল দিনটা। পেটপুরে খাওয়া আর টানা ঘুম দেবার পর শরীর মন একেবারে ঝরঝরে লাগছে। তার ওপর আজকের ডাকে প্রায় সবারই কিছু না কিছু এসেছে। আমাদের থাকার ঘরগুলোর পেছন দিকে একটুখানি ঝোপে ছাওয়া জায়গা, যখন ক্যাম্পে থাকি ওখানেই বসি বিকেল হলে। হাত-পা ছড়িয়ে পপলার গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সবাই চিঠি আর পুরানো কাগজ পড়ছি। ইস্পাতের মত নীলচে আকাশ, মাঝে মাঝে বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা ফাটার সাদা ছোপ, বাতাস বইছে মৃদু মৃদু, পপলারের পাতার ঝিরিঝিরি শব্দ, ডেইজী ফুলগুলো হাসছে বাতাসে। উদাস হয়ে গেল মনটা। বাড়ির কথা মনে পড়ল

আমার।

'নে তাস পেটাই।'

দেখি ক্রপ এক প্যাকেট তাস আর বড়সড়ো একটা গামলা নিয়ে এসেছে ক্যাম্প থেকে। গামলাটাকে উল্টো করে ফেলে চমৎকার টেবিল বানিয়ে ফেললাম আমরা। তাস পেটালাম বেশ খানিকক্ষণ। ক্যাম্পে অ্যাকর্ডিয়নে করুণ সুর বাজাচ্ছে কে যেন, উদাস করা সুর।

মুলার বলল, 'বাদ দে, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে।'

আবার সবাই চুপচাপ। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রপ বলল, 'জানিস, কালকে আর একটু হলেই হয়েছিল…।'

আর কিছু বলে না ও। আমরাও জিজ্ঞেস করি না। জানি তো কি হতে যাচ্ছিল। সে তো আমাদের সবারই জানা। এই যে হাসছি, গল্প করছি, কালকেই বেঁচে থাকব কিনা কে জানে। কিংবা যার সাথে কথা বলছি ওকেই দেখব কিনা তারও তো ঠিক নেই। সবারই কোন না কোনদিন 'আর একটু হলেই গিয়েছিল।'

অ্যাকর্ডিয়নের করুণ সুর কেঁদে কেঁদে ফিরছে। এক নিমেষে মন চলে গেল বাড়িতে। মা হয়তো জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে চেয়ে। আমার বয়সী কাউকে দেখলেই ভাল করে খেয়াল করছে 'আমার পল না তো?' মা, মাগো, আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই মা! আবার তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোতে চাই।

'কেমারিখকে তারপরে কেউ দেখেছ?' ক্রপের কথায় ঘোর ভাঙল আমার। বললাম, 'ও তো সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে।'

'উরুতে সাংঘাতিক রকমের ঘা খেয়েছে, মনে হচ্ছে অবস্থা বেশ খারাপ।'

'চল তাহলে, দেখে আসি ওকে।'

'চল।'

'দাঁড়া,' ক্রপ পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল, 'ক্যান্টোরেকের চিঠি, লিখেছে কি শোন, "তোমাদেরকে অন্তর থেকে আশীর্বাদ করছি",

আর শুনবি?'

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লাম সবাই। মুলার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ব্যাটাকে পাই একবার এখানে। তারপর দেখব আশীর্বাদ কোথা থেকে আসে!'

ক্যান্টোরেক ছিল আমাদের স্কুলমাস্টার। টেনে টুনে সাড়ে চার ফুট উঁচু এক বেঁটে বামুন, ইঁদুরের মত মুখ আর কুতকুতে চোখ। সারাক্ষণ একটা ধূসর রং-এর কোট পরে থাকে। দেখতে অনেকটা আমাদের 'ক্লুসটারবার্গের আতঙ্ক' কর্পোরাল হিমেলস্টোস-এর মত। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে শুরু হলো তার বক্তৃতা। রোজ ড্রিলের সময়। গোল চশমার ভেতর দিয়ে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে গলায় যতটা সম্ভব আবেগ এনে বলত, 'তরুণ বন্ধুরা আমার, পিতৃভূমির এই চরম সঙ্কটলগ্নে তোমরা কি তার আহ্বানে সাড়া দেবে না?' ওর বক্তৃতা শুনতে শুনতে এমন বিরক্ত হয়ে গেলাম যে, ওর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই একদিন সবাই জেলা কম্যাণ্ড্যান্টের কাছে গিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্যে নাম লিখিয়ে ফেললাম। এখন বুঝি, এই লোকগুলো সব ধরনের কথাবার্তা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যখন যেটা দরকার সুড়ৎ করে টেনে বের করে। কথাটা বুঝলাম, কিন্তু একটু দেরিতে। আমাদের মধ্যে ঘরকুনো পিটার বেম নাম লেখাতে চায়নি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে রাজি হতেই হলো। না হয়ে কি করবে, তখন এমন একটা সময় ছিল যে ও রাজি না হলে ওর বাড়ির লোকেরাই ওকে বলত 'কাপুরুষ, ভিতুর ডিম, পড়াশোনা বাদ দিয়ে বরং কাপড়-চোপড় পরিষ্কার কর গিয়ে।' কিন্তু একবারও কেউ ভেবে দেখল না, এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে কোন নরকে ঠেলে দেয়া হলো, এদের ভবিষ্যৎ কি। আসলে যারা সবচেয়ে ভাল বুঝত সেই গরীব লোকেরা ধরেই নিয়েছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার প্রাণ যাবেই। আর ধনী লোকগুলো তো যুদ্ধ বাধতে দেখে আহ্লাদে আটখানা। তাদের কোটিপতি হওয়া এবার ঠেকায় কে!

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের মধ্যে বেমই মারা গেল সবার আগে। চোখে আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল। আমাদের তখন

লেজে গোবরে অবস্থা। কোনরকমে ট্রেঞ্চে ফিরতে পারলে বাঁচি। সেজন্যে আহত কাউকে তুলে আনতেও পারিনি। অনেকক্ষণ পর ট্রেঞ্চে বসে শুনতে পেলাম মানুষের আর্তনাদ। খানিকক্ষণ শুনেই বুঝলাম ওটা বেমের গলা। কাতর গলায় ডাকছে আমাদের। দু'পক্ষের মাঝামাঝি জায়গা থেকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। একে তো দেখতে পাচ্ছে না, তার ওপর চোখের যন্ত্রণায় একেবারে দিশেহারা, ফলে যা হবার তা-ই হলো, চোখে পড়ে গেল ইংরেজদের। এমন চমৎকার টার্গেট মিস করার প্রশ্নই আসে না। ওখানেই খতম।

কিন্তু এর জন্যে তো ক্যান্টোরেককে দোষ দিতে পারলাম না আমরা। দিই কি করে, এই পৃথিবীতে এমন হাজার হাজার ক্যান্টোরেক আছে যারা সারাক্ষণ বলে বেড়াচ্ছে তারা যা করছে তার চেয়ে ভাল আর কেউ করতে পারবে না। আর বলতে তাদের বাধা নেই, বলতে তো আর নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না!

ভাবতে অবাক লাগে আড়ালে আবডালে ঠাট্টা করলেও মনে মনে কি শ্রদ্ধাই না করতাম ওদের। ওদের দেয়া রঙিন স্বপ্নের বেলুন এক নিমেষে চুপসে গেল যেদিন গোলা বৃষ্টির চোটে নরক ভেঙে পড়ল আমাদের ওপর, যখন এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমার পাশের জনকে একটা রক্তমাংসের দলা পাকিয়ে যেতে দেখলাম। আর কি সুন্দর সুন্দর কথাই না শেখাত ওরা, 'সাহস, কর্তব্যবোধ, দেশপ্রেমের চেয়ে বড় কিছু নেই।' ফুঃ, যত্তসব কথার ফানুস, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে বড় কিছু নেই।

আসলে আমরা এখন বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ, জীবন আর আমাদের জন্যে নয়।

কেমারিখকে দেখতে যাবার আগে ওর জিনিসগুলো গুছিয়ে নিলাম। হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় ওর কাজে লাগবে ওগুলো।

হাসপাতালে ঢুকতেই কার্বলিক, পুঁজ আর ঘামের গন্ধে বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে উঠল। ওয়াক করে বমি করে ফেলব মনে হলো। কোনরকমে নাকে রুমাল চেপে ভেতরে ঢুকে খোঁজ করলাম কেমারিখের। একজন

আর্দালির বর্ণনা অনুযায়ী কেমারিখের বেড খুঁজে বের করলাম। আমাদের দেখে ওর ফ্যাকাসে মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর মুখে যন্ত্রণা আর হতাশার ছাপ। মুখটা কাঁদো কাঁদো করে যেন অভিযোগ জানাচ্ছে এমন করে বলল, 'জানিস, আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, কোন শয়তান মেরে দিয়েছে ওটা।'

'তোকে আগেই বলেছিলাম অত দামী ঘড়ি নিয়ে আসিস না,' সাথে সাথে বলে উঠল মুলার। মুলারটা আস্ত একটা গবেট। এখন এভাবে কথা বলতে হয় নাকি? কেমারিখকে ভাল করে খেয়াল করলে যে কেউ বুঝবে ওর সময় শেষ হয়ে এসেছে। এখন ঘড়ি থাক বা না থাক কিছু এসে যায় না তাতে। বড়জোর বন্ধু বা আপনজন কাউকে দিয়ে যেতে পারত ঘড়িটা।

ক্রপ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস, ফ্রাঞ্জ?'

'খুব খারাপ না,' কেমারিখ দুর্বল ভাবে বলল, 'কিন্তু পায়ের ব্যথায় মরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়বে।' বলেই চোখ বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। চোখমুখ কুঁচকে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করতে দেখে কখন যে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছি খেয়ালই করিনি। ব্যথা লাগতেই দাঁতের চাপ আলগা করলাম।

বিছানার চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা ওর। হাত বের করে রেখেছে বাইরে। শাদা হয়ে গিয়েছে হাতদুটো। পায়ের কাছে চাদরটা উঁচু হয়ে আছে। নিচে তারের জাল দিয়ে একটা ছাউনিমত করে রাখা।

'তোর পা...,' মুলার কথা শুরু করতেই এক লাথি লাগালাম ওর গোড়ালিতে। ব্যাটা গর্দভ একটা, আমার দিকে তাকাতেই কেমারিখকে আড়াল করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলাম। লজ্জিত একটা হাসি দিল মুলার। কেমারিখের দিকে ফিরে বলল, 'চিন্তা করিস না, তোর পায়ের ব্যথা শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে।'

কেমারিখের একটা পা কেটে ফেলা হয়েছে।

কেমারিখের মুখখানা হলদে আর ফ্যাকাসে, চোখ গর্তে বসে গেছে। মনে হচ্ছে একটা কোঁচকানো কাগজ যেন ওর মুখে সেঁটে দেয়া হয়েছে।

চামড়ার নিচে আর যেন জীবনের স্পন্দন নেই, শুধু দেহটা টিকে আছে কোনরকমে, মৃত্যুর বিজয়ী হাসি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কেমারিখের চোখে। হুহু করে উঠল বুকের মধ্যে। গলার কাছে শক্ত হয়ে উঠল কি যেন। গতকালই ও আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, ট্রেঞ্চে কাটিয়েছে, কাড়াকাড়ি করে ঘোড়ার মাংস ঝলসে খেয়েছে, একটু পরেই ও থাকবে না আর।

মনে পড়ল আমরা যেদিন রওনা দিয়েছিলাম বাড়ি থেকে সেদিনের কথা। সবারই আত্মীয়-স্বজন এসেছিল বিদায় জানাতে। ওর মা এসেছিল স্টেশনে, মোটাসোটা গোলগাল এক মহিলা। কাঁদতে কাঁদতে শাদা হয়ে গিয়েছিল গালদুটো। এদিকে মায়ের অত কান্না দেখে কেমারিখ তো লজ্জায় লাল। বারদুই মৃদু ধমকও দিল মাকে। কিন্তু তাতে কি আর কান্না থামে! অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, মনে মনে চাইছে তাড়াতাড়ি ট্রেনটা ছাড়ুক। হঠাৎ ওর মায়ের চোখ পড়ল আমার ওপর। ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসেই হাত চেপে ধরলেন, 'বলো, বাবা, আমার কেমারিখকে দেখে রাখবে তুমি, বলো, কথা দাও।' তাঁর শিশুর মত সরল মুখ দেখে বললাম, 'আচ্ছা, রাখব।'

যুদ্ধে কে কাকে দেখে রাখে কিংবা দেখে রাখতে পারে!

'এখন তুই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারবি,' ক্রপ বলল, 'না হলে আরও তিন চার মাসের আগে যেতে পারতি না।'

কেমারিখ একটুখানি মাথা নাড়ল শুধু, কিছু বলল না। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি মোমের মত শাদা। নখের মধ্যে পরিষ্কার কালো মাটি, কালো বিষ মনে হলো আমার কাছে। হঠাৎ করেই মনে পড়ল, ও মারা যাবার পরও ওর হাত-পায়ের নখগুলো আরও কিছুদিন ধরে বড় হতে থাকবে। চুলগুলোও। শিরশির করে উঠল শরীরের ভেতর। হাতের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল একসাথে।

মুল্যার ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'তোর জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছি, কোন অসুবিধে হবে না।'

কেমারিখ চোখ মেলল, দুর্বল গলায় বলল, 'এই দিকে, খাটের নিচে রাখ।'

মুলার ওর মাথার ওপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে জিনিসগুলো রেখে দিল।

'আমার ঘড়িটা যে হারিয়ে গেল,' হতাশভাবে বলল কেমারিখ। আবার ওর ঘড়ির কথা মনে পড়েছে। কি বলে যে সান্ত্বনা দিই এখন!

'চিন্তা করিস না, আমরা খোঁজ করে দেখি, পেয়ে যাব আশা করি।'

মুলার খাটের এপাশ থেকে কেমারিখের বুটজোড়া বের করল। চমৎকার জিনিস। নরম হলদে চামড়া, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। ফিতেও বাঁধতে হয় হাঁটু পর্যন্ত। একবার দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কেমারিখ এটা জোগাড় করেছিল এক মৃত ইংরেজ পাইলটের কাছ থেকে। আর ওর এমন ভাগ্য যে ওর পায়ে ঠিক ঠিক লেগে গেল বুটজোড়া।

মুলার বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁট চাটল, নিজের শতছিন্ন বুটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসেব কষে নিল, তারপর বলল, 'তুই তোর বুট বাড়িতে নিয়ে যাবি, তাই না?'

কেমারিখ কিছু বলল না, সেই মুহূর্তে আমরা সবাই একই কথা ভাবছিলাম, ও-তো এখন বড়জোর একটা বুট পরতে পারবে, আর ও মারা গেলে সাথে সাথে আর্দালিগুলো বুটজোড়া গায়েব করে দেবে।

'তুই বরং ওগুলো আমাদের দিয়ে যাস, অ্যাঁ?' কেমারিখ কিছু বলল না, মুলারের বুটের আশা তবু যায় না, 'ঠিক আছে এমনি না দিলে বদলাবদলি করে নিস, এখানে যারা থাকবে ওদের তো বেশি কাজে লাগবে। আবার যখন তুই ফিরে...,' বলেই থেমে গেল ও। খটাস করে গাঁট্টা লাগালাম ওর মাথায়। ব্যাটার বুদ্ধিশুদ্ধি বলে যদি কিছু থাকে! বিরস বদনে বুটটা জায়গামত রেখে দিল মুলার।

'যাইরে, কাল আসব আবার।'

'আমিও আসব,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল মুলার। ওর মাথার মধ্যে এখন ওই বুট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ওর ভয় যে শেষ মুহূর্তে যদি কেমারিখের কাছে থাকতে না পারে তাহলে আর্দালি ব্যাটা মেরে দেবে ওগুলো।

কেমারিখ তাকাল শুধু, ছলছল করে উঠল চোখ দুটো। তারপর চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমরা বাইরে আসবার আগেই ওর গোঙানি

শুনতে পেলাম।

'চল্ তো, একটা আর্দালিকে ধরি,' বাইরে বেরিয়েই বললাম আমি, 'কেমারিখকে মরফিয়া দেবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

খুঁজে পেতে একজন আর্দালিকে বের করলাম, 'শোনো তো, ভাই, একজনকে মরফিয়া দিতে হবে, একটু ব্যবস্থা করো।'

'ওসব হবে টবে না, মরফিয়া পাব কোথায়, সবাইকে দিতে হলে এক বালতি মরফিয়া লাগবে।'

খেপে উঠল ক্রপ, 'তা আর হবে কেন, আমরা বলছি, তাই মরফিয়া নেই, একজন অফিসার বললে এতক্ষণে হুজুর হুজুর করে ছোটাছুটি শুরু করে দিতে। তোমরা তো শক্তের ভক্ত, নরমের যম।'

'থাম তুই,' ধমক দিলাম ওকে, 'নাও, সিগারেট খাও,' আর্দালির হাতে জোর করেই সিগারেট গুঁজে দিলাম একটা। আর্দালি সিগারেটটা ঠোঁটে লাগাতেই আগুন ধরিয়ে দিলাম ওটাতে।

'তা, ভাই, মরফিয়া দেবার নিয়ম আছে তো?'

'আছে কি না আছে সে তো ভাল করেই জানো।'

'আরে, ভাই, রাগ করো কেন,' গলা দিয়ে যেন মধু ঝরে পড়ছে এমন করে বললাম, 'নাও, এই সিগারেটগুলো রাখো। পরে আবার কোথায় পাবে? তা এক ডোজ মরফিয়া দিয়ে এসো না!'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

আর্দালি রওনা দিতেই পেছনে পেছনে রওনা হলো ক্রপ।

'বুটটা কিন্তু আমার পায়ে ঠিক ঠিক হত,' মুলার আবার আক্ষেপ শুরু করল, 'এগুলোর যা অবস্থা, রোজ পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। আচ্ছা, কালকে ড্রিলের পর আমরা আসা পর্যন্ত কি ও বেঁচে থাকবে? রাতেই যদি মরে যায় তো গেল বুটগুলো।'

ক্রপকে দেখা গেল দরজায়। কাছে এসে বলল, 'দিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়বে একটু পরেই। আচ্ছা ওর কি কোন আশা...।'

'কোন আশা নেই,' ক্রপ শেষ করবার আগেই উত্তরটা দিয়ে দিল মুলার।

হঠাৎ মনে পড়ল কেমারিখের মায়ের কাছে চিঠি লিখতে হবে আমাকেই। হাত-পা জমে গেল আমার। লিখব কি করে! নাহ্, এমনি এমনি কিছুতেই পারব না। প্রচুর পরিমাণে মদ গিলে তবেই হয়তো লিখতে পারব। শুধু পারব নয়, পারতেই হবে আমাকে।

বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল থেকে। গম্ভীর সবাই। কচি কচি ঘাস বাতাসে দুলছে একটু করে। ডেইজি ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি উড়ছে এ ফুল থেকে ও ফুলে। মুলার একগোছা কচি ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে থুঃ থুঃ করে ফেলল বারকয়েক। হঠাৎ ক্রপ ওর সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। নিষ্ফল ক্রোধে কাছের গাছগুলোতে লাথি কষাল প্রাণপণে, 'জাহান্নামে যাক সব। সব জাহান্নামে যাক।'

আমরা কিচ্ছু বললাম না। সবাই জানি, এ মুহূর্তে ও আর স্বাভাবিক নেই। ওর মনের মধ্যে এখন ক্রোধ, অসহায়তা, মৃত্যু, বিষণ্ণতা একসাথে ঘুরছে। ফ্রন্টে যারা আছি তাদের কখনও না কখনও হবেই এরকম। এ থেকে মুক্তি নেই কারও।

ক্যাম্পের দিকে হাঁটা দিয়েছি আমরা। খানিকক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল ক্রপ।

'ক্যান্টোরেক আর কি লিখেছে রে,' জিজ্ঞেস করল মুলার।

'লিখেছে আমরা দেশের গর্ব। সব ইস্পাতের মত নওজোয়ান।'

একসাথে হেসে উঠলাম তিনজনে, 'ইস্পাতের মত, তারপরে আবার নওজোয়ান?' হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম প্রায়। রাগ, দুঃখ, হতাশা একসাথে প্রকাশ পেল সে হাসিতে।

'ব্যাটাকে কাছে পেলে হত,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ক্রপ, 'নওজোয়ান কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।'

বয়স আমাদের কুড়িও হয়নি কিন্তু আমরা যে যুদ্ধে এসেছি। যুদ্ধ ওলট পালট করে দিয়েছে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ। আমরা যেন এখন বৃদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নই। কথাটা অনুভব করতেই শির শির করে মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল।

দুই

ভাবতে অবাক লাগে বাড়িতে থাকতে আমি বইপত্র পড়তাম। আমার টেবিলের ড্রয়ারে এখনও কবিতা আর নাটকের বই অর্ধেক পড়া অবস্থায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ভাবি সেই জীবনের কথা কিন্তু কিছুতেই আমার সাথে মেলাতে পারি না। সবকিছু অরাস্তব মনে হয়। আসলে যেদিন থেকে যুদ্ধে এসেছি সেদিন থেকেই মুছে গেছে আমাদের অতীত। কি ছিল আমাদের? আমাদের বয়স ছিল মাত্র আঠারো কি উনিশ। জীবনের কি-ই বা দেখেছিলাম আমরা। এমনই বয়স তখন আমাদের যে এই বয়সে বাবা-মার টানও বেশি থাকে না। স্কুল, খেলাধুলা, স্ট্যাম্প জমানো, ছোটখাটো কোন শখ এইসব ছাড়া তো আর কিছু ভাবা হয়নি কখনও। অথচ বুড়োদের কি নেই! ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি আছে, বউ, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী আছে, আশা আছে, ভালবাসা আছে, অবশিষ্ট ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। যুদ্ধটা তাদের জন্যে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মধ্যে খানিকটা ব্যতিক্রম। যুদ্ধ শেষ হলেই আবার তারা ফিরে যাবে আগের জীবনে। কিন্তু আমরা? আমরা যাব কোথায়? জীবনের মাটিতে শেকড় নামাবার আগেই মুছে গেছে আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতি। যুদ্ধ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, মুছে ফেলেছে সব। আমরা এখন পতিত জমি ছাড়া কিছুই নই। জীবনের ফুল আর ফুটবে না কোনদিন। আমরা জানি না এর শেষ কোথায়, কোথায় ভেসে যাচ্ছি আমরা।

যুদ্ধে এসে আমাদের স্বাভাবিক মূল্যবোধগুলো কি আশ্চর্যজনকভাবেই না

বদলে গেছে। এই যে মুলার কেমারিখের বুটজোড়ার জন্যে হাপিত্যেশ করছে, দুশ্চিন্তায় আছে যে আমরা কেউ না থাকা অবস্থায় ও মারা গেলে বুটজোড়া হাতছাড়া হয়ে যাবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু এখন ভাবছে বলেই যে ও খুব নিষ্ঠুর মোটেই তা নয়। দরকার পড়লে ও বরং খালি পায়ে কাঁটাতারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, তবু যতক্ষণ কেমারিখের কাজে লাগবে ততক্ষণ ওর বুটের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ওর কথাবার্তা একেবারেই সোজা সাপটা। কেমারিখ মরবেই, বেঁচে থাকলেও ওই বুট ওর কোন কাজে লাগবে না। তার ওপর মৃত্যুর পরে ওর বুট কে পায়ে দিচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? সুতরাং ওটা যদি সে নেয় তাতে দোষের কি? হাসপাতালের আর্দালির চেয়ে ওর দরকার অনেক বেশি, দাবিও অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় কথা যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবই একমাত্র সত্যি। ঠুনকো আবেগ নিয়ে যুদ্ধ চলে না। যুদ্ধক্ষেত্রে একজোড়া ভাল বুট, তার ওপর আবার ঠিক ঠিক মাপের, অত সহজে পাওয়া যায় না।

ক্যান্টোরেকের বক্তৃতার চোটে আমরা ক্লাসসুদ্ধ সবাই যেদিন যুদ্ধে যাবার জন্যে একসাথে জেলা কম্যাণ্ড্যান্টের কাছে নাম লেখালাম সেদিন ছিলাম মোট কুড়িজন। ভারিক্কি ভাব দেখানোর জন্যে সেদিন প্রথম দাড়ি কামিয়ে এসেছিল কয়েকজন। এখনও মনে পড়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে আছি কুড়িজন, টগবগ করছি উত্তেজনায়। বাব্বাহ্, যা-তা ব্যাপার নয়, সত্যিকারের যুদ্ধে যাচ্ছি। মনের মধ্যে কত রোমান্টিক স্বপ্ন, এটা করব, ওটা করব, প্রাণ থাকতে পিছু হটব না এক ইঞ্চি, বন্দুক ঘাড়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াব, আমার বীরত্বের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে, লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে, এই সেই বীর যার জন্যে অমুক যুদ্ধ জয় করেছি, আরও কত কি। ভবিষ্যতে কি হবে সে ভাবনা একবারের জন্যেও মাথায় আসেনি। তখন 'যুদ্ধে যাচ্ছি' এর চেয়ে বড় ব্যাপার কিছু আর ছিল না।

জেলা কম্যাণ্ড্যান্টের কাছে নাম লেখাবার পর আমাদের পাঠানো হলো ক্যাম্পে। দশ সপ্তাহ ধরে ট্রেনিং চলল আমাদের। আর এই দশ

সপ্তাহের শিক্ষা আমাদের দশ বছরের স্কুলের শিক্ষা আর আদর্শকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। শিখলাম, চার খণ্ড শোপেন হাওয়ারের দর্শনের বই-এর চেয়ে একটা চকচকে বোতামের দাম অনেক বেশি। ঘাবড়ে গেলাম প্রথমে, মনে ব্যথা পেলাম প্রচণ্ড। জীবনের সূক্ষ্ম দিক, পবিত্রতা, মহত্ত্ব বলে কি কিছুই নেই? মানুষ কি তাহলে শুধু খাওয়া-পরা আর চকচকে বোতাম নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্যেই? ধীরে ধীরে অবশ্য সয়ে গেল সব। বুঝলাম এখানকার নিয়মই এই। মনের কোন দাম নেই, তার চেয়ে দামী হলো জুতোর ব্রাশ, বুদ্ধির কোন দরকার নেই, নিয়ম মানাটাই আসল, স্বাধীনতা নয়, ড্রিলটাই বেশি দরকারী। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সৈনিক হয়েছিলাম সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা দূর করার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করা হলো ওখানে। তিন সপ্তাহের ট্রেনিং-এ বুঝলাম আমার ওপর আমার বাবা-মার, আমার শিক্ষকের, আমার শিক্ষার, রুচিবোধের যতটা অধিকার, তারচেয়ে বেশি অধিকার দাড়িওয়ালা এক প্রাক্তন ডাকপিওনের। যেহেতু সে একজন কর্পোরাল। দু'দিনেই চোখ খুলে গেল আমাদের। 'পিতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা', ফুঃ, ওসব ফালতু কথা, আসল কথা হলো জুতোর পালিশ চকচকে আছে কি-না, অফিসার দেখে লাফিয়ে উঠে খটাস্ করে স্যালুট দিতে পারো কি-না। আর যে ব্যবহার পেলাম আমরা, সবচেয়ে অবাধ্য ক্রীতদাসের সাথেও বোধহয় মানুষ অমন ব্যবহার করে না। তারপর আছে ড্রিল, অ্যাটেনশন, প্যারেড মার্চ, অস্ত্র প্রদর্শন, লেফট রাইট, রাইট টার্ন, লেফট টার্ন, ফরোয়ার্ড মার্চ, হল্ট, অ্যাবাউট টার্ন আরও কত যে হাবিজাবি। যেন সার্কাসের ঘোড়া আমরা, ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম এর সাথে। সেইসাথে বুঝলাম এত কিছুর মধ্যে খুব সামান্য অংশই দরকারী, বাকি সব ভড়ং। একজন সত্যিকারের সৈনিক খুব ভাল করেই বোঝে কোনটা দরকারী আর কোনটা নয়।

কুড়িজন এসেছিলাম একসাথে। তিনজন অথবা চারজনকে একসাথে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করা হলো। প্রত্যেক গ্রুপে আরও থাকল জেলে, কৃষক আর শ্রমিকের পেশা থেকে আসা লোকজন। নয় নম্বর প্ল্যাটুনে পড়লাম আমি, মুলার, ক্রপ আর কেমারিখ। আমাদের এমনি

দুর্ভাগ্য যে আমাদের কর্পোরাল হলো সেই বেঁটে-বাটুল হিমেলস্টোস। যুদ্ধে আসার আগে নাকি বছর বারো চাকরি করেছে পোস্টম্যান হিসেবে। মোম দিয়ে পাকানো চোখা একজোড়া গোঁফ, সারাক্ষণ তা দিচ্ছে ওতে। অত্যন্ত কড়া বলে নাম আছে ওর। আর সেজন্যে গর্বে মাটিতে পা পড়ে না তার। কিছুদিনের মধ্যেই ক্রপ, জাদেন, হাই আর আমি তার নেক নজরে পড়ে গেলাম। কারণ ওর প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণার ভাবটা চাপা থাকেনি। তার ফলাফল অবশ্য হাতে-হাতেই পেলাম।

একদিন সকালে আমাকে ওর বিছানা পাততে হলো চোদ্দবার। একেকবার বিছানা পাতি আর সাথে সাথে ও কিছু না কিছু খুঁত বের করে, আর মেজাজ দেখাতে চাদর বালিশ একটানে ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয়। আর একবার কোথা থেকে মান্ধাতা আমলের একজোড়া বুট এনে ঠক্ করে ফেলে দিল আমার সামনে। লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে চামড়া। তার হুকুমে প্রায় একটানা কুড়িঘণ্টা আমাকে সেই বুটজোড়া দলাইমলাই করতে হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো মাখনের মত নরম হয়ে উঠল। আর তার মাথায় কি কূটবুদ্ধির অভাব আছে! নিত্য নতুন এমন সব শয়তানি বুদ্ধি গজায় যে অবাক হয়ে যেতে হয়। একদিন আমাকে ক্ষয়ে যাওয়া টুথব্রাস ধরিয়ে দিয়ে বলল, ওটা দিয়ে ঘষে ঘষে অফিসারদের মস্ত বড় ডাইনিং রুমটা পরিষ্কার করতে। আমাকে আর ক্রপকে একদিন খিলভাঙা ঝাঁটা আর ময়লা ফেলার টিন নিয়ে খালিহাতে ব্যারাকের সমস্ত বরফ পরিষ্কারের কাজে নামতে হলো। হাত জমে বরফ হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্রামের উপায় নেই। হিমেলস্টোস নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে কাজের। সেদিন হয় হাতদুটো চিরদিনের জন্যে যেত নয়তো মারা পড়তাম আমরা, হলো না হঠাৎ করে এক লেফটেন্যান্ট এসে পড়ায়। এই অবস্থা দেখে লেফটেন্যান্ট তক্ষুণি হাত-পা সেঁকতে পাঠাল আমাদের আর হিমেলস্টোসকে কষে এক ধমক। ধমক খেয়ে হিমেলস্টোসের চেহারাখানা হয়েছিল দেখার মত। কিন্তু আমাদের তখন হাসবার মত অবস্থা ছিল না। কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে গেলাম হাত-পা সেঁকতে। হিমেলস্টোস ধমক খাওয়ায় আমাদের লাভ হলো এইটুকু যে আমাদের

ওপর ওর ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেল।

কয়েকদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল হিমেলস্টোস, কি করে শায়েস্তা করা যায় আমাদের। ভেবে ভেবে চমৎকার বুদ্ধি বের করে ফেলল। বিশ্রাম করতে দেয়া যাবে না।

ছয় সপ্তাহ ধরে প্রত্যেক রবিবারে আমাকে একবেলা গার্ড হিসেবে অন্যবেলা আর্দালি হিসেবে কাজ করতে হলো। তারপর শুরু হলো আসল খেলা। হাতে রাইফেল আর ঘাড়ে-পিঠে পোঁটলা দিয়ে সোজা নিয়ে গেল নতুন চষা খেতে। শুরু হলো ড্রিল। সবেমাত্র বরফ গলতে শুরু করেছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যে বসে যায়, অথচ তার হুকুম, 'কুইক মার্চ, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো, ডাইনে গড়াও, বাঁয়ে গড়াও,' আরও কত কি। কাদা মেখে ভূতের মত চেহারা দাঁড়াল একেকজনের, আলাদা করে চেনার উপায় রইল না কাউকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মুখ থুবড়ে পড়ল কাদার মধ্যে ততক্ষণ চলল এরকম। এখানেই শেষ নয়, চারঘণ্টা পরেই আবার ফিটফাট পোশাকে রিপোর্ট করতে হলো হিমেলস্টোসের কাছে। আমার হাতের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কোনরকমে মুছে টুছে এসেছি। ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত করা যাবে না।

জাদেন, হাই, ক্রপ আর আমাকে একবার ঝাড়া পনেরো মিনিট বরফের মধ্যে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে, হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া কলজের মধ্যে খচ্ করে ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছে, আর হিমেলস্টোস লক্ষ করছে রাইফেলের ব্যারেলের ওপর চেপে বসা আঙুলগুলো সামান্য নড়াচড়া করে কিনা। নড়লেই নতুন শাস্তির ব্যবস্থা। আমার সন্দেহ হলো হাত সরিয়ে নেবার সময় ব্যারেলের ওপর চামড়া রয়ে যায় কিনা।

শীতের রাতে দুটোর সময় আমাকে খালিপায়ে শুধু একটা শার্ট গায়ে চারতলা থেকে নিচের উঠান পর্যন্ত আটবার ওঠানাম করতে হয়েছে। অপরাধ, যে সংবেধন নীলমণি টেবিলের ওপর আমাদের রাজ্যের জিনিস জড়ো করে রাখতে হয় তার ড্রয়ারটা ইঞ্চি তিনেক বেরিয়ে ছিল।

বেয়োনেট লড়াই প্র্যাকটিস্ করতে হত আমাদের। বেছে বেছে

আমাকেই সবসময় পছন্দ হত হিমেলস্টোসের। নিজে নিত একটা শক্ত কিন্তু হালকা কাঠের ডামি বেয়োনেট আর আমাকে দিত ভারি লোহার ভোঁতা একটা ডামি বেয়োনেট, নড়াতে চড়াতেই লাগত একবেলা। নিজের হালকা বেয়োনেট দিয়ে প্রাণভরে খোঁচাত আমাকে, খোঁচার চোটে হাতে বুকে কালশিটে পড়ে যেত আমার। একদিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। বেপরোয়াভাবে এগোলাম। সুযোগমত ওর তলপেটে চোখকান বুজে লাগালাম এক রাম খোঁচা।'ক্যাঁক' করে ছিটকে পড়ল মাটিতে। খানিকক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে তলপেট ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে রওনা দিল কোম্পানি কমাণ্ডারের কাছে নালিশ জানাতে। আমিও গুটি গুটি হাঁটা দিলাম ওর পেছনে পেছনে। সব শুনে হেসে উঠল কমাণ্ডার, 'তুমি ওকে মারতে দিলে কেন?'

এক রোববারে আমি আর ক্রপ ল্যাট্রিন থেকে ময়লার টব নিয়ে যাচ্ছি বাঁশে ঝুলিয়ে, দূরে একটা গর্তে ফেলে দিতে। ব্যারাকের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, বেরিয়ে এল হিমেলস্টোস। বোধহয় কোন উপরওয়ালার সাথে দেখা করতে যাবে, পোশাক টোশাক একেবারে ঝকঝকে। আমাদের দেখেই আকর্ণবিস্তৃত একটা হাসি দিল, 'বাহ্, বাহ্, চমৎকার, কাজটা তোমাদের খুব পছন্দ দেখছি। কমাণ্ডারকে বলে তোমাদের জন্যে নিয়মিত এ কাজটাই বরাদ্দ করে দিই, কি বলো?'

কিছু বললাম না আমরা। ওর ঠিক পাশ দিয়ে যাবার সময় কেন জানি না দু'জনেই একসাথে হোঁচট খেলাম। হুড়মুড় করে পড়লাম মাটিতে। আর টবটা পড়বি তো পড় একেবারে হিমেলস্টোসের পায়ে। হাঁটু থেকে নিচ পর্যন্ত, আহা, সে কি দৃশ্য!

'ষড়যন্ত্র, না?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হিমেলস্টোস, 'চাটিয়ে পরিষ্কার করাব।'

ও চলে যেতেই হাসিতে ফেটে পড়লাম দু'জন।

'তেমন কিছু হলে আবার হোঁচট খেতে হবে,' একটু উদাস স্বরে বলল ক্রপ।

হিমেলস্টোস অবশ্য উপর মহলে চেষ্টা তদবির করেছিল অনেক,

কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। কারণ এজন্যে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে হয়নি।

এই ঘটনার পর থেকে হিমেলস্টোস উঠে পড়ে লাগল আমাদের শায়েস্তা করার জন্যে। ড্রিলের সময় হলেই নিয়ে যেত চষা খেতে। তারপর থকথকে কাদার মধ্যে শুরু হত 'কুইক মার্চ', 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো' 'ডাইনে গড়াও', 'বাঁয়ে গড়াও' এইসব। কিন্তু ইতোমধ্যে আমরাও ঘুঘু হয়ে উঠেছি। হুকুম তো মানতেই হবে কিন্তু সে মানার মধ্যেও রকমফের আছে। উপুড় হতে বললে ধীরে সুস্থে হাঁটু ভাঁজ করি আগে, তারপর গদাই-লশকরী চালে কনুই মাটিতে ফেলে যতক্ষণে উপুড় হয়েছি ততক্ষণে আরেকটা হুকুম দেয়া হয়ে গেছে। আবার আগের মতই। এভাবে আমাদের গায়ের ঘাম বেরোনোর আগেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত হিমেলস্টোস। শেষে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল এসব। তবে সুযোগ পেলেই আমাদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে ফেলত।

অনেকবার ভেবেছি আমি, আমাদের ওপর ওর এই ঘৃণার কারণটা কি। ভেবে ভেবে একটা সম্ভাবনার কথাই মনে হয়েছে আমার। শিক্ষা, আমাদের আছে তা সে যতটুকুই হোক, ওর নেই। যুদ্ধে আসবার আগে যে-কোন শিক্ষিত লোকের সামনেই কুঁকড়ে থাকত ও। ফলে অবচেতন মনে যে ইচ্ছেটা ছিল, 'সুযোগ পেলে একহাত দেখে নেব', সেটাই কাজে লাগাচ্ছে এখন। ওর চোখে আমরা শিক্ষিত, সুতরাং সব ঝালটা পড়ছে আমাদের ওপর, সঙ্গদোষে আমাদের সাথে অন্য যারা আছে তাদেরকেও ঝামেলাটা পোহাতে হচ্ছে।

আমাদের ওখানে আরও অনেক স্টাফ কর্পোরাল আছে কিন্তু খুব কমই আছে ওর মত। আসলে সবাই চায় উপরওয়ালাকে খুশি করে অত সাধের চাকরিটা পাকাপোক্ত করতে। আর সে খুশি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আমাদের মত বলির পাঁঠাদের ওপর হম্বিতম্বি করা।

প্যারেডের যতরকম অত্যাচার আছে, চলতে থাকল আমাদের ওপর। মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করত। অসুখে পড়ত অনেকে, বকে ঠাণ্ডা বসে উলফ্ বেচারা তো মারাই গেল।

এতকিছুর পরেও কিন্তু কোন সময় বলিনি 'পারব না'। সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে গেছি দাঁতে দাঁত চেপে, ফলে আমরাও হয়ে উঠেছি ইস্পাতের মত কঠিন, সন্দিগ্ধ, নির্মম, একগুঁয়ে, কঠোর। যুদ্ধের জন্যে যা দরকার, তার কোনটাই ছিল না আমাদের মধ্যে। এখন পরিষ্কার বুঝি এ-ছাড়া এই নরকে একদিনেই পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এসবের মধ্যে দিয়ে যা পেয়েছি তা হলো 'বন্ধুত্ব', আগুনে পোড়ানো, কষ্টি পাথরে ঘষা নিখাদ সোনা, হয়তো যুদ্ধের এই একমাত্র সম্পদ।

কেমারিখের বিছানার পাশে বসে আছি। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ওর সময়। চারপাশে লোকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। একটা হসপিটাল ট্রেন এসেছে, স্থানান্তর করা যায় এরকম আহত সৈনিকদের নিয়ে যাবে ওটাতে। শাদা অ্যাপ্রন গায়ে ডাক্তার প্রত্যেকটা বেডের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে পরীক্ষা করে দেখছে কাকে সরানো যায়। কেমারিখের বেডের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল ডাক্তার, ওর দিকে ফিরেও তাকাল না।

'চিন্তা করিস না,' সান্ত্বনা দিলাম ওকে, 'পরেরবার নিশ্চয়ই হবে।'

আস্তে আস্তে কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, 'জানিস, আমার একটা পা কেটে ফেলেছে।'

বললাম, 'মন খারাপ করছিস কেন, ভাগ্য ভাল যে শুধু পায়ের ওপর দিয়েই গেল।'

আবার শুয়ে পড়ল কেমারিখ, কোন কথা বলল না।

'আচ্ছা, তুই-ই ভেবে দেখ, তোর তো দুটো পা-ই কাটা যেতে পারত। ওয়েগলারের হাত কাটা গেছে, তার চেয়ে তো এটা ভাল? সবচেয়ে বড় কথা, এখন তুই বাড়ি যেতে পারবি।'

'তুই তাই মনে করিস?'

'অবশ্যই। খালি অপারেশনটা আগে হয়ে যাক।'

দুর্বল হাতে ডাকল ও। আমি ঝুঁকে পড়তেই হাত বাড়িয়ে মাথাটা ওর মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি জানি, আমি আর কোনদিন ফিরে যেতে পারব না।'

'বাজে বকিস না,' ধমক দিলাম ওকে, 'কে বলেছে যেতে পারবি না? অপারেশনটা হয়ে যাক, তারপর দেখিস। তোর তো মাত্র একটা পা, এর চেয়ে কত কঠিন ব্যাপার ওরা ঠিক করে ফেলল।'

ও আস্তে আস্তে ওর হাতের আঙুলগুলো মেলে ধরল আমার সামনে, 'দেখ, কি অবস্থা।'

'অপারেশন করলে ওরকম সবারই হয়। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। ঠিকমত বিশ্রাম আর খাওয়া দাওয়াই হলো আসল। তুই খেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'কই, কি খেলি?'

পাশে রাখা বাটিটা দেখিয়ে দিল ও। তাকিয়ে দেখি একটু খেয়েছে কি খায়নি, যেমন ছিল তেমনি আছে বাটিভর্তি সুপ। রেগে উঠলাম আমি, 'এটা কিন্তু খুব খারাপ কথা, ফ্রাঞ্জ, না খেলে ভাল হবি কেমন করে? খা, এখনি খেয়ে নে বাকিটুকু।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। একটু পরে পাশ ফিরল আমার দিকে, ধরা গলায় বলল, 'আমি একসময় বনরক্ষক হতে চেয়েছিলাম রে!'

'তাতে কি, এখনও হতে পারবি। আজকাল এমন সব কৃত্রিম হাত-পা তৈরি হচ্ছে যে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবি না। নকল পা তো সাধারণ ব্যাপার, নকল হাত দিয়ে লেখার কাজ পর্যন্ত করা যায়। আর দিন দিন তো আরও ভাল ভাল জিনিস তৈরি হচ্ছে।'

চুপচাপ শুয়ে থাকল ও, কোন কথা বলল না, বেশ কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার বুটজোড়া মুলারের জন্যে নিয়ে যাস।'

পরিষ্কার বুঝলাম, ও বুঝে গেছে, ও আর বাঁচবে না। ভেবে পেলাম না কি বলে ওকে সান্ত্বনা দিই। ওর ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, বিরাট হাঁ করে আছে সারাক্ষণ। দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, মুখটা এত শুকনো যে দাঁতগুলোকে মনে হচ্ছে চুনোপাথরের টুকরো। কপাল ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কোটরে বসা চোখ, কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে আছে। মনে হচ্ছে

চামড়া লেপ্টানো বীভৎস কঙ্কাল একটা। আর বড়জোর ঘণ্টা কয়েক। হু হু করে উঠল বুকের মধ্যে, কেমন অসহায় মনে হলো নিজেকে। চোখ ভিজে উঠতেই মুখ ফিরিয়ে নিলাম ওর দিক থেকে।

এর আগেও অনেক মৃত্যু দেখেছি আমি, কিন্তু এমন কষ্ট কখনও পাইনি। কেমারিখ আমার বন্ধু, একসাথে বড় হয়েছি, খেলেছি, স্কুলে গিয়েছি। ওর খাতা দেখে কতবার নকল করেছি। বাদামী রং-এর কোট পরে স্কুলে যেত ও। কোমরে সুন্দর একটা বেল্ট। একমাথা সিল্কের মত চুল নিয়ে হরাইজোন্টাল বারে বিরাট একটা চক্কর মারত যখন, তখন আমরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম। ওর মত করে আর কেউ পারতাম না। ওর গায়ের চামড়া ছিল মেয়েদের মত শাদা। ও একদম সিগারেট সহ্য করতে পারত না। ক্যান্টোরেক ওকে নিয়ে কত গর্ব করত।

এলোমেলো ভাবনা ভিড় করে আসতে লাগল মনে। কত স্মৃতি, কত ছবি। পোশাক জুতো পরে রাইফেল হাতে আমরা যখন প্যারেড করি তখন কেমন ভারিক্কি দেখায় আমাদের। কিন্তু যখন পোশাক-টোশাক খুলে স্নান করতে নামি তখন আমাদের চেহারা দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে আমরা যুদ্ধ করছি। কেমারিখকে তো একেবারে শিশু মনে হয়।

সেই কেমারিখ শুয়ে আছে এখানে, এই হাসপাতালে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। হাহাকার করে উঠল বুকের মধ্যে, অসহায় ক্রোধে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে হলো। কেন, কিসের জন্যে ওর এই অবস্থা? ইচ্ছে হলো চিৎকার করে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিই, 'এখানে শুয়ে আছে ফ্রাঞ্জ কেমারিখ, জীবনের মাত্র সাড়ে উনিশটি বছর কাটিয়েছে ও। ও মরতে চায় না, ওকে মরতে দিও না কেউ।'

ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে আমার। চোখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এল দু'ফোটা লোনা পানি। আর কিছু ভাবতে পারছি না। কার্বলিক আর গ্যাংগ্রিনের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাবার দশা হয়েছে। একটু মুক্ত বাতাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করে উঠল বুকের ভেতরটা।

অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। মেঘ করেছে। কেমারিখের মুখ

আরও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। ও ঠোঁট নাড়ল। মনে হলো কিছু বলতে চায়। তাড়াতাড়ি ওর মুখের কাছে কান নিয়ে গেলাম। ও ফিসফিস করে বলল, 'আমার ঘড়িটা পেলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিস কিন্তু।'

কোন উত্তর দিলাম না। কি উত্তর দেব? আর কোনকিছুতেই ওর কিছু এসে যায় না। মনে হলো বুকের মধ্যে খামছে ধরেছে কেউ। ওর কপালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে আরও, সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে এখন, নাকটা বীভৎস রকমের সরু আর চোখা লাগছে।

হঠাৎ মনে পড়ল ওর মায়ের কথা। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল একটা। চিঠি লিখতে হবে ওর মাকে। ওহ্, চিঠিটা যদি এর মধ্যে পোস্ট করা হয়ে যেত!

আর্দালিরা সারাক্ষণ পাশ দিয়ে আসছে-যাচ্ছে। দু'একজন মাঝে মাঝে একটু থেমে দেখে যাচ্ছে ওকে। কোন পরিচর্যার জন্যে নয়, ওরা অপেক্ষা করছে কখন বেডটা খালি হবে।

মনে হয় এখনই সব শেষ হয়ে যাবে। শেষবারের মত ওর সাথে কথা বলে নিই। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে কথা বলতে শুরু করলাম, মনে অসম্ভব আশা, হয়তো এতেই ভাল হয়ে উঠবে ও।

'শোন, ফ্রাঞ্জ, তুই বরং ক্লস্টারবার্গের সেই বাড়িটাতে গিয়ে কিছুদিন কাটা, তাহলে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবি। জানালা দিয়ে দূরে আকাশ দেখবি, নদী দেখবি। অনেক দূরের সেই গাছ দুটোর কথা মনে আছে? এখন তো বছরের সবচেয়ে ভাল সময়। ফসল পাকছে, সোনার ঢেউ খেলে যাচ্ছে খেতগুলোর ওপর দিয়ে। মনে আছে তোর, সেই যে নদীর ধারে পপলার গাছগুলোর ওখানে হাত দিয়ে দিয়ে মাছ ধরতাম আমরা? এখন তো তুই নিজের ইচ্ছেমত যেতে পারবি নদীতে, মাছ ধরে ধরে অ্যাকুইরিয়ামে জমাস।'

ওর মুখে মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, ভিজে ভিজে ঠেকল হাতে। তাকিয়ে দেখি কাঁদছে ও। নিজের বোকামিতে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল আমার। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে মুখ রেখে বললাম, 'তুই ঘুমো, ফ্রাঞ্জ।'

ও কিছু বলল না। চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। বাধ মানল না আর। দু'জনের অশ্রুধারা এক হয়ে মিশে গেল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। চুপচাপ বসে আছি ওর পাশে। সারাক্ষণ তাকিয়ে আছি ওর দিকে, পাছে কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিচ্ছু বলল না ও। মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করে রইল শুধু। অশ্রুর বন্যায় ভিজে গেল বালিশ।

আমি জানি এখন ও ওর বাবা-মা ভাই-বোন কারও কথাই ভাবছে না, ভাবছে শুধু নিজের কথা। সবকিছু ওর কাছে মূল্যহীন, শুধু বাঁচতে চায় ও। এই মুহূর্তে উনিশ বছরের জীবনটার চেয়ে প্রিয় আর কিচ্ছু নয় ওর কাছে। ও বাঁচতে চায়।

হঠাৎ ঘড়ঘড় করে উঠল ওর গলার মধ্যে। পাগলের মত ছুটে গেলাম বাইরে, 'ডাক্তার কোথায়, কোথায় ডাক্তার?' দূরে একজন ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলাম ওর কাছে। তার শাদা অ্যাপ্রন ধরে কখন যে টান দিয়েছি খেয়ালই করিনি, 'শিগ্‌গির চলুন, ফ্রাঞ্জ কেমারিখ মারা যাচ্ছে।'

ঝাঁকুনি দিয়ে অ্যাপ্রনটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক্তার আর্দালিকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'ছাব্বিশ নম্বর বেড, পা কাটা।'

'ওর ব্যাপার আমি কি জানি,' মুখ বেঁকিয়ে বলল ডাক্তার, 'আজকে তো পাঁচটা পা কেটেছি। তুমি গিয়ে দেখো, কি ব্যাপার।'

আমি আর্দালিকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললাম কেমারিখের কাছে।

'সেই যে সকাল পাঁচটা থেকে অপারেশন শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত থামাথামি নেই। আর মরলও তো আজ ষোলোজন। কি জানি এটা নিয়ে হয়তো সতেরোজন। আজকে বোধহয় বিশজন ছাড়িয়ে যাবে।'

একমুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারালাম আমি। ঝাপসা হয়ে এল সবকিছু। মনে হলো অনন্ত কাল ধরে ঘুমিয়ে আছি। এ ঘুম থেকে আর কোনদিন উঠতে পারব না। পরমুহূর্তেই আবার পরিষ্কার হয়ে এল সব।

কেমারিখের বেডের পাশে এসে দাঁড়াতেই পা দুটো মেঝের মধ্যে যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দিল কেউ। ও নেই। হলুদ চোখ দুটো আধখোলা, গাল এখনও ভিজে। মুখটা ঘুরিয়ে নিতে পারলাম শুধু।

কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানি না, আর্দালির কথায় চমক ভাঙল। সে তাড়া দিচ্ছে জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার জন্যে। ওকে সরালেই বাইরে যারা মেঝেতে পড়ে আছে, তাদের কাউকে আনতে পারবে।

আমি বাইরে বেরিয়ে আসবার আগেই ওয়াটারপ্রুফ কাগজ দিয়ে কেমারিখের মৃতদেহটা জড়িয়ে ফেলল ওরা।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ঠাণ্ডা বাতাস আলতো করে ছুঁয়ে গেল আমার চোখমুখ, কে জানে হয়তো কেমারিখেরও। দেখি ঘন মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। হাঁটা শুরু করলাম ক্যাম্পের দিকে। হঠাৎ করেই মনে এল মৃদু ফুলের সুবাস, শাদা মেঘের ভেলা, সুন্দরী বালিকার কথা। জীবনটাকে বড়ো ভালবাসতে ইচ্ছে করল। মনে পড়ল কেমারিখের কথা। হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে উঠল। দ্রুত, আরও দ্রুত। মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে, বজ্রপাতে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, চারপাশে অসহায় কান্নার আওয়াজ। দু'হাতে কান চেপে ধরে দৌড়ুতে লাগলাম।

ক্যাম্পের সামনে পৌঁছে দেখি মুলার দাঁড়িয়ে আছে। আমার চেহারা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করল না। কেমারিখের জিনিসপত্র থেকে বুটগুলো দিলাম ওকে। খুশিমনে পরে ফেলল তক্ষুণি। চমৎকার ফিট করেছে ওর পায়ে।

মুলারের দেয়া সামান্য খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনতে পেলাম বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজ।

হয়তো কেমারিখের জন্যেই কাঁদল পৃথিবী, সারারাত ধরে, অঝোর ধারায়।

তিন

শুনলাম বেশ কিছু নতুন রিক্রুট এসেছে। ক্যাম্পের সামনে খড়ের স্তূপ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়তি খানিকটা খড় নিয়ে রাখলাম বিছানার জন্যে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখলাম সব সাফ, কুটোটিও পড়ে নেই।

'শুনলাম কিছু পুরানো মক্কেলের সাথে জনাপঁচিশেক নতুন মক্কেল এসেছে?' ক্রপ বলল, 'চল তো, দেখে আসি বাচ্চা ছেলেগুলোকে।'

বললাম, 'চল।' শার্টের ওপর দিকে বোতাম দুটো খুলে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে বুক চিতিয়ে হাঁটা দিলাম। ভাবখানা যেন জেনারেলরা যাচ্ছি পরিদর্শনে।

দেখলাম ওদের। বছর দুয়েকের ছোট হবে আমাদের। খাচ্ছিল ওরা। কাট জিজ্ঞেস করল, 'অনেকদিন পরে ভাল কিছু খাচ্ছ, তাই না?'

'হেঃ হেঃ,' উত্তর দিল একজন, 'এটা আবার খাবার নাকি? আমরা তো এতদিন পনির আর মাখন দিয়ে রুটি খেতাম।'

'বলো কি,' শিস দিয়ে উঠল কাট, 'আমাদের এখানে যদি বালি দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানানো হয় তাহলেও অবাক হবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা অবশ্য মাঝে মাঝেই মুখ বদলানোর জন্যে ভালমন্দ কিছু খাই, এই ধরো মটরশুঁটি, সিম এসব দিয়ে রান্না করা ভুনা মাংস। চলে নাকি?'

'এহ্, বললেই হলো?'

'থালা হাতে এসো আমার সাথে।'

আমরাও রওনা হলাম ওর পেছনে পেছনে। ঘরে ঢুকে খড়ের গাদার নিচ থেকে এক বাটিভর্তি ভুনামাংস বের করল। আহ্ কি সুগন্ধ, জিভে জল এল সাথে সাথে।

'কি হে, চলবে নাকি একটু,' এমনভাবে বলল কাট, যেন জেনারেল সাহেব কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন সাধারণ সৈনিকের দিকে। 'এখন থেকে খাঁটি প্রুশিয়ানদের সাথে হুঁশ করে কথা বলবে, বুঝেছ?'

আমরা অবাক হয়ে গেলাম, 'দারুণ জিনিস তো, পেলে কোথায়?'

'আরে, আমি এগুলো নেয়াতে তো জিনজার ধন্য হয়ে গেল। অবশ্য ওকে তিনটে প্যারাসুটের কাপড় দিয়েছি, সে যাকগে। এগুলো এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, তাতে খারাপ লাগবে না অবশ্য।'

'দেখি, তোমার থালাটা দাও এদিকে,' নতুন রিক্রুটকে খানিকটা মাংস বেড়ে দিতে দিতে বলল কাট, 'এরপর থেকে যখন আসবে, একহাতে থালা নিয়ে আসবে, অন্য হাতে সিগারেট আর তামাক পাতা, বুঝেছ?'

আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'লালা দিয়ে জামা ভেজানোর আগেই রাস্তা মাপতে পারো।'

আমরা সবাই নিশ্চিত যে কাটের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু একটা আছে। এ ধরনের লোক অনেক আছে যাদের প্রথম নজরে আলাদা করা দুষ্কর। অন্য কোম্পানিতে আছে দু'এক জন, কিন্তু কাটের তুলনা হয় না। যুদ্ধে আসার আগে ওর পেশা ছিল জুতো সেলাই, কিন্তু আমি জানি ওকে দিয়ে চণ্ডীপাঠও করানো যাবে। হেন কাজ নেই যা ও করতে পারবে না। এমনিতেই ও খুব বন্ধুভাবাপন্ন, তারপর ওর সাথে থাকার বাড়তি সুবিধা তো আছেই। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলে আমরা একবাক্যে ওর কথায় উঠি বসি। সে কারণে কত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে যে রক্ষা পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

একবার ফ্রন্টে যাবার পথে শীতের রাতে এমন এক জায়গায় ট্রাক থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল যেখানকার নামই শুনিনি জীবনে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে শেষে ধাক্কা খেলাম ভাঙা এক বাড়ির দেয়ালে। ওটাই নাকি থাকবার জায়গা। ভেতরে বিছানা আছে। বিছানা মানে কাঠের খুঁটির সাথে তারের জাল লাগানো। ব্যাস, আর কিচ্ছু

নেই।

বিছানায় বসতেই মনে হলো মাংস ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল তার। গায়ে কম্বল আছে একটা কিন্তু পেতে শোবার উপায় নেই, ভাঙা জানালা দিয়ে হিলহিল করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বুঝলাম, ভোগান্তি আছে কপালে।

কাট এ অবস্থা দেখেই হাইকে বলল, 'এসো তো আমার সাথে।' বেরিয়ে গেল ওরা। প্রায় আধঘণ্টা পরে খস্‌খস্‌ করতে করতে ফিরল দু'জন। দু'হাত ভর্তি করে খড় এনেছে কোথা থেকে। ওগুলো তারের ওপর বিছিয়ে দিতেই দিব্যি নরম গদির বিছানা হয়ে গেল। এখন আরামে নাক ডাকাতে পারি যদি পেটে কিছু পড়ে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

আমাদের সাথে ছিল এক গোলন্দাজ। ক্রপ ওকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ক্যান্টিন-ট্যান্টিন নেই ধারেকাছে?'

'কী, ক্যাহ্ হ্যাঃ হ্যাঃ...,' হাসির চোটে ক্যান্টিন পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারল না সে লোক, হাসি থামাতে থামাতে বলল, 'ক্যান্টিন তো দূরের কথা, একটা রুটির টুকরোও পাবে না এখানে।'

'কেন, ধারেকাছে কেউ থাকে না?'

'থাকে, তবে ওরাই আমাদের ওখানে ঘুরঘুর করে খাবার জন্যে।'

বুঝলাম কি আছে ভাগ্যে। ক্রপকে বললাম, 'দেখ তো, একটুকরো পাথর-টাথর পাস কিনা।'

'কেন, পাথর দিয়ে কি করবি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ক্রপ।

'পেটে বেঁধে রাখতাম আর কি। রাতটা পার করতে হবে তো।'

দেখলাম মাথায় ক্যাপ চড়াল কাট।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি কিছু পাই কিনা।'

হেসে উঠল গোলন্দাজ লোকটা, 'যা পাবে সেগুলো আর শুধু শুধু কষ্ট করে বয়ে আনতে যেয়ো না।'

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় খাবার পাওয়া যেতে পারে। একবার ভাবলাম ফ্রন্টের ওপাশ থেকে চুরি করে আনব নাকি! সাথে

সাথে বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কাজ ওটা।

ক্রপ ওর সিগারেটটা অর্ধেক করে একভাগ এগিয়ে দিল আমার দিকে। জাদেন ওর পোঁটলা-পুঁটলির ভেতর থেকে একটু সেদ্ধ আলু বের করে দিল আমাদের। গজগজ করতে লাগল সে, 'ব্যাটাদের নিয়ে আর পারি না, কতবার বলেছি যে আলু, সিম, মটরশুঁটি, মাংস এগুলো আলাদা আলাদা না রেঁধে একসাথে রান্না করতে, তা কে শোনে কার কথা। স্বাদটাই নষ্ট করে দেয় খাবারের।'

'ফের যদি খাবারের কথা তুলিস তো তোর মাথা ফাটাব আমি,' খেঁকিয়ে উঠল ক্রপ, 'চুপ থাক একেবারে।'

ওর এই কথার পরে গোটা ঘরটাই একেবারে চুপ মেরে গেল। নিঃশ্বাস আর সিগারেট টানার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই ঘরে। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল, দড়াম করে দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠলাম একেবারে। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাট।

স্বপ্ন দেখছি কিনা সন্দেহ হলো আমার। চোখটা একটু রগড়ে নিয়ে আবার তাকালাম। নাহ্, ঠিকই আছে। দু'বগলে দুটো মস্ত বড় রুটি আর হাতে মাংসভর্তি চটের ব্যাগ। রক্ত ঝরছে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায়। ঠক্ করে একটা শব্দ হতেই দেখি গোলন্দাজের মুখ থেকে পাইপটা খসে পড়েছে মেঝেতে। সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। হাঁ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে কাটের দিকে। কাছে গিয়ে রুটিটাকে ছুঁলো একবার, তারপর শুধু বলল, 'রুটি, এখনও গরম!'

কাটও বলল না, আমরাও জিজ্ঞেস করলাম না কোথায় পেল ও এগুলো। পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা। আমি এখন নিশ্চিত যে ওকে যদি ধু ধু মরুভূমির মধ্যে একেবারে খালি হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলেও সে মদ, কিছু শুকনো খেজুর আর ঝলসানো উটের মাংস এনে বলবে, 'আর কিছু পাওয়া গেল না।'

'কিছু কাঠ আনো তো,' হাই-এর দিকে ফিরে বলল কাট। একটু মিটিমিটি হেসে ওর কোটের নিচ থেকে বের করল একটা ফ্রাইং প্যান,

পকেট থেকে লবণ আর খানিকটা চর্বি। গোটাকয় ইট জোগাড় করে চুলো বানানো হলো। হাই কাঠ আনতেই ওগুলো চুলোয় ঢুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ফেলল কাট। পাকা রাঁধুনীর মত রান্না শুরু করল।

আমরা যার যার বিছানায় গিয়ে বসলাম। গোলন্দাজের দিকে চেয়ে দেখি তার হাঁ-টা আগের চেয়ে আরেকটু বড় হয়েছে শুধু। পাইপটা এখনও মাটিতে গড়াচ্ছে।

এই হলো কাট। বাতাসে গন্ধ পায় ও। কোথাও যদি খাবার লুকিয়ে রেখে ওকে বলা হয় একঘন্টার মধ্যে খুঁজে আনতে, ও ক্যাপটা মাথায় চাপিয়ে সোজা চলে যাবে যেখানে খাবার লুকোনো আছে। যেন সব কিছু জানাই ছিল আগে থেকে।

ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গাটায় বসে আছি। মনমেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। এই গরমের মধ্যে দুপুরের কাঠফাটা রোদে স্যালুট কিভাবে করতে হয় ঝাড়া একঘন্টা সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমাদের। অপরাধ, এক মেজরকে দেয়া জাদেনের স্যালুটটা নাকি তত চৌকস হয়নি।

'আসলে আমরা কায়দা করে স্যালুট করা শিখিনি বলেই যুদ্ধে হারছি,' তিক্ত গলায় বলল কাট।

চুপচাপ গাছে হেলান দিয়ে বসে থাকলাম, কাটও। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না একটুও। ক্রপ আর হাই মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। বিশেষ জমছে না অবশ্য। ওদের কথা শুনতে শুনতে উদাস হয়ে গেল মনটা। বাড়ির কথা মনে পড়ল আমার। ও-রকম ছুটির দিনে বাড়ির পেছনের পপলার গাছের নিচে কতদিন এমনি করে বসে থেকেছি।

'আসলে এভাবে যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়,' ক্রপ শুরু করল তার বিজ্ঞচিত মতামত, 'যে যে দেশ যুদ্ধ করতে চায় তাদের সব মন্ত্রী আর জেনারেলদের ধরে ধরে ঢোকাতে হবে এরিনায়। তারপর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে যুদ্ধে। ঠিক ষাঁড়ের লড়াই-এর মত। লোকজন টিকেট কেটে ঢুকবে ভেতরে। পুরো স্টেডিয়ামটা রংবেরং-এর কাপড় দিয়ে সাজানো হবে। যুদ্ধে যে দলের সবাই মারা যাবে তাদের

দেশ হারবে। ভাব তো, কত সোজা হয়ে গেল যুদ্ধটা। কত অল্প লোক মারা গেল আর কত তাড়াতাড়ি চুকে গেল ঝামেলাটা। তা না শুধু শুধু নিরীহ লোকদের নিয়ে টানাটানি।'

কথার মধ্যে লোন্-এ ট্রেন বদলানোর প্রসঙ্গ আসতেই হেসে ফেললাম আমরা। এটা ছিল হিমেলস্টোসের আবিষ্কার। লোন্ জংশনে ট্রেন বদলাতে গিয়ে যেন আমরা হারিয়ে না যাই তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমাদের প্রত্যেককে খাটের পাশে দাঁড়াতে হত। খাটগুলোকে সাজিয়ে নেয়া হত ট্রেনের সম্ভাব্য অবস্থানের মত করে। প্রত্যেকের ঠিক করা থাকত কোন ট্রেন থেকে কোন ট্রেনে চড়তে হবে। হুকুম হবার সাথে সাথে ছুটতে হত ট্রেন ধরতে। এক খাটের পাশ দিয়ে অন্যটার নিচ দিয়ে নয়তো ঘুরে ঠিক ঠিক জায়গামত পৌঁছুতে হত।

'আচ্ছা' শুরু করলাম আমি, 'হিমেলস্টোস পোস্টম্যান থাকা অবস্থায় নিশ্চয় ভিজে বেড়ালের মত ছিল।'

নড়েচড়ে বসল সবাই। বুঝলাম এতক্ষণ পরে একটা জুতসই আলোচনার বিষয় পাওয়া গেছে।

'শুধু হিমেলস্টোস নয়, সব ক'টাই ওরকম। যতক্ষণ অন্য জায়গায় আছে ততক্ষণ ভিজে বেড়াল, যেই জামার হাতায় একটা স্ট্রাইপ না হয় একটা স্টার লাগল, অমনি বাঘ।'

'তার মানে ইউনিফর্ম গায়ে চড়লেই মেজাজ চড়ে,' বললাম আমি।

গলা খাঁকারি দিল কাট। বুঝলাম লম্বা-চওড়া বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

'মোটামুটিভাবে তাই,' শুরু করল ও, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যখানে। ধরো, একটা কুকুরকে তুমি রোজ রোজ আলু খাওয়া শেখাচ্ছ। যতদিন অন্যকিছু না দেবে ততদিন ও আলুই খেতে থাকবে। তারপর একদিন ওর সামনে ছোট্ট একটা মাংসের টুকরা রাখো। ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটার ওপর। কারণ সেটাই ওর স্বভাব। তেমনি কোন মানুষের সামনে সামান্য একটু "ক্ষমতার" মুলো ঝুলিয়ে রাখো, সে-ও একইভাবে

ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটার ওপর। আসলে বাইরে যা-ই হোক, মানুষ মনে মনে এখনও পশুই রয়ে গেছে। পশুর সাথে পার্থক্য ওখানেই যে মানুষ খারাপ ব্যাপারটাকেও বেশ রঙচঙ লাগিয়ে সুন্দর করে হাজির করতে পারে। সেনাবাহিনীর ব্যাপারটাও তাই। একজনকে আরেকজনের ওপর ক্ষমতা দেখাতেই হবে। গোলমাল একটাই যে, দেখানোর জন্যে প্রত্যেককে খুব বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়ে গেছে। একজন নন-কমিশনড সৈনিকের কথাই ধরো। ক্ষমতা দেখানোর জন্যে সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কাউকে পাচ্ছে না। সুতরাং কারণে অকারণে সে সাধারণ মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করছে। নন-কমিশনড সৈনিকের ওপর ক্ষমতা দেখাচ্ছে একজন লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্টের ওপর ক্যাপ্টেন, তার ওপর তার উপরওয়ালা, এভাবেই চলতে থাকবে শেষ পর্যন্ত। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেহেতু তারা জানে যে তারা ক্ষমতা খাটাতে পারে, সুতরাং ব্যবহার করতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না তাদের। একটা সাধারণ উদাহরণই দিই, ধরো, দুপুরের কাঠফাটা রোদে ঘণ্টাখানেক প্যারেড করে ফিরছ। জিভ তো ততক্ষণে হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে সবার। এমন সময় হুকুম হলো "খুশির গান গাও।" সেই মুহূর্তে গান কেমন হবে বুঝতেই পারছ। সাথে সাথে হুকুম হলো "অ্যাবাউট টার্ন।" প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে ভাল মত গান না গাওয়ার শাস্তি হিসেবে আরও একঘণ্টার প্যারেড। প্যারেড শেষ হলে আবার হুকুম হলো "খুশির গান গাও।" এবার বলো এসবের কারণ কি! কারণ একটাই যে, কোম্পানি-কমাণ্ডারকে এতখানি ক্ষমতা দেয়া আছে। আর এমন করার জন্যে তাকে দোষ দেয়া তো দূরের কথা, উপরওয়ালা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে। এটা একটা সাধারণ উদাহরণ, কিন্তু বেশির ভাগ সময় দেখবে এরকমই হচ্ছে। এবার আমাকে এমন একটা পেশার নাম বলো দেখি যেখানে একজন লোক এরকম ব্যবহার করতে পারে? পারবে না। কারণ অন্য কোন জায়গায় এরকম করলে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে না! এ ব্যবহার চলবে শুধু সেনাবাহিনীতে। এটা ওদের নিয়মই দাঁড়িয়ে গেছে। এবং দেখবে, যে লোক যত বেশি সাধারণ অবস্থা থেকে এসেছে, সে তত বেশি খারাপ

ব্যবহার করছে।'

'বুঝলাম,' একটু চিন্তার সুরে বলল ক্রপ, 'কিন্তু ওরা বলে এরকম নাকি করতে হয় ডিসিপ্লিন বজায় রাখার জন্যে।'

'ডিসিপ্লিন বজায় রাখার জন্যে তো ওভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করার দরকার নেই। ট্রেনিং-এর সময় তোমার উচিত যে চাষী, যে কামার, যে শ্রমিক যুদ্ধের ''ক''-ও জানে না তাকে বোঝানো, আসল ব্যাপারটা কি। কিন্তু হচ্ছেটা কি? তাকে একটা গম ভাঙানো চাকির মধ্যে দিয়ে পিষে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ফ্রন্টে। ওখানে সে নিজেই ঠিক করে নিচ্ছে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ।'

ওর কথার জবাব দেবার মত কিছু খুঁজে পেলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম শুধু। হঠাৎ দেখি ছুটতে ছুটতে আসছে জাদেন। উত্তেজনায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'খবর শুনেছিস? হিমেলস্টোস আসছে ফ্রন্টে। রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

আমাদের মধ্যে জাদেনেরই সবচেয়ে বেশি রাগ হিমেলস্টোস-এর ওপর। সাধারণত অত্যাচার সমানভাবেই চলত আমাদের ওপর, কিন্তু ওর বেলায় খানিকটা অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

জাদেনের বদঅভ্যাস ছিল রাতে বিছানা ভেজানোর। কেমন করে জানি না একদিন টের পেয়ে গেল হিমেলস্টোস। ব্যস্, আর যায় কোথায়! তার ধারণা, এটা হচ্ছে জাদেনের আলসেমির জন্যে। সুতরাং এ রোগের দাওয়াই বাতলানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগল ও।

সে করল কি, পাশের ঘর থেকে আরেকজনকে নিয়ে এল জাদেনের সঙ্গে থাকার জন্যে।

আমাদের সব বিছানাগুলোই দু'থাকের। একটার ওপর আরেকটা। নিচে তারের জাল দেয়া। তার ওপর চাদর-তোষক।

প্রথম রাতে ব্যবস্থা হলো জাদেন শোবে ওপরে। পাশের কামরার জন নিচে। ফলে যা হবার তা-ই হলো। মাঝরাতে চেঁচামেচি, গালাগালির চোটে ঘুম হারাম হয়ে গেল আমাদের। পরদিন ব্যবস্থা হলো জাদেন

শোবে নিচে, অন্যজন ওপরে। সে-লোকই বা গতদিনের শোধ নিতে ছাড়বে কেন? ফলে এ রাতেও একই অবস্থা। ঘুমের বারোটা বাজল আমাদের। শেষে ফল হলো এই যে একজন রোজ রাতে মেঝেয় ঘুমোত আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে সারাদিন নাক দিয়ে জল ঝরাত।

ট্রেনিং সেন্টার থেকে যেদিন ফ্রন্টে চলে আসব তার আগের দিন ঠিক করলাম, হিমেলস্টোসকে একটা শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। বৈঠক বসল আমাদের। ক্রপের মতামত, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন তো হিমেলস্টোস আবার পোস্টম্যানের চাকরিতেই ফিরে যাবে। তখন ও ঢুকবে হিমেলস্টোসের উপরওয়ালা হিসাবে। তারপর যত রকমে পারা যায় দেখে নেবে হিমেলস্টোসকে। বললাম, 'পরিকল্পনাটা ভালই কিন্তু সে তো অনেক পরের ব্যাপার, এখন হাতে হাতে কিছু শিক্ষা না দিলে তো চলছে না।'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হলো কি করা হবে। বিপদের আশঙ্কা আছে অবশ্য, কিন্তু আমাদের চিনতে না পারলে কি কচুটা করবে ও।' আর কিছু আঁচ করার আগেই তো কেটে পড়ব আমরা। সুতরাং কাজে নেমে পড়লাম।

সপ্তাহখানেক ধরেই খেয়াল করেছি, হিমেলস্টোস রোজ বিকেলে দূরের একটা ক্যান্টিনে বিয়ার খেতে যায়। সন্ধ্যা নামার পর ফিরে আসে প্রায় নির্জন একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধে হতেই পাথরের আড়ালে একটা জুতসই জায়গা দেখে ঘাপটি মেরে বসলাম। উল্টোদিকে গাছের আড়ালে হাই এমনভাবে আড়াল হয়ে থাকল যে আমরা ওকে দেখতে পাব কিন্তু রাস্তা থেকে কোনভাবেই ওকে দেখা যাবে না। এবার শুধু প্রতীক্ষার পালা।

বহুক্ষণ পরে সেই প্রতীক্ষিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। চোখ বুজে বলে দিতে পারি, হিমেলস্টোসের পায়ের শব্দ। প্রতিদিন সকালে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। হাই-এর কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে ক্রপ বলল, 'একাই।'

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছে হিমেলস্টোস। কিছু যে ঘটতে পারে চিন্তাই করেনি ও। আমাদের ঠিক সামনাসামনি আসতেই পাথরের আড়াল থেকে 'টক্‌টক্‌' করে দু'বার শব্দ করল ক্রপ। বন্ধ হয়ে গেল গান। এদিকে ফিরে তাকাতেই চোখের পলকে ওপাশ থেকে ছুটে এল হাই। কিছু বোঝার আগেই চাদর দিয়ে হিমেলস্টোসের কোমর পর্যন্ত ঢেকে দিল ও। ঝটপটানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েই লাফিয়ে বেরিয়ে এলাম বাকি সবাই, দেখি চাদর দিয়ে ঢেকে পেছন থেকে ওর দু'হাত সুদ্ধ কোমর জাপটে ধরেছে হাই। আর হিমেলস্টোসের মুখ দিয়ে 'ওঁক্‌ ওঁক্‌' শব্দ বেরোচ্ছে ক্রমাগত।

হাতের দড়িটা দিয়ে একনিমেষে কোমর পেঁচিয়ে হাতসুদ্ধ বেঁধে ফেললাম ওর। সামনে চলে গেল হাই। পাশ থেকে দু'জনে ধরে রাখলাম হিমেলস্টোসকে।

বেলচা চালানোর ভঙ্গিতে হিমেলস্টোসের পেটে হাত চালাল হাই। 'হুক্‌' করে উঠে ছিটকে পড়ল হিমেলস্টোস, গড়াতে গড়াতে কমপক্ষে পাঁচ গজ দূরে গিয়ে থামল। তারপর শুরু হলো চিৎকার, 'ওরে বাবারে, বাবারে, মারে, ওরে মারে!' চিৎকারের চোটে গলা ভেঙে গেল ওর। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পেছন থেকে কষে লাথি মারল ক্রপ। হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল হিমেলস্টোস। হাই ওর মাথাটা তুলে নিল পায়ের ওপর। হাতের বালিশটা চেপে ধরল মুখে। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল চিৎকার। কিছুক্ষণ পরেই বাতাসের জন্যে ছটফট্‌ শুরু করল হিমেলস্টোস। বালিশটা একটু আলগা করতেই ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার চিৎকার জুড়ল ও। সাথে সাথেই আবার বালিশ চেপে ধরল হাই। চলতে থাকল এভাবে।

এদিকে আমরা গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছি প্রাণের সুখে। হাত-পা চালাচ্ছি যে যেভাবে পারি। পাঁজরের মধ্যে কষে একটা লাথি দিতেই 'কোঁক্‌' করে উঠল হিমেলস্টোস। কাটা মুরগির মত ছট্‌ফট্‌ করল খানিকক্ষণ, তারপর নিঃসাড় হয়ে গেল।

ভয় পেলাম, মরে গেল নাকি? নাহ্‌, একটু পরেই দেখি চিৎকার

জুড়েছে আবার। জাদেন গিয়ে হিমেলস্টোসের প্যান্টের বেল্টটা আলগা করে পট্‌পট্‌ করে বোতামগুলো খুলে দিল। তারপর গোড়ালির কাছে প্যান্ট ধরে টান দিতেই সুড়ুৎ করে খুলে এল প্যান্ট। কালো আর খোস-পাচড়ার দাগে ভর্তি কাঠির মত সরু লিকলিকে দু'খানা ঠ্যাং দেখে হাসিতে পেট ফেটে যাবার দশা হলো আমাদের।

দেখলাম অনেক হয়েছে, এবারে ছেড়ে দেয়া যায়। কখন কে এসে পড়ে কে জানে! হিমেলস্টোসকে ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে কিল চড় আর লাথি দেয়া শুরু করলাম সবাই। ল্যাগব্যাগ করতে করতে ছুটল ও। জাদেন শেষবারের মত প্রাণের সুখে একটা ডিরেক্ট ফ্রী কিক্‌ কষাল হিমেলস্টোসের পিছনে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ও। উঠেই আগের চেয়ে আরও জোরে ছুটল। কিছুদূর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে গর্তে পড়ল ও। উঠেই আবার ছুট। কোন হুঁশ নেই আর। ছোটাছুটিতে বাঁধন আলগা হয়ে যেতেই মাথা থেকে চাদর ছুঁড়ে ফেলল। আমরা তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে চলে এলাম। কিন্তু তার বোধহয় দরকার ছিল না। এখন ওর পেছন পেছন ছুটলেও ও মুখ ঘুরিয়ে তাকাত কি না সন্দেহ।

হিমেলস্টোস চোখের আড়াল হতেই হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল হাই আর জাদেন। পেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়লাম আমি। হাসির চোটে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গাল-টাল ভিজে একাকার।

পুরো পাঁচ মিনিট পরে হাসির বেগ কমল আমাদের। চাদর পড়েই রইল, তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম আমরা। সারা রাস্তা বুগ্‌ বুগ্‌ করে হাসির বুদ্বুদ উঠতে লাগল পেটের মধ্যে। কোনরকমে পৌঁছুলাম ক্যাম্পে। ঘণ্টাখানেক পর চাদরটা আনতে গিয়ে দেখি, কে যেন ওটাকে হাওয়া করে দিয়েছে আগেই। যাকগে, একরাত চাদর ছাড়াও ঘুমানো যায়।

চার

ফ্রন্টে যেতে হবে কাঁটাতারের বেড়া টাঙাতে। পোশাক-টোশাক পরে রেডি হবার আগেই লরি এসে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সবাই।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। গোধূলির ম্লান আলোয় সবকিছু ফ্যাকাসে লাগছে। কেন জানি না সবাইকে খুব বেশি অন্তরঙ্গ মনে হলো। অন্যদেরও হয়তো একইরকম মনে হচ্ছে। হাড়কিপটে জাদেন পর্যন্ত একটা সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

লরি একেবারে ভর্তি, ঠাসাঠাসি অবস্থা। গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নড়াচড়ার উপায় নেই। মুলার আছে ফুর্তিতে। নতুন বুট পরেছে আজকে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তা, গোলার গর্তে ভরা। আলো জ্বালবার উপায় নেই তাই অন্ধকারেই ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলছি আমরা। আর সেকি রামঝাঁকুনি, হাড়ের জোড়া ছুটে যাবে কি না সন্দেহ হলো আমার। আর ছিটকে বাইরে পড়ে যাবার কথা তো বাদই দিলাম। ওটা যে কোন মুহূর্তেই ঘটতে পারে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না। পড়লে বড় জোর হাত-পা ভাঙবে। তাহলেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে, চাই কি বাড়িও চলে যেতে পারি। ফ্রন্টে গুলি খেয়ে পেট বুক ফুটো হবার চেয়ে ভাল অন্তত।

আমাদের পাশ দিয়ে রসদ ভর্তি ট্রাকের অবিশ্রান্ত মিছিল। দ্রুতগতিতে ছুটছে ফ্রন্টের দিকে। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে ঠাট্টা করছি আমরা। ওরাও হেসে উত্তর দিচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে একটা দেয়াল ফুটে উঠল। রাস্তাটা দেয়ালের পাশ দিয়েই চলে গেছে। লরিটা ঝাঁকুনি খেতে খেতে ওটার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মনে হলো রাজহাঁসের ডাক শুনলাম। ভুল শুনলাম নাকি? কান খাড়া করলাম তাড়াতাড়ি। নাহ্, ওই তো আবার শোনা যায়। আস্তে আস্তে কাটের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখি সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'ওস্তাদ, কিসের যেন ডাক শুনলাম মনে হলো?'

সুড়ুৎ করে জিভে জল টেনে নিল কাট। হাসিহাসি মুখে বলল, 'ঠিকই শুনেছ, বৎস। ক'টা আছে তা-ও জানি। কালকে ফিরে নিই আগে ক্যাম্পে। তারপর হবে।'

বাকি রাস্তাটুকু মনে মনে হাঁসের রোস্টের স্বাদ নিতে নিতেই পার হয়ে এলাম।

লরি পৌঁছুল আর্টিলারি লাইনে। এপাশে ওপাশে সারি সারি কামান। ঝোপঝাড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখা যেন আকাশ থেকে দেখা না যায়। শুধু কামানগুলো না থাকলেই পুরো পরিবেশটাকে অপূর্ব লাগত।

বাতাসে কুয়াশার সাথে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ মিশে ঝাঁঝাল একটা ভাব। মুখে ঢুকলে কটু একটা স্বাদ বোঝা যায়। এখান থেকেই ফ্রন্টের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। কামানের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি। লরিতে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট অনুভব করলাম কাঁপুনি। কামানের আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে বহুদূর চলে যাচ্ছে।

সবার মুখের দিকে তাকালাম। অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার বোঝা গেল, মুখের ভাব বদলে গেছে সবারই।

এটা ভয়ের জন্যে নয়। আমরা এসে পড়েছি, যার জন্যে এখানে আসা সেই ফ্রন্টেই এসে গেছি। এটা সেই অনুভূতিরই প্রকাশ শুধু। আমরা যারা পুরানো সৈনিক তারা এগুলোতে অভ্যস্ত। ভয় পেয়েছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নতুন যারা এসেছে।

'এই যে শব্দটা হলো, এটা বারো ইঞ্চি কামানের,' কাট নতুনদের শেখাচ্ছে, 'আওয়াজটা খেয়াল রেখো, পরে নিজেই চিনতে পারবে।

এখন ওটার ফাটার আওয়াজ পাবে।'

আওয়াজটা কিন্তু শোনা গেল না। ফ্রন্টের তুমুল গর্জনের মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

'আজ রাতে গোলাবৃষ্টি হবে,' চিন্তিত গলায় বলল কাট, 'টমিগানগুলোও চালু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে।'

অবিশ্রান্তভাবে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে ফ্রন্ট থেকে। মাঝে মাঝেই ভারি কামানের গোলা ফাটার শব্দ গুম্‌গুম্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসে। কাঁপিয়ে দিয়ে যায় সবকিছু।

খানিকটা এগোতেই আরও পরিষ্কারভাবে আলাদা করে চেনা গেল গোলার আওয়াজ। আমাদের ডান দিকের বৃটিশ ব্যাটারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে গোলাবর্ষণ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ন'টা বাজে প্রায়।

'হলোটা কি ওদের, রোজ তো ঘড়ি ধরে দশটার সময় শুরু করে!'

'কে জানে, ঘড়িটা বোধহয় একঘণ্টা ফাস্ট হয়ে গেছে ওদের।'

'আমি বলছি আজকে গোলা ফেলবে বৃষ্টির মত, দেখে নিও তোমরা,' একটু কুঁজো হয়ে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল কাট।

হঠাৎ আমাদের ঠিক পেছন থেকে সবক'টা কামান গর্জে উঠল একসাথে। ভয়ানক চমকে উঠলাম সবাই। কেউ কেউ সামনের জনের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় মৃদু ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল লরির মধ্যে। একটু পরেই আবার ঠিক হয়ে গেল সব।

'কাল সকালেই তো আবার ক্যাম্পে ফিরে যাব' কথাটা ভাবতেই অদ্ভুত শান্তিতে ভরে উঠল বুক।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি আরও পরিবর্তন হয়েছে চেহারায়। তাই বলে আমাদের মত পুরানো যারা তাদের মধ্যে ভয় পায়নি কেউ। এটা এমন একটা অনুভূতি যা বোঝানো যায় না। ফ্রন্টে এলে এটা হবেই। যে-মুহূর্তে একটা গোলার আওয়াজ পাওয়া যায়, সাথে সাথে সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। পেটের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি হয়, শিরায় শিরায় চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে ওঠে যে কোন কিছু একটা ঘটে যাবার আশঙ্কায়। মাঝে মাঝে

ভাবি, এটা কিসের জন্যে হয়? সম্ভবত ফ্রন্টের শব্দতরঙ্গ, নয়তো এই অবিরাম গোলাগুলিতে এমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি হয় যা সমস্ত স্নায়ুগুলোকে এক নিমেষে টানটান করে তোলে। প্রত্যেকবার ফ্রন্টে আসলেই এরকম হয় সবার। যখন ক্যাম্প থেকে বেরোই তখন ভালমতই বেরোই, রাস্তায় আসতে আসতে হাসিঠাট্টা করি কিন্তু যেই ফ্রন্টের আওয়াজ শুনি অমনি বদলে যায় পরিবেশ। তখন প্রতিটা কথার মানে পর্যন্ত বদলে যায়। এই যেমন কাট বলল যে আজ গোলাবৃষ্টি হবে। এ কথা যদি ও ক্যাম্পে বলত তো সেটা এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দিতাম। কিন্তু এখন ওর কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছি। কাট যখন বলেছে, তখন গোলাবৃষ্টি হবেই।

ফ্রন্টকে আমার মনে হয় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা বিশাল একটা অজগর। ফ্রন্টের আওয়াজ শুনলেই মনে হয় অজগরের ফোঁসফোঁসানি। ওর চোখের সম্মোহনের অমোঘ আকর্ষণে অনিবার্যভাবেই আমরা গিয়ে পড়ব ওর কুণ্ডলীর মধ্যে। জড়িয়ে ধরে হাড়গোড় চুরমার করে আস্তে আস্তে গিলে ফেলবে আমাদের।

মাটির ওপর দিয়ে যখন হাঁটি তখন মনে হয় আকাশ, বাতাস, বিশেষ করে মাটি থেকে কি প্রচণ্ড এক শক্তি যেন আমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। একজন সৈনিকের কাছে মাটির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। যখন গোলা ফাটছে, বোমা পড়ছে, তখন প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা একজন সৈনিকের কাছে মাটির চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। সে-ই তখন তার মা, বাবা, আত্মীয়, বন্ধু সবকিছু। মাটিই হয়তো তার আয়ুটা বাড়িয়ে দিল দশ সেকেণ্ড যাতে করে সে লাফ দিয়ে যেতে পারে আরও নিরাপদ কোন আশ্রয়ে। হয়তো এই দশ সেকেণ্ডের জন্যে সে বেঁচে গেল সেবার, হয়তো পঞ্চাশ বছরের জন্যেই।

ফ্রন্টে এলে সবার মধ্যেই বোধহয় অতিরিক্ত একটা বোধ এসে যায়। এটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। হয়তো একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের গর্তে। পরমুহূর্তেই

তার ওপর দিয়ে বিদ্যুদগতিতে ছুটে গেল স্প্লিন্টার, এক সেকেণ্ড দেরি হলেই মাংসের কিমা হয়ে যেত শরীর। সে হয়তো শোনেইনি কিছু, তাকে জিজ্ঞেস করলেও হয়তো বলতে পারবে না কেন সে লাফিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওটুকুর জন্যেই বেঁচে গেল সে।

হঠাৎ করেই বনের পাশে থেমে গেল লরিটা। বুঝলাম পৌঁছে গেছি। লাফিয়ে লাফিয়ে নামা শুরু করলাম। নামা শেষ হতেই লরিটা মুখ ঘুরিয়ে রওনা দিল ক্যাম্পের দিকে। যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে। মনে হলো, এখন যদি ওটাতে চড়ে ফেরৎ যেতে পারতাম!

সারি বেঁধে দাঁড়ালাম সবাই, তারপর মার্চ করতে করতে রওনা হলাম সামনের দিকে। এখান থেকে শুরু হয়েছে ফ্রন্ট। এই মুহূর্ত থেকে আমাদের সমস্ত দয়া মায়া ভালবাসা ভুলে যেতে হবে, এখন থেকে আমরা মানুষের আদলে পশু ছাড়া আর কিছু নই।

মার্চ করতে করতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে হাতের বাঁয়ে পড়ল কতগুলো খাবার রাখার ঘর। ওগুলো পার হয়ে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল বন।

কুয়াশা আর গোলাগুলির ধোঁয়া মিলে কোমর সমান উঁচু একটা পাঁচিল তৈরি হয়েছে সামনে। চাঁদের আলোয় ঝক ঝক করছে চারপাশ। কুয়াশার পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা। রাস্তা ধরে মার্চ করতে করতে যাচ্ছে সবাই। এখান থেকে কোমরের ওপরটুকু দেখা যাচ্ছে শুধু। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে ইস্পাতের হেলমেট আর রাইফেলের নল থেকে। হাঁটার তালে তালে কাঁপছে রাইফেলগুলো।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গিয়েছে কুয়াশার পাঁচিল। এবার পুরো শরীরটা বেরিয়ে এল কুয়াশার ভেতর থেকে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে নিচের অংশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওদের। হাসি পেল মনে মনে।

কিছুদূর যেতেই আবছা হয়ে গেল সৈনিকদের সারি। এখন আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না কাউকে। মনে হচ্ছে একটা ট্রেন, আস্তে

আস্তে ঢুকে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের মধ্যে।

এ রাস্তাটাকে আড়াআড়িভাবে কেটে বেরিয়ে গেছে আরেকটা চওড়া রাস্তা। ওটা দিয়ে কামান আর রসদ বোঝাই গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে আরও সামনে। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে বেশ কিছু সৈনিক। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে ঘোড়াগুলোর গা থেকে, মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে চোখ। মাথা ঝাঁকিয়ে কেশর দুলিয়ে দুলকি চালে চলছে ওগুলো। হেলমেট পরা সৈনিকদের মনে হচ্ছে সেকালের নাইট। পুরো দৃশ্যটা এত অবাস্তব আর এত সুন্দর লাগছে যে চোখ ফেরাতে পারলাম না। আস্তে আস্তে অন্ধকারের গর্তে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

মাঠের মধ্যে স্টোরে পৌঁছেই দ্রুত কাজে নেমে পড়লাম। মালপত্রের ভেতর থেকে বের করা হলো লোহার গজাল, মাথাটা চোখা আর বাঁকানো। কয়েকজন কাঁটাতারের বাণ্ডিলের মধ্যে লোহার লম্বা রড ঢুকিয়ে দু'পাশ থেকে ঘাড়ে তুলে নিল। প্রয়োজনীয় মালপত্র নেয়া হতেই রওনা হলাম আমরা।

আমাদের সামনে একজন পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। তার কাজ হলো গর্ত, ট্রেঞ্চ এইসব বাঁচিয়ে চলা। কিছুক্ষণ পরপরই তার চিৎকার শুনছি, 'ডানে গর্ত, বাঁয়ে ট্রেঞ্চ আছে কিন্তু, সাবধান!' আমরাও প্রত্যেকটা পা ফেলার আগে হাতের লাঠিটা দিয়ে দেখে নিচ্ছি, কিসের ওপর পা ফেলতে যাচ্ছি।

হঠাৎ করেই লাইনটা থেমে গেল। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সামনে। আমার সামনেই ছিল কাঁটাতারের বাণ্ডিল। সরতে না সরতে গালের মধ্যে গেঁথে গেল কাঁটা। কষে গালি ঝাড়লাম, বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয় অবশ্য।

ভাল করে খেয়াল করতেই থেমে যাবার কারণটা বুঝলাম। রাস্তার মধ্যে গোটাকয় লরি ভেঙেচুরে পড়ে আছে। গোলার আঘাতে ওগুলোর এই দশা।

'সিগারেট, পাইপ নেবাও,' ধমকে উঠল কে যেন, 'ফ্রন্টে এসে পড়েছ খেয়াল নেই?'

একখণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদকে। সাথে সাথে ঝপ করে অন্ধকার নামল প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত। ছোট্ট একটা বনের মধ্যে ঢুকতেই অন্ধকার এমন ঘন হয়ে উঠল যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। কোনরকমে এগাছে ওগাছে ধাক্কা খেতে খেতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ফ্রন্ট লাইন ঠিক সামনেই।

দিগন্তের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একটা কাঁপা কাঁপা লাল আলো ছড়িয়ে আছে। সারাক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ওখানে। কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে ছিটকে উঠছে বেশ খানিকটা ওপরে। কতকগুলো উঠে যাচ্ছে আরও অনেক উঁচুতে। কতকগুলো আলোর বল একটা আরেকটার পেছনে ঠেলাঠেলি করতে করতে অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে ওপরে, বেশ খানিকটা উঠে ফেটে পড়ছে লাল, শাদা আর সবুজ তারার ফুলঝুরি ছিটিয়ে। সাঁ সাঁ করে একটা ফ্রেঞ্চ রকেট উঠল প্রচণ্ড গতিতে। এত জোরে উঠল যে ওটার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। অনেক ওপরে উঠে জ্বলে উঠল ওটা। সিল্কের প্যারাশুট খুলে গেল। ধীরে সুস্থে নামছে এখন। ওটার প্রখর আলোয় দিনের মত হয়ে উঠল চারপাশ।

কেমন অস্বস্তি লাগল। মনে হলো, দিনের বেলায় শত্রুর সামনে একেবারে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেরার প্রচণ্ড তাগাদা অনুভব করলাম মনে মনে।

একমিনিট মত লাগল ওটার পুড়ে শেষ হতে। ওটা শেষ হতেই উঠল আরেকটা। তারপর আরেকটা।

'গোলাবৃষ্টি হবেই,' নিশ্চিত গলায় বলল কাট।

ওর কথা শেষ হবার আগেই যেন একশোটা বাজ পড়ল পেছনে। একসাথে গর্জে উঠল সারি সারি লুকিয়ে রাখা কামান। হঠাৎ করে এত কাছ থেকে বিকট আওয়াজে অভ্যস্ত থাকলেও কেঁপে উঠল সবাই। টালমাটাল হয়ে পড়ল লাইন।

'সাবধান, ঠিকমত চলো তাড়াতাড়ি!'

তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলাম সবাই। বহুদূরে একসাথে ফাটল

গোলাগুলো। পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি।

মাথার ওপর দিয়ে অন্তহীনভাবে তীব্র শিষ কেটে চলে যাচ্ছে গুলি। আমরা এতই অভ্যস্ত এগুলোতে যে শব্দ শুনেই বলে দিতে পারি কি ওগুলো। হিস্‌স্‌, বিঙ...ঙ, টুঁই করে যেগুলো যায় ওগুলো হালকা ধরনের। আর যেগুলো যাবার সময় অর্গানের মত মোটা আওয়াজ বেরোয় সেগুলো ভারি কামানের গোলা। ওগুলো যাবার সময় চাপা পড়ে যায় অন্যসব শব্দ।

গোলার শব্দ শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে গেল বুনো-হাঁসের কথা। গত বছর এখান দিয়েই উড়ে গিয়েছিল ওরা। যুদ্ধ ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। মনে হলো ওরাই হয়তো আমাদের চেয়ে সুখী।

পেছন থেকে দপ করে একসাথে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। আকাশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু হয়ে গেল। দেখে মনে হলো, বিশাল লম্বা শাদা মোমবাতি দিয়ে আকাশের গায়ে হারিয়ে যাওয়া কিছু খুঁজছে কেউ। একটা আলো হঠাৎ এক জায়গায় প্রায় থেমে গিয়ে একটু একটু কাঁপতে থাকল। সাথে সাথে ওটার পাশে চলে এল আরেকটা আলো। পরিষ্কার দেখা গেল দুটো আলোর মাঝখানে ধরা পড়ে গেছে কালো একটা ফাইটার প্লেন। মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল অ্যান্টি এয়ারক্রাফটগান। লেজ গুটিয়ে পালাবার আগেই বিস্ফোরিত হলো ওটা। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল মাটিতে পড়ার আগেই।

কাজ শুরু করে দিলাম আমরা। প্রথমে লোহার খুঁটিগুলো পুঁতে দিতে হবে। একদল লেগে গেল এই কাজে। আমরা দু'জনে কাঁটাতারের কুণ্ডলী উঁচু করে ধরলাম। একজন সেটাকে খুলতে খুলতে এগোল, অন্যজন খুঁটির সাথে লাগিয়ে দিতে থাকল। এই তারগুলোর গায়ে বড় বড় কাঁটা। আমি এই কাঁটাতারের কাজে একেবারেই অভ্যস্ত নই। যেজন্যে এরই মধ্যে আমার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তার ভেতরে আবার ঢুকেছে মাটি। জ্বালা করছে প্রচণ্ড। কিন্তু কিছু করার নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে শেষ হলো কাজ। প্রচণ্ড পরিশ্রমে জান বেরিয়ে যাবার দশা। শুয়ে পড়েছি যে যেখানে পারি। লরি আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। ঘুম দেবার চেষ্টা করলাম। সুবিধে হলো না। সাগর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে মাঝে মাঝে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়, হঠাৎ করেই জেগে উঠলাম। এক মুহূর্ত বুঝলাম না আমি কোথায় শুয়ে আছি, এটা সকাল না বিকাল। আকাশে তারার মেলা, আলো ছড়িয়ে গোলা নয়তো হাউই ছুটে যাচ্ছে। কানে আসছে ফ্রন্টের শব্দ, মনে হলো, কোন বাগানবাড়ির উৎসবে বোধহয় হঠাৎ করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মনে হলো, অনেক দূর থেকে কেউ আশ্চর্য নরম গলায় কথা বলছে, আস্তে আস্তে কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। আমি কি শিশু? আমি কি কাঁদছি? মনে হলো মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনছি। আপনা থেকেই চোখ মুদে এল আমার। সাথে সাথেই সচকিত হয়ে উঠলাম। চোখ মেলতেই দেখি পাশে কাট, পাইপ টানছে। এ পাইপগুলোর আগুন বাইরে থেকে দেখা যায় না।

'ওই শব্দে ঘুম ভাঙল নাকি?' আমাকে জাগতে দেখে জিজ্ঞেস করল কাট, 'ওটা একটা নোজ ক্যাপ, ওপাশের ঝোপের মধ্যে পড়েছে।'

উঠে বসলাম। বড় একা লাগছে। কেন জানি না প্রচণ্ড একটা হতাশা আর শূন্যতার বোধ গ্রাস করল আমাকে। মনে হলো কাট পাশে না থাকলে আমি হয়তো আত্মহত্যাই করতাম।

'আলোর ছুটোছুটি দেখতে তো ভালই লাগে, কি বলো? কেবল নিরাপদ জায়গায় থাকলেই হয়।'

কাটের কথা শেষ হবার আগেই আমাদের ঠিক পেছনে প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটল একটা। কান চেপে ধরে মাথাটা নিচু করলাম শুধু। অভ্যস্ত হয়ে গেছি এতে। কিন্তু রংরুটগুলো অস্থির হয়ে উঠল ভয়ে। অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। কিছুক্ষণ পর আরেকটা পড়ল। এবার আরও কাছে। চেঁচিয়ে উঠল রংরুটগুলো।

'মনে হচ্ছে ফাঁদে পড়ে গেছি,' পাইপটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কাট, 'তাড়াতাড়ি বেরোতে হয় এখান থেকে।'

কাটের কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল আক্রমণ। গোলা পড়তে লাগল ডানে বাঁয়ে, সামনে-পেছনে। একটা পড়ল একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়। চিৎকার, গোলা ফাটার শব্দ, ছোটাছুটি সবকিছু মিলিয়ে এক মুহূর্তে নরক গুলজার হয়ে উঠল। তবু ক্রল করে সামনের দিকে এগোতে থাকলাম। দপ করে সামনে জ্বলে উঠল সবুজ আলো। ফ্লেয়ার। দিগন্ত পর্যন্ত দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল সামনে। সুতরাং ও পথ বন্ধ। সাথে সাথে ফিরলাম পেছন দিকে।

পাশে দেখি একজন রংরুট, ঝাঁকড়া চুল। ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটির মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার হেলমেটটা পাশে পড়ে আছে উল্টো হয়ে। তাড়াতাড়ি ঠেলে চিৎ করে দিলাম। নাহ্, বেঁচে আছে। ভয়ে চোখ ঠিকরে পড়ার জোগাড়, মুখ কাগজের মত শাদা।

হেলমেটটা তুলে মাথায় বসিয়ে দিতে গেলাম, ঠেলে সরিয়ে দিল হাত। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে মুখ ঘষতে থাকল শুধু। ধরে রাখলাম ওকে ওভাবেই। একেবারে বাচ্চা ছেলে, সরু সরু হাত-পা। ঠিক কেমারিখের মত লাগল ওকে। আরও জোরে চেপে ধরলাম বুকের সাথে। হেলমেটটা তুলে ওর কোমরের ওপরে রাখলাম, তবু অন্তত কাজ দেবে খানিকটা। কোমরে ঘা খেয়ে যদি বেঁচেও যায় তো বাকি জীবন উপুড় হয়ে শুয়ে কাটানো একেবারে নিশ্চিত।

কেউ আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। চিৎকার আর গোঙানি শুনতে পাচ্ছি এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যেও।

আস্তে আস্তে গোলাবর্ষণ কমে এল, সরে যেতে থাকল আরও পেছনে, রিজার্ভ সৈন্য যেদিকে আছে ওদিকে। মাটি থেকে আস্তে করে মাথা তুললাম। আকাশে এখন লাল রকেট ছুঁড়ছে ওদিক থেকে, তার মানে আরেকটা আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে শিগ্গিরই।

সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে আমাদের এখানটা। উঠে বসে ঝাঁকুনি দিলাম রংরুটটার কাঁধে, 'ওঠো এবার, এদিকে থেমে গেছে সব।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ও। হতভম্বের মত তাকাতে লাগল চারপাশে।

'এই তো, আর ক'টা দিন, তারপরই দেখো এসব পানির মত হয়ে যাবে।'

পিঠটা চাপড়ে দিয়ে চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দিলাম ওর। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠল ও। হেলমেটটা তুলে মাথায় দিল। হঠাৎ করেই চোখ মুখ লাল হয়ে গেল ওর, বোকার মত লাজুক হাসি দিতে লাগল আমার দিকে তাকিয়ে। খেয়াল করতেই দেখি পেছন দিকে হাত দিয়ে আছে ও। সাথে সাথে বুঝলাম ব্যাপারটা কি।

'আরে লজ্জার কি আছে,' ওর পিঠে আস্তে করে দুটো চাপড় মেরে বললাম, 'এ-তো সাধারণ ব্যাপার। বন্দুকের গুলির শব্দ শুনেই কতজন প্যান্ট নষ্ট করে ফেলে আর এ-তো কামানের গোলা। যাও যাও, তাড়াতাড়ি ওই ঢিবিটার আড়ালে গিয়ে আণ্ডারঅয়্যারটা খুলে ফেলে দিয়ে এসো।'

গোলাগুলি থেমে গেছে একেবারে, কিন্তু চিৎকার আর থামে না।

'কি ব্যাপার, ক্রপ?'

'ওদিকের দলটার অবস্থা কাহিল মনে হচ্ছে।' চিৎকার চলছে অবিরাম। বীভৎস চিৎকারে গায়ের লোমগুলো শিরশির করে উঠল। কোন মানুষের চিৎকার নয় এটা, মানুষের পক্ষে এমন করে চিৎকার করা সম্ভব না।

'আহত ঘোড়া,' জানাল কাট।

অসহ্য, রক্ত হিম করা চিৎকার, সারা পৃথিবী যেন কাতরাচ্ছে, সমস্ত সৃষ্টিকে যেন জবাই করা হচ্ছে, ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে তার গলার ভেতর থেকে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছে সবক'টা ঘোড়া। হঠাৎ করে প্রচণ্ড হয়ে উঠল চিৎকার। সড়সড় করে খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের ওপরের চুলগুলো।

লাফিয়ে উঠল ডেটারিং, 'ঈশ্বরের দোহাই, মেরে ফেল, কেউ গুলি করে মেরে ফেল ওদের, আর সহ্য হয় না!' চাষী ও ঘোড়া যে ওর কত প্রিয় সেটা শুধু ও-ই জানে।

মাঝখানে আবার গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছিল, এখন আবার থেমে গেছে। ঘোড়াগুলো কেঁদেই চলেছে। আরও জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে। প্রতিটা চিৎকারের সাথে সাথে মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

চারপাশে সব ঠাণ্ডা, গাঢ় অন্ধকারে মিটমিট করছে তারার আলো, থেকে থেকে ভেসে আসে সেই অপার্থিব চিৎকার। এখন আর বোঝা যাচ্ছে না কোনদিক থেকে আসছে শব্দগুলো। বিশ্বচরাচর ডুবে গেল সেই চিৎকারে, মনে হলো সারা পৃথিবী জুড়ে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্র আর্তনাদ করছে সবাই। অসহ্য! কানে দু'হাত চেপে মাটিতে বসে পড়লাম। তবু চিৎকার থামে না। সারা শরীর দিয়ে শুনতে পাচ্ছি সেই চিৎকার।

ডেটারিং দু'হাত দিয়ে চুল টানতে থাকে অসহ্য যন্ত্রণায়, 'গুলি করো, মেরে ফেল। ওহ্ ঈশ্বর, মেরে ফেল ওদের!'

ওর কাঁধে হাত রাখল কাট, সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ওদের দেখা গেলে তো গুলি করবে! আর তার আগে মানুষের দিকেও তো নজর দিতে হবে।'

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। দেখবার চেষ্টা করলাম কোথায় ওগুলো। মনে হলো দেখতে পেলে অন্তত এই অসহ্য চিৎকার সহ্য করতে পারব খানিকটা। মুলারের কাছে বিনোকিউলার আছে, ওটা চোখে লাগাল ও। দূরে দেখা গেল মানুষজন, স্ট্রেচার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, ওদের চারপাশ দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কালো কালো মূর্তি। ওগুলোই আহত ঘোড়া। কিন্তু ওগুলো ছাড়াও দূরে আরও আছে, দৌড়াচ্ছে, চিৎকার করছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার ছুটছে। একটা ঘোড়া পেট ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঝট করে রাইফেলটা নিয়েই ওদিকে তাক করল ডেটারিং। ঝটকা মেরে ওটাকে সরিয়ে দিল কাট, 'পাগল হয়েছ নাকি?'

প্রাণপণে কান চেপে ধরলাম, কিন্তু সেই চিৎকার, সেই আর্তনাদ

সমস্ত কিছু ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। আর সহ্য করতে পারছি না। দৌড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার ইচ্ছেটা দমন করলাম অতি কষ্টে।

এখনও স্ট্রেচার নিয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন। এমন সময় একটা গুলির আওয়াজ হলো। ছিটকে পড়ল একটা কালো মূর্তি। যাক, একটা শেষ হলো। সৈনিকটাকে দেখতে পেলাম এবার। আরও এগিয়ে গেছে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে তাক করল রাইফেলটা। গুলির শব্দের সাথে সাথে আরও একটা কালো মূর্তিকে পড়ে যেতে দেখলাম। আর্তনাদের তীব্রতাও কমে এল খানিকটা। আরও গোটাদুই ফেলল সে ওখান থেকেই। সবশেষের ঘোড়াটার কোমরে লাগল গুলি। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগল। দৌড়ে গেল সৈনিকটা। কাছ থেকে মাথায় গুলি করল। একবার খিঁচুনি দিয়েই নিঃসাড় হয়ে গেল ওটা।

কান থেকে হাত সরিয়ে নিলাম এতক্ষণে। থেমে গেছে চিৎকার। তবু মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে, যেন এই পৃথিবীর ওপার থেকে কেঁদে কেঁদে ফিরছে কেউ। লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়লাম একটা।

আকাশে হাউই, গোলার আলো আর নক্ষত্র। কেমন যেন অবাস্তব আর অদ্ভুত মনে হলো সবকিছু।

ডেটারিং অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এপাশ ওপাশ। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছে কাকে যেন, 'জাহান্নামে যাক সব। যুদ্ধে যারা ঘোড়া নিয়ে আসে, সবক'টা জাহান্নামে যাক।'

রওনা হলাম আমরা। ফেরার সময় হয়ে গেছে, প্রায় তিনটে বাজে এখন। ফিকে হয়ে আসছে আকাশ, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। মাটি কাদায় ভূতের মত চেহারা হয়েছে এক‌েকজনের। শীত করছে বেশ। দু'হাত জড়ো করে পা চালালাম তাড়াতাড়ি।

ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে, গোলার গর্তের পাশ কাটিয়ে সার বেঁধে হাঁটতে লাগলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সেই কুয়াশার মধ্যে।

কাটকে কেন যেন খুব অস্থির লাগছে। খুব খারাপ লক্ষণ এটা। ক্রপ জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো তোমার?'

'খুব ভাল ঠেকছে না। বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।'

'বাড়ি মানে, ক্যাম্পে তো?'

'ওই হলো, একই কথা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কি হবে!'

'আমরা তো এখনই রওনা দেব, কাট, এত চিন্তা করছ কেন?'

'রওনা দিতে পারলেই ভাল। আমার কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চটা পার হয়ে খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা। দূরে বনভূমি দেখা যাচ্ছে, পাশে কবরস্থান। এখানকার প্রতিটা ইঞ্চি জায়গা আমাদের চেনা। চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও অনায়াসে পৌছে যাব জায়গামত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা।

ঠিক তক্ষুণি নরক ভেঙে পড়ল আমাদের পেছনে। কোটি কোটি বাজ যেন একসাথে গর্জে উঠল। বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম মাটিতে। মুহূর্তে কাদা মাটি আর কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেলাম সবাই। পরমুহূর্তেই আরেক ঝাঁক গোলা ফাটল বনের মধ্যে। অলস ভঙ্গিতে শূন্যে উঠে গেল গোটা পাঁচ ছয় গাছ। তারপর নামতে শুরু করল দ্রুত। টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে।

তক্ষুণি সেফটি ভালভের মুখ খুলে দিলে যেমন হিস্‌স্‌ আওয়াজ হতে থাকে তেমনি শব্দ শুরু হলো পাশ থেকে। তার মানে ভারি গোলাবর্ষণ।

'লুকাও,' চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'কাভার নাও।'

চারপাশে সমান জায়গা, বনভূমি বেশ দূরে, এবং এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিপজ্জনক। একমাত্র জায়গা কবরস্থান আর তার আশেপাশের ঢিবিগুলো। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে দেখা হয়ে গেল এসব। ছুটলাম সাথে সাথে। চার পাঁচ সেকেণ্ড লাগল এখানে পৌছুতে। কিন্তু মনে হলো অনন্ত কাল ধরে ছুটছি আর ছুটছি। কবরস্থানে পৌছে যে যেখানে ঢিবি পেলাম সেটার আড়ালেই মাথা মাটিতে গুঁজে দিয়ে সেঁটে রইলাম।

একেবারে কাঁটায় কাঁটায় কাভার নিয়েছি। শেষজন ঢিবির আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। আমরা

যেখানে ছিলাম, সে জায়গাটা বিস্ফোরণে ছত্রখান হয়ে গেল এক নিমেষে। প্রলয় শুরু হলো চারপাশে, গোলা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার দশা হলো। মাটি, ইট, পাথর ছিটকে উঠছে, বৃষ্টির মত পড়ছে গায়ে-মাথায়। কালো ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে চারপাশ। রাতের চেয়ে গাঢ় কালো ধোঁয়া গ্রাস করল আমাদের। মনে হলো বিশাল এক দৈত্য মুহূর্তে গিলে ফেলল সবকিছু। ধোঁয়া চোখে যেতেই জ্বালা করে উঠল চোখ। খক্ খক্ করে কাশি শুরু হয়ে গেল আশেপাশে। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল ঝরঝর করে।

গোলা ফাটার আর বিরাম নেই, চলছে তো চলছেই। বিস্ফোরণের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে কবরস্থান।

কোনদিকে পালাবার উপায় নেই। একটু মাথা উঁচু করে তাকালাম চারপাশে। মনে হলো ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে পড়ে আছি আমরা। চারদিকে মাটির সাগর ফুঁসছে, দুলছে, ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড গর্জনে। ফেনার মত ছিটকে উঠেছে মাটি, যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারি ওর নিচে। সবকটা নরকের দরজা যেন খুলে গেছে একসাথে।

বনভূমির দিকে তাকিয়ে দেখি অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা। ছত্রভঙ্গ, টুকরো টুকরো উঁচু-নিচু কাঠ, ডালপালা আর মাটির স্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। কবরস্থান ছেড়ে যাবার জায়গা নেই কোথাও।

বৃষ্টির মত মাটি কাদা ছিটকে আসছে। মাথা আবার নিচু করার আগেই বড় একটা ঢেলা এসে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল মাথায়। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। ধপ্ করে মাথাটা পড়ল মাটিতে। খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলাম ওভাবেই। তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে যেই সোজা হতে গেলাম, কোথা থেকে স্প্লিন্টার ছুটে এসে কনুই-এর কাছ থেকে জামার হাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। ধক করে উঠল বুকের ভেতরে। জমে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতেই অনুভব করলাম ব্যথা নেই হাতে। খুব একটা ভরসা পেলাম না, হাত উড়ে গেলেও সাথে সাথে ব্যথা না-ও হতে পারে। ভয়ে ভয়ে অন্য হাতটা নিয়ে গেলাম ওখানে। নাহ্ আছে, হাতটা আছে এখনও। ভাল করে টিপেটুপে

দেখলাম। ছড়ে গেছে শুধু। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল যেন।

ঠক্ করে মাথায় লাগল শক্ত কিসের যেন টুকরো। কোন কথা না বলে পড়লাম মাটিতে। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হলো বহু দূরে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, কে যেন নাম ধরে ডাকছে আমার। মনে হলো, মায়ের কোলে শুয়ে আছি, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলছে মা। আস্তে করে ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে মনের গভীরে কে যেন বলে উঠল, 'খবরদার! জ্ঞান হারালেই মৃত্যু!' মাথাটা ঝাঁকুনি দিলাম বারকয়েক। দ্রুত হুঁশ ফিরে এল। মাথায় হাত দিয়ে দেখি, একটা স্প্লিন্টার, গেঁথে গেছে হেলমেটের মধ্যে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেছি আমি। আসলে মাথায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগতেই প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

চোখ থেকে তাড়াতাড়ি কাদা মুছে ফেললাম। সামনেই দেখি বিরাট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, ধোঁয়া উঠছে ওর ভেতর থেকে। ওর মধ্যে থাকাটা এখন অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এক জায়গায় দু'বার গোলা প্রায় পড়ে না বললেই চলে।

পা দুটো বুকের কাছে এনে সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলাম মাটিতে। মাছের মত পিছলে গেলাম গর্তের কিনারা পর্যন্ত। তীব্র শিস দিয়ে উঠল বাতাস। আরেকটা গোলা আসছে। আঁকুপাঁকু করে উঠল বুকের মধ্যে। উপুড় হয়ে পড়ে পাগলের মত হাতড়াতে থাকলাম এদিক ওদিক। বাঁ হাতে শক্ত কি যেন ঠেকল। জলে ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরলাম ওটাকে। মুড়মুড় করে ভেঙে চলে এল হাতে। আবার খামচে ধরলাম ওটাকেই। ওটা যে কি জিনিস দেখার অবস্থা নেই তখন। মাথার মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা, কোনকিছুর নিচে ঢুকতে হবে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়ছে। গোলার শব্দ মাথায় ধাক্কা মারছে, মাথা ছিঁড়ে যেতে চাইছে, মাটি কাঁপছে ভয়ঙ্কর রকম। হাঁচড়ে পাঁচড়ে বাঁ হাতে ধরে থাকা ভাঙা কাঠের টুকরোটা টেনে ওর নিচে ঢোকার চেষ্টা করলাম। খানিকটা পচা কাঠ আর ছেঁড়া কাপড়, তাই পিঠের ওপর চাপালাম।

সামান্য হলেও আচ্ছাদন তো! তবুও কিছুটা শান্তি।

চোখ মেললাম আস্তে করে। ধীরে ধীরে হাত নড়াতেই কার যেন আঙুলের ছোঁয়া লাগল। ঠাণ্ডা। আরেক হাত বাড়াতেই পুরো বাহুটারই স্পর্শ পেলাম। কোন আহত মানুষ নাকি? চিৎকার করে ডাকলাম, হাত ধরে টানাটানি করলাম, কোন উত্তর পেলাম না। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল, এটা কবরস্থান, ওটা একটা মৃতদেহ। সেজন্যেই হাতটা অত ঠাণ্ডা।

গোলাবর্ষণ এত প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে মনে হলো সত্যি সত্যি মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। এবার সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। তবু বাঁচার ইচ্ছা রয়ে যায়। সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে, শুধু সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরছে, যে করেই হোক বাঁচতে হবে। প্রাণপণে কফিনের আরও নিচে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। কফিনের মধ্যে মড়া, তার নিচে আমি, জীবন্ত, তবু ওই মৃত মানুষটাই হয়তো বাঁচাবে আমাকে।

আমার সামনে হাঁ করা গর্ত। কত কি যে ছিটকে এসে পড়েছে তার ঠিক নেই। এত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলছে যে কোন গোলার শব্দ আলাদা করে চেনার উপায় নেই।

ঘাড়ের ওপর কার যেন একটা হাত এসে পড়ল। শিরশির করে উঠল সারা শরীর। কোন মরা মানুষের হাত নাকি? না তো, জোরে চাপ দিচ্ছে ঘাড়ে। অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাট। ওর মুখ দেখে বুঝলাম প্রাণপণে চিৎকার করছে কিন্তু দু'হাত দূরে থেকেও একটা বর্ণ বুঝলাম না কি বলছে ও। হাঁচড়ে পাঁচড়ে এগোল ও খানিকটা। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, 'গ্যাস, গ্যাস আক্রমণ শুরু হবে এক্ষুণি, মাস্ক পরে ফেল তাড়াতাড়ি।'

আমার কাছ থেকে খানিকটা দূরে আরেকজন শুয়ে আছে। এখান থেকে হাজার ডাকলেও শুনতে পাবে না ও। ডাকারও কোন উপায় নেই। মনে হলো, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ফেরাই আমার দিকে, বলি গ্যাস মাস্ক পরতে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, ফিরলই না ও এদিকে। অসহ্য মনে হতে

লাগল, আমার চোখের সামনে মারা যাবে ও, শুধু জানাতে পারছি না যে মাস্ক পরতে হবে। শেষে বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। কাটের দিকে তাকালাম। ইঙ্গিতে বোঝালাম কি করতে যাচ্ছি। একটু ভেবে সায় দিল ও।

কাট এর মধ্যেই মাস্ক পরে ফেলেছে। আমিও আমারটা পরে ফেললাম। হেলমেটটা ঠিক করে এক লাফে বেরিয়ে পড়লাম কফিনের নিচ থেকে। কাছে গিয়ে দেখি ও একজন রংরুট। ওর মাস্ক ধরে টান দিতেই ফিরে তাকাল আমার দিকে। ইশারায় বোঝালাম কি করতে হবে। বুঝল, সাথে সাথে পরে ফেলল মাস্ক। আবার এক লাফে ফিরে এলাম কফিনের নিচে।

ভোঁতা আওয়াজ করে শেলগুলো এল। শেল ফাটার ঠিক আগের মুহূর্তের ধাতব শব্দে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল ওটা গ্যাস শেল।

আমার পেছনে আরও কয়েকজন গুটিসুটি মেরে সরে এসেছে। মাস্কের গ্লাস পরিষ্কার করে তাকালাম। দেখি কাট, ক্রপ আর অন্য একজন। প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে বসে আছি চারজন, নিঃশ্বাস নিচ্ছি যতটা কম পারা যায়।

গ্যাস আক্রমণের প্রথম মিনিটটাই সবচেয়ে আতঙ্কের। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দুলতে হয় এই একটা মিনিট। সন্দেহ, গ্যাস-মাস্ক এয়ার টাইট হলো কিনা। চোখের সামনে ভেসে উঠল হাসপাতালে দেখা গ্যাসে আক্রান্ত রোগীর চেহারা, কাশতে কাশতে পোড়া ফুসফুসের টুকরো উগরে দিচ্ছে। নিজের অজান্তেই মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। অসম্ভব, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

ভয়ে ভয়ে মাস্কের মাউথ পিস্‌টা আবার চেক করলাম। নাহ্‌, ঠিকই আছে। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম।

এতক্ষণে গ্যাসের দেখা পেলাম। আসছে, দ্রুত ধেয়ে আসছে সে। মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে, পাক খেয়ে মোচড় খেয়ে আসছে সে অমোঘ নিয়তির মত। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকলাম সেই বিশাল জেলী ফিশের মত গ্যাসের দিকে। গর্তের কিনারে এল, গড়িয়ে নামা শুরু

করল আরও দ্রুত। মুহূর্তে ভরে উঠল গর্ত। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম বাইরে বেরুবো। কারণ গর্তের মধ্যে জমে থাকে গ্যাস, বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে ওটার কার্যকরী ক্ষমতা। এক পা বের করেছি কেবল, সমস্ত কামানের গোলা যেন একসাথে ফেটে পড়ল বাইরে। বড় বড় মাটির চাঁই ছিটকে উঠল আকাশে, লাল হয়ে উঠল চারপাশ।

একটা কফিন আমাদের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নিচে নামল। দেখি ওটার নিচে চাপা পড়েছে চতুর্থজনের বেরিয়ে থাকা হাত। অন্য হাত দিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করেছে গ্যাস-মাস্ক খোলার জন্যে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কাট। এক হাত দিয়ে মুচড়ে ধরল ওর হাতটা। অন্য হাত দিয়ে কফিনটা সরানোর চেষ্টা করতে লাগল। যোগ দিলাম আমিও।

কফিনের ডালা আগেই আলগা হয়ে গিয়েছিল, টানাটানির চোটে খুলেই গেল। বেরিয়ে এল কাপড়ে জড়ানো লাশ। ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলাম ওটাকে একেবারে গর্তের তলার দিকে।

অনেক হালকা হয়ে গেল কফিনটা এবার। এর মধ্যে দেখি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সৈনিকটা। সুবিধাই হলো তাতে। এবার দু'হাত লাগাল কাট। ক্রুপও এসে হাত লাগাল আমাদের সাথে। তিনজন মিলে টানাহেঁচড়া করে খুলে ফেললাম কফিনের জোড়াগুলো।

কাট একটা ছোট কাঠের টুকরো নিয়ে আহত সৈনিকটার হাতের নিচে রাখল। সাথে ব্যাণ্ডেজ যা ছিল সবগুলো দিয়ে বেঁধে দিল হাতটা। এর চেয়ে বেশি কিছু আর করা যাবে না এখন।

মাস্কের ভেতরের বাতাসটুকুই এতক্ষণ টানছি আর ছাড়ছি সেজন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভর্তি হয়ে গেছে ওর মধ্যে। গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। কানের পাশে শিরা দপ দপ করছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব। একটু বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে বুকের ভেতরটা আকুলি বিকুলি করে উঠল।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ম্লান একটা হলদেটে আলো এসে পড়ল গর্তের মধ্যে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম গর্তের বাইরে। শেষ রাতের ম্লান

আলো চারপাশে। একটা আস্ত পা পড়ে আছে, পায়ে চকচকে বুট, একটা আঁচড়ও পড়েনি তাতে। এক ঝলকে দেখে নিলাম সব। খানিকটা সামনে কালোমত কি যেন নড়াচড়া করছে। তাড়াতাড়ি মাস্কের গ্লাসটা পরিষ্কার করে তাকালাম। লাফ দিয়ে উঠল কলজেটা। একজন লোক, মুখে মাস্ক নেই।

তবু অপেক্ষা করলাম কয়েক সেকেণ্ড, লোকটা পড়ে যায় কিনা। নাহ্, হেঁটে ফিরছে। এক ঝটকায় খুলে ফেললাম মাস্ক। ফুঁপিয়ে উঠলাম। সশব্দে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিলাম বুক ভর্তি করে।

গোলাবর্ষণ সম্পূর্ণ থেমে গেছে। চারপাশ এত শান্ত যে নিস্তব্ধতার প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাবার দশা হলো। মনে হলো কেউ অন্তত কথা বলুক, শব্দ করুক। তাড়াতাড়ি গর্তের কাছে গিয়ে ডাকলাম সবাইকে। আহত সৈনিকটাকে নিয়ে দ্রুত উঠে এল ওরা। একজন ওর হাতটা উঁচু করে ধরে থাকল। এগোলাম সামনের দিকে।

পুরো কবরস্থানটা একটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। ইঁট, কাঠের টুকরো, মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। বিস্ফোরণের ফলে বেশ কিছু কফিন উঠে এসেছে মাটির ওপরে। ডালা খুলে লাশগুলো ছিটকে গেছে বাইরে। গোলার আঘাতে দ্বিতীয়বার মরেছে ওরা। কিন্তু তার আগে অন্তত একজন করে সৈনিককে বাঁচিয়েছে। আশেপাশেই নতুন লাশ পড়ে আছে। রেললাইন উপড়ে গেছে, বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে শূন্যে।

খানিকটা সামনে যেতেই দেখি পড়ে আছে একজন। ফুঁপিয়ে উঠল আমাদের দেখে। নতুন রিক্রুট। আমি আর কাট থামলাম ওর কাছে। ক্রপ একাই আহত সৈনিককে নিয়ে চলে গেল।

কোমরের নিচে রক্ত থই থই করছে। গা গুলিয়ে উঠল মুহূর্তে। তাড়াতাড়ি আমার ফ্লাস্কটা হাতড়ালাম। ওর মধ্যে চা আর মদ মিশানো আছে। নিজে খানিকটা খেয়ে ওকে দিতে যেতেই হাত চেপে ধরল কাট।

'কোথায় লেগেছে তোমার,' সহানুভূতি ভরা গলায় জিজ্ঞাসা করল ও। শুধু চোখটা খুলল রংরুটটা, এত দুর্বল যে কথা পর্যন্ত বলতে পারল

না।

ওর প্যান্টের বোতাম খুলে প্যান্টটা আলগা করে দিলাম। চিৎকার করে উঠল ও, 'উহ্, আস্তে আস্তে, থাক থাক, যেমন আছে ওরকমই, উহ্!'

পাকস্থলীতে আঘাত লাগলে কিছু না খাওয়াই সবচেয়ে ভাল। সেজন্যে কাট ওকে খেতে দেয়নি কিছু। বমি করছে না ও, এটা ভাল লক্ষণ। কিন্তু প্যান্টটা আলগা করে যা দেখেছি, দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছে নেই আমার। একেবারে মাংসের কিমা হয়ে গেছে। মেরুদণ্ড পর্যন্ত ঘা খেয়েছে। বেঁচে থাকলে জীবনে আর সোজা হয়ে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, বসতেও পারবে না।

ওর কপালটা মদ মেশানো চা দিয়ে একটু ভিজিয়ে দিলাম, সামান্য দু'এক ফোঁটা ঠোঁটের ওপর দিতেই চেটে চেটে খেয়ে নিল। এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওর ডান হাত থেকেও সমানে রক্ত পড়ছে। কাট দু'বাণ্ডিল ব্যাণ্ডেজ যতটা সম্ভব চওড়া করে বিছিয়ে নিল। তারপর ব্যাণ্ডেজ করে দিল। এপাশ ওপাশ খুঁজলাম হালকা করে হাতটাকে ঘিরে দেবার মত কিছু আছে কিনা, না পেয়ে ঠিক করলাম ওর প্যান্টের পা আর আণ্ডারঅয়্যার ছিঁড়েই কাজ চালাই। প্যান্টটা আরও নামিয়ে দিলাম কিন্তু ও তো আর কিছু পরেনি নিচে। এতক্ষণে ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। এ তো সেই ছেলে যে প্যান্ট নষ্ট করে ফেলেছিল খানিক আগে। করুণায় আর্দ্র হয়ে গেল মনটা।

এর মধ্যে কাট একটা লাশের পকেট থেকে আরেক বাণ্ডিল ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এসেছে। দক্ষ হাতে খুব সাবধানে ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল ও।

একভাবে তাকিয়ে আছে ছেলেটা আমাদের দিকে। বললাম, 'তুমি এখানে থাকো, আমরা স্ট্রেচার নিয়ে আসছি।'

মুখ খুলল ও, ফিসফিস করে বলল, 'যেয়ো না।'

'ভয় কি? আমরা এই যাব আর আসব। আর স্ট্রেচার না আনলে তোমাকে নিয়ে যাব কি করে?'

কি বুঝল তা ওই জানে। জামা চেপে ধরল আমার। শিশুর মত

আবদার করল, 'যেয়ো না।'

কেমন যেন করে উঠল বুকের ভেতর। এত বাচ্চা ছেলে, তবুও যুদ্ধে আসতে হয়েছে। যেমনভাবে বলল, মনে হলো ছোট্ট শিশু মায়ের কোলে মাথা রেখে মায়ের আঁচল ধরে বলছে, 'যেয়ো না'।

'ঠিক আছে, যাব না,' আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম।

কাট হাতের ইশারায় ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, 'রিভলভার দিয়ে ওর যন্ত্রণা শেষ করে দিলে কেমন হয়?'

ছেলেটা এমনই আহত হয়েছে যে ওকে বয়ে নেওয়াও বৃথা। বড় জোর দিন দু'য়েক। এমন ভাবে দুটো দিন কম বাঁচলে কি হবে? যেখানে ঘা খেয়েছে এখন সে জায়গাটা আড়ষ্ট হয়ে আছে বলে ব্যথা টের পাচ্ছে না। ঘণ্টাখানেক পর ব্যথায় পাগল হয়ে যাবে ও। যতক্ষণ বাঁচবে, নরক যন্ত্রণাও কম মনে হবে ওর কাছে। সে কষ্টটা যদি ভোগ নাই করে, কার ক্ষতি তাতে!

'আমারও তাই মনে হয়,' বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে বললাম।

কাট চুপ করে থাকল, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করলাম। ও মনস্থির করছে আসলে। নাহ্, হলো না, ধারে কাছে লোকজন এসে পড়েছে। এখন আর সম্ভব নয়।

একটা স্ট্রেচারে তুলে দিলাম ওকে। বাহকরা নিয়ে গেল স্ট্রেচারটা। কাট আপন মনে মাথা নাড়ছে, 'বাচ্চা ছেলে, একেবারেই বাচ্চা ছেলে। কেন যে এল!'

যতটা আশঙ্কা করেছিলাম আমরা, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। পাঁচজন নিহত, আহত আটজন। দু'জন মরেছে জায়গা মত, একেবারে পুরানো কবরের গর্তে। আমরা শুধু মাটি ফেলে ভর্তি করে দিলাম গর্তটা। ভেবে দেখলাম, এরকম গোলা বৃষ্টির পরে ক্ষয়ক্ষতিটা আসলেই কম।

ফিরতি পথে রওনা হলাম। মেঘে ঢাকা বিবর্ণ সকাল। কোন কথা নেই, চুপচাপ হাঁটছি সবাই, একজনের পেছনে আরেকজন। আহতদের ড্রেসিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতরা যতক্ষণ চিৎকার করছে,

ততক্ষণে ড্রেসিং স্টেশনের লোকজন নম্বর লিখছে আর টিকেট লাগাচ্ছে। আমরা পৌঁছনোর আগেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

একঘণ্টা পরে পৌঁছুলাম লরির কাছে। লাফিয়ে উঠে পড়লাম ওটাতে। এখন অনেক জায়গা, বসেই যেতে পারব। মাথার ওপর ওয়াটারপ্রুফ শীট বিছিয়ে নিয়ে বসে পড়লাম। বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল। ওয়াটারপ্রুফ শীটের ওপর কান্নার মত জমে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর একটা ভাঁজের পাশ দিয়ে রাস্তা পেতেই সরসর করে নেমে এল।

চলতে শুরু করল লরি। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে রওনা হলো। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। লরির ঝাঁকুনিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমুনির ভাব এসে গেল একটা। এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে চলতে থাকলাম।

লরির সামনে লম্বা আঁকশি নিয়ে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দিকে নজর রাখছে সারাক্ষণ। রাস্তার ওপর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশের যেসব টেলিফোনের তারগুলো গিয়েছে সেগুলো এত নিচু যে মওকামত পেলে আমাদের দু'একটা মাথা রেখে দিতে পারে ওর সাথে। লোক দু'জন তার এলেই আঁকশি দিয়ে উঁচু করে আমাদের পিছনে ছেড়ে দেয়। যখন তারটা উঁচু করে তোলে তখনি সাবধান করে দেয়, 'তার!' আমরাও সাথে সাথে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিই।

একভাবে বৃষ্টি পড়তে থাকে, লরি দুলতে দুলতে ছোটে, সাবধান বাণী আসে। বৃষ্টি পড়তেই থাকে। আমাদের মাথার ওপর বৃষ্টি পড়ে, ফ্রন্টে যারা মারা গেল তাদের ওপর বৃষ্টি পড়ে, বাচ্চা ছেলেটার থ্যাতলানো কোমর জুড়ে বৃষ্টি পড়ে, কেমারিখের কবরের ওপর বৃষ্টি পড়ে। পড়ছে তো পড়ছেই বৃষ্টি, থামাথামি নেই। আমাদের হৃদয় চুইয়ে নামে বৃষ্টির ধারা। বৃষ্টিতে তো প্রকৃতির সমস্ত ময়লা ধুয়েমুছে চলে যায়, হৃদয়ের ময়লা মুছে যায় না?

কাছেই কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটতেই চমকে উঠলাম। সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে নামবার জন্যে তৈরি হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছুই ঘটল না

আর। আবার রওনা দিলাম। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। রিমঝিম শব্দের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে শুনতে থাকলাম, 'সাবধান, তার!'

পাঁচ

জাদেন আর হাই-এর মাথায় উকুন ঠাসা। শত শত বললে ভুল হবে, বলা যায় হাজার হাজার। একটা একটা করে মারতে হলে কয়েক দিন লেগে যাবে। সেজন্যে জাদেন চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে । একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ওর মাথায় বসিয়ে দিয়েছে একটা জুতোর কালির খালি কৌটা। একটা করে উকুন ধরে ওটাতে ছাড়তেই 'টিক' করে আওয়াজের সাথে সাথে খতম। হাই-এর মাথার উকুনগুলো আবার বিশেষ ধরনের, প্রত্যেকটার মাথায় একটা করে লাল ক্রসচিহ্ন। হাই-এর ধারণা, ও যখন হাসপাতালের সার্জনের সাথে গল্পগুজব করছিল, তখন চলে এসেছে ওগুলো।

'শোন, মুলার,' না ওঠা গোঁফে তা দিতে দিতে বলল হাই, 'অনেকগুলো উকুন তো মারা হলো, এখন এই কৌটোর মধ্যে যে চর্বি জমেছে তা দিয়ে তুই তোর নতুন পাওয়া বুটজোড়া পালিস করিস এখন থেকে।' যেন দারুণ একটা চুটকি বলে ফেলেছে এমনভাবে হাঃ হাঃ করে হাসিতে ফেটে পড়ল হাই। আমরা কেউ না হাসলেও নিজের চুটকি শুনে নিজেই হেসে চলল আধা ঘণ্টা ধরে।

আজকে আসলে ওর কথায় মন দেবার মত মানসিকতা নেই। মাথার মধ্যে ঘুরছে অন্য চিন্তা। গুজব শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেছে। হিমেলস্টোস এসেছে। গতকালই তার বিখ্যাত গলার আওয়াজ পেয়েছি।

কেন আসতে হয়েছে তা-ও জেনেছি। আমাদের সাথে যা করত তাই করতে গিয়েছিল বেচারা, কিন্তু ভুল জায়গায়। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে যে ওকে লক্ষ করছিল সেটা আর খেয়াল করেনি। ফলে ট্রেনিং সেন্টার থেকে সোজা ফ্রন্টে। এবার মজাটা বোঝো বাছাধন!

তাকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে আমরা তৈরি হচ্ছি। জাদেন ঘণ্টাতিনেক ধরে পাঁয়তারা কষছে, কেমন ভাবে হিমেলস্টোসকে কি বলবে ও। হাই তার বিশাল হাতের মধ্যে কি দেখছে সে-ই জানে। মাঝে মাঝে পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। ক্রপ কোথেকে যেন এক বাটি ভর্তি মটরশুঁটি সেদ্ধ নিয়ে এসেছে, মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে সেটা। মুলার লোলুপদৃষ্টিতে আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁটটা চাটল খানিকক্ষণ। তারপর সম্ভবত খাবার জিনিসের কথা মাথা থেকে দূর করার জন্যে শুরু করল, 'আচ্ছা, ক্রপ, যখন যুদ্ধ থেমে যাবে, তখন তুই কি করবি?'

'যুদ্ধ কোনদিন শেষ হবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব দিল ক্রপ।

'ধর যদি থামে, তখন কি করবি?'

'এখান থেকে চলে যাব।'

'আরে সেতো যাবিই, তারপর কি করবি?'

'প্রাণভরে মদ খাব, মদ খেয়ে মাতাল হব, মাতলামি করব।'

'দেখ, ফালতু কথা বলবি না, আমি কিন্তু সিরিয়াস।'

'আমিও সিরিয়াস, এ ছাড়া আর কি করা যাবে?'

কাট নড়েচড়ে উঠল। বুঝলাম আলোচনায় যোগ দেবে এখন। এক ফাঁকে ক্রপের থালা থেকে এক মুঠো মটরশুঁটি মুখে চালান করে দিয়ে তৃপ্তির সাথে চিবোতে চিবোতে বলল, 'মদ খেয়ে না হয় মাতাল হলেই কিন্তু তারপরই তো ট্রেন ধরে ছুটবে বাড়িতে মায়ের কাছে। যুদ্ধ শেষ! সোজা কথা?'

কথা শেষ করে বুকপকেট হাতড়ে প্লাস্টিক মোড়া নোটবুকটা বের করল। ওর ভেতর থেকে অনেক দিনের পুরানো হলদে হয়ে যাওয়া ফটো বের করে সবাইকে দেখাল, 'আমার বউ।' উমম্, চকাস করে একটা চুমু খেয়ে ফেলল ছবিটার ওপরে। ছবিটা নোটবুকের মধ্যে রাখতে রাখতে

বলল, 'যাহান্নামে যাক যুদ্ধ। বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।'

বললাম, 'তোমার তো বউ, ছেলে-মেয়ে আছে। তোমার বাড়ি ফেরার টান তো বেশি থাকবেই!'

'তা ঠিক,' বলল কাট, 'তাদের খাওয়া পরার দিকটা তো আমাকেই দেখতে হবে।'

একসাথে হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা, 'তুমি থাকলে ওদের অন্তত খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না কোনদিন।'

মুলারের মাথার মধ্যে সেই যে পোকা ঢুকেছে, এখনও ওটা কামড়াচ্ছে ওকে। এবারে হাইকে পাকড়াও করল ও, 'আচ্ছা, হাই, তুই যুদ্ধ শেষ হলে কি করবি?'

আমি বললাম, 'যুদ্ধ শেষ হলে আমি প্রথমে তোর পেছনের দিকে প্যান্টটা ঝেড়ে নেব ভাল করে, তারপর ফার্স্টক্লাস একটা লাথি কষাব তোর পশ্চাদ্দেশে। যুদ্ধটা থামবে কি করে শুনি?'

'কেন, যেমন করে গরুর গোবর বেরোয় তেমন করে,' মুলারের সোজাসুজি জবাব।

এতক্ষণে মুখ খুলল হাই, 'যুদ্ধ শেষ হলে তো দুনিয়াতে মেয়েমানুষ থাকবে, তাই না?'

'থাকবে, খুব সুন্দর মেয়েমানুষই থাকবে।'

'বেশ, তাহলে খুব সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে তালা বন্ধ করে দেব। সাতদিন বেরোব না ঘর থেকে, প্যান্টও পরব না।'

'খাবি কি?'

'খাবার নিয়ে ঢুকব।'

'গরম করবি কি করে?'

'চুলো বানিয়ে নেব।'

'ল্যাট্রিন পাবি কোথায়?'

'পানি আর বালতি নিয়ে ঢুকব।'

'এক সপ্তাহ পর কি করবি?'

সবাই চুপ হয়ে গেল। সত্যিই তো, এর পর কি করব আমরা? ভেবে পেলাম না।

'আমি যদি নন-কমিশনড হিসেবে সেনাবাহিনীতে থাকতে পারতাম তাহলে আমার বাকি জীবন প্রুশিয়ানদের সাথেই কাটিয়ে দিতাম,' উদাস স্বরে বলল হাই। একেবারে মনের ভেতর থেকে কথাটা বলল ও।

'তোর মাথার ইসক্রুপ কি ঢিলা হয়ে গেছে? সেনাবাহিনীতে আরও থাকতে চাস?'

'কোনদিন কাঠকয়লার জন্যে মাটি খুঁড়ে দেখেছিস? দেখিস একবার।' জুতোর মধ্যে থেকে একটা চামচ বের করল ও। চট করে এক চামচ মটরশুঁটি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

'তা ঠিক,' বললাম আমি, 'তবে বাড়ির কথাই আলাদা। তা ছেড়ে তুই থাকতে চাইছিস কেন?'

ও কোন কথা বলল না। উদাস দৃষ্টিতে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম ও কি ভাবছে। স্যাঁতসেতে ঘুপচি গলির মধ্যে একটা ছাপড়া, কাদা থকথক করছে সারাক্ষণ। অমানুষিক পরিশ্রম করার পর সামান্য কিছু আয়।

'শান্তির সময় সেনাবাহিনীতে থাকার কত সুবিধে,' দিগন্তের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলতে লাগল ও, 'থাকা খাওয়ার চিন্তা নেই, সারা সপ্তাহে যা রেশন পাবে, খাওয়ার পরে বাড়তিটুকু বিক্রি করেও বেশ কিছু পয়সা করতে পারবে। আর পরিষ্কার বিছানা, পরিষ্কার কাপড়চোপড়, প্রতি সপ্তাহে বিনা পয়সায় লন্ড্রিতে ধোলাই করা। সকাল বিকাল প্যারেড করবে, মাঝে মাঝে ডিউটি করবে আর বাকি সময় ঘুরে বেড়াও। ইচ্ছে হলে ঢুকে পড়ো বারে বা সিনেমা হলে, চাইকি মেয়ে নিয়েও মজা করতে পারো। বলো এরপর আর চাওয়ার কি আছে? বারো বছর চাকরি করে পেনশন নেবে। নিজের তো বটেই ছেলেমেয়েদের জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করতে পারবে। গ্রামে ফিরে গ্রাম পুলিসের চাকরি নেবে আর সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এখানে এক গ্লাস, ওখানে এক বোতল, লোকজন সেধে খাওয়াবে তোমাকে। আর কি চাই জীবনে?'

'তুমি কোনদিনই সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পারবে না,' ওর সুখস্বপ্নের আবেশ মুছে দিয়ে বলল কাট।

কিছু বলল না হাই। শুধু ব্যথাভরা চোখ তুলে ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যে আমারই খারাপ লাগল। কথাটা কাট এভাবে না বললেও পারত।

এবার জাদেনকে ধরল মুলার, 'তুই কি করবি?'

'রাখ তোর ওসব,' খেঁকিয়ে উঠল জাদেন, 'আগে হিমেলস্টোসকে শিক্ষা দিয়ে নিই, তারপর অন্য কথা।' ক্রপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি তোর মত হতাম তাহলে চেষ্টা করতাম আগে লেফটেন্যান্ট হতে, তারপর পাকড়াও করতাম হিমেলস্টোসকে। গরম পানির মধ্যে পাছা ডুবিয়ে বসিয়ে রাখতাম ব্যাটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর পাছার চামড়া উঠে যায়। তারপর একমাস ধরে ওকে শুধু চেয়ারে বসাতাম আর ওঠাতাম।' যেন ঘটনাটা ঘটিয়েই ফেলেছে এমনভাবে হাসিতে ফেটে পড়ল জাদেন।

'তুমি কি করবে, ডেটারিং,' সবশেষে ডেটারিংকে পাকড়াও করল মুলার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই শুধু বলল ডেটারিং, 'আমি আমার চাষবাষে ফিরে যাব।' বলেই চলে গেল ও।

আমি জানি ও কি ভীষণ চিন্তার মধ্যে আছে। বাড়িতে শুধু ওর বউ ছাড়া চাষবাষ দেখার কেউ নেই। এরই মধ্যে ওর দুটো ঘোড়া নিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনীর লোকজন। প্রত্যেকদিন ও খবরের কাগজ দেখে ওর ওদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল কিনা। খড়গুলো এখনও তোলা হয়নি।

হঠাৎ দেখি হিমেলস্টোস, সোজা আমাদের দিকেই আসছে। জাদেনের মুখ সাথে সাথে লাল হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

একটু ইতস্তত ভাব দেখা গেল হিমেলস্টোসের মধ্যে। হাঁটাটা একটু মন্থর হয়ে গেল। আমরা ফিরেও তাকালাম না ওর দিকে, শুধু কাট বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, যেন আজব কোন চিড়িয়া দেখছে!

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। কেউ কিছু বলছি না দেখে শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই বলল, 'কি খবর, কেমন চলছে দিনকাল?'

একেবারে বোবা কালা হয়ে থাকলাম আমরা, যেন শুনিইনি ওর কথা। থতমত খেয়ে গেল হিমেলস্টোস, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। পরিষ্কার বুঝলাম, এখন আবার সেই চষা খেতে প্যারেড করাতে পারলে সবচেয়ে খুশি হত ও, কিন্তু এটুকু অন্তত বুঝেছে যে ফ্রন্ট লাইনটা ঠিক প্যারেড গ্রাউণ্ড নয়। আর একবার শিক্ষা হওয়াতে একটু ভয়ও আছে মনে। শেষে ক্রপকে পেল হাতের কাছে। ওকেই পাকড়াও করল, 'কি খবর, তুমিও এখানে?'

'সে তো চোখেই দেখতে পাচ্ছ।'

মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল হিমেলস্টোসের, গোঁফজোড়া কাঁপতে থাকল। 'আমাকে চিনতে পারছ না বোধহয়?'

চোখ খুলল জাদেন, 'আমি পারছি।'

'জাদেন না?'

'আমি তো জাদেন, তুমি কি?'

এত রেগে গেছে হিমেলস্টোস যে কয়েক মুহূর্ত কি বলবে ভেবেই পেল না। কোনরকমে রাগ চেপে বলল, 'তোমার সাথে এত মহব্বত হলো কবে থেকে? কই, কোনদিন একসাথে নর্দমায় গড়াগড়ি খাইনি তো!'

'আহ্‌হা, সে কথা বলেছি নাকি কখনও। নর্দমায় তো তুমি একাই গড়াগড়ি খেতে।'

হিমেলস্টোসকে দেখে মনে হলো এক্ষুণি ফেটে পড়বে। কিন্তু জাদেন আজ বেপরোয়া। ওর পেটে যা আছে উগড়েই ছাড়বে আজকে।

সোজা উঠে হিমেলস্টোসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'তুমি কি, সেটা জানতে ইচ্ছে করে না? বলছি, ভাল করে মন দিয়ে শোনো। তুমি একটা ফার্স্টক্লাস লোম ওঠা ঘেয়ো কুত্তা। লেজে আবার উকুনও আছে। নামটা পছন্দ হয়েছে তো? আহ্‌হা, চুপ করে আছ কেন, লজ্জা কি, বলেই

ফেলো না। আমরাই তো! চমৎকার নাম তাই না, ঘেয়ো কুত্তা!'

এর পরে হিমেলস্টোসের পক্ষে চুপ করে থাকাটা আর আশা করলাম না আমরা। হলোও তাই, ফেটে পড়ল ও, 'কি বললি, নোংরা ঘাঁটা কাঠ-কয়লা চোর? তোর—।'

'আমি তালা সারাতাম, হাই কাঠকয়লা তুলত,' সরল মুখে হিমেলস্টোসকে শুধরে দিল জাদেন।

'অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়া এক্ষুণি। বুট ঠুকে তোর উপরওয়ালাকে স্যালুট দে।'

'না চেঁচিয়ে নিজে নিজে বরং কিছুটা লাফ ঝাঁপ করে নাও মাঠে গিয়ে, শরীর ভাল থাকবে, কাজে ফুর্তি আসবে। যাও, যাও, শুরু করো, দেরি করে লাভ কি?'

ব্যস, চালু হয়ে গেল মেশিন। সামরিক আইনের যতগুলো ধারা আছে, একটার পর একটা বেরিয়ে আসতে লাগল ওটার ভেতর থেকে। স্বয়ং কাইজারও বোধহয় হিমেলস্টোসের মত অতটা অপমানিত বোধ করতেন না।

'জাদেন, তোমার সামনে তোমার উপরওয়ালা, অ্যাটেনশন, স্যালুট মি,' চিৎকার করে উঠল হিমেলস্টোস।

'আর কিছু?' জাদেনের জিজ্ঞাসা।

'আমার হুকুম মানবে কিনা বলো!'

'প্যান্ট খুলব?'

রাগের চোটে তোতলানো শুরু করল হিমেলস্টোস। কোনরকমে হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'তোর কোর্ট মার্শাল করব আমি।' ছুটে চলে গেল ব্যারাকের দিকে।

ও চলে যেতেই হাসিতে ফেটে পড়লাম আমরা। ফাটা বাঁশের মত আওয়াজ বেরোতে লাগল হাই-এর গলা থেকে। সাথে সাথেই স্বীকার করলাম, এটা একেবারে কাঠকয়লা খোঁড়া লোকের অরিজিনাল গলা। হাসতে হাসতে হঠাৎ চোয়াল আটকে গেল হাই-এর। হাঁ করে আ-আ করা শুরু করল ও। ওর ওই অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে ঘাসের ওপর

গড়াগড়ি খেতে লাগলাম সবাই। শেষে ক্রপ কোনরকমে উঠে এক ঘুসিতে ঠিক করে দিল ওর মুখের চেহারা।

হাসি থামলে কাট বলল, 'ও রিপোর্ট করলে কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তুমি কি মনে করো ও তাই করবে? লজ্জা না থাকলে অবশ্য অন্য লোকের কাছে বলতে পারবে এসব।'

'ও তা পারবে,' আমি বললাম।

কাট বলল, 'চোখ বুজে পাঁচ দিনের হাজতবাস ধরে রাখতে পারো।'

'তাহলে তো ভালই হয়। পাঁচ দিনের বিশ্রাম বাবা, কম কথা নয়।' নিশ্চিন্ত মনে বলল জাদেন।

মুলার বলল, 'যদি জেলে পাঠায়!'

'অত সোজা না, যুদ্ধ চলছে না এখন? সৈন্য পাবে কোথায় আমাদের মত?'

আমরা উঠে রওনা দিলাম ক্যাম্পের দিকে।

মুলারের মাথার পোকাটা এতক্ষণ বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল। জেগে উঠেই আবার কামড়াতে শুরু করেছে।

'আচ্ছা, ক্রপ, ধর এখন তুই বাড়িতে আছিস, কি করবি এখন?'

হিমেলস্টোসকে ফার্স্টক্লাস ধাতানি দেবার পর থেকে ক্রপ বেশ খোশমেজাজে আছে, মুলারের প্রশ্নে তাই রাগল না এবার।

'আচ্ছা, আমাদের ক্লাসে কতজন ছিলামরে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কুড়ি জন।'

'কে কি অবস্থায় আছে এখন?'

হিসাব করলাম আমরা। মারা গেছে সাতজন, আহত চারজন, একজন পাগলা গারদে। মোট বারোজন।

'আমাদের মধ্যে তিনজন তো এখন লেফটেন্যান্ট, আচ্ছা, তোর কি মনে হয় ওরা আবার ক্যান্টোরেকের সামনে বসে ক্লাস করবে?'

'অসম্ভব!'

ক্লাসের কথা উঠতেই পুরানো কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমাদের। মেতে উঠলাম ওসব নিয়ে।

' ''উইলিয়াম টেল''-এর ত্রিবিধ ভাব বলিতে কি বুঝো?'

'গোটিনজেন-এর কাব্যিক ভাষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা জানো লিখ।'

'চার্লস ডি ব্যাল্ডের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত ছিল?'

'পল বোমার, তোমাকে দিয়ে জীবনে কিচ্ছু হবে না, বসে পড়ো।'

'কত সালে জেনার যুদ্ধ হয়?'

'তোমার মাথায় গোবর পোরা, ক্রপ, বসে পড়ো, তিন নম্বর কাটা গেল তোমার।'

হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। স্কুলে থাকতে কত জিনিস যে শিখেছিলাম আমরা, যার এক কানাকড়িও মূল্য নেই এখানে। স্কুলে থাকতে কেউ শেখায়নি, কি করে বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট ধরাতে হয়, কিভাবে ভেজা কাঠে আগুন ধরাতে হয়। কিংবা বুকের চেয়ে পেটের মধ্যে বেয়োনেট চার্জ করা অনেক ভাল কারণ তাতে হাড়ের ফাঁকে বেয়োনেট আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। এসব এখানে শিখতে হয়েছে আমাদের। এবং এটাই এখানে দরকারি।

'সব রাবিশ্।'

'কেন, তা হবে কেন,' মুলার জিজ্ঞেস করল, 'আমার তো মনে হয় আমাদেরকে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' আমি বললাম, 'তবে নিশ্চয়ই স্পেশাল পরীক্ষা।'

'তাহলে তো প্রিপারেশন দরকার। আর পরীক্ষা দিয়েই বা কি লাভ? পাস করে কি ঘোড়ার ডিমটা করবে শুনি? পয়সা না থাকলে সব ঠনঠন।'

'কিন্তু তোমাকে তো কোন না কোন পেশা বেছে নিতেই হবে,' এমন ভাব করে বলল মুলার যেন ও-ই ক্যান্টোরেক।

মুখ খুলল ক্রপ। এতক্ষণ ধরে এত গভীর মনোযোগের সাথে ছুরি দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করছিল যেন ওই ময়লার মধ্যে সোনার খনি

লুকিয়ে আছে।

'কাট, ডেটারিং, হাই ওরা ওদের পুরানো পেশায় ফিরে যাবে, ওদের জন্যে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদের তো কোন পেশা ছিল না, আমরা কোথায় যাব?'

আমি বললাম, 'আমাদের প্রথমে দরকার খানিকটা আয় রোজগার, তারপরে জঙ্গলে গিয়ে থাকতেও আপত্তি নেই।'

'তোমার মত চিড়িয়া জঙ্গলেই মানাবে ভাল,' মুলারের তাৎক্ষণিক জবাবে কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল আমার।

'কিন্তু আমরা ফিরে যাবার পর সত্যি সত্যি কি ঘটবে?'

'আগে গিয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখব।'

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেমন যেন একটা বিভ্রান্ত ভাব সবারই। কেউ বলতে পারছে না আমরা ফিরে যেয়ে সত্যি সত্যি কি করব।

কেউ কিছু বলার আগেই ক্রপ বলল, 'অত চিন্তা করে লাভ নেই। আমার কথা আমি বলতে পারি যে আমি কিছুই করব না কারণ মরার পরে কে কি করলাম কিছুই আসে যায় না।'

আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে আমি প্রচণ্ডভাবে অনুভব করি ফিরে যাবার পরে অকল্পনীয় কিছু একটা করব, কিন্তু ভাবতেই পারি না কি ধরনের কাজ হবে সেটা। যখন ভাবি ব্যবসা, চাকরি, লাভ লোকসান, বেতন, ভাতা–বমি আসে আমার।'

হঠাৎ করেই একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল সবাই। পরিষ্কার বুঝলাম, এটা শুধু আমাদের এই ক'জনের সমস্যা নয়, আমাদের বয়সের যারা কম বেশি তাদের সবারই। আমাদের এই জেনারেশানেরই সমস্যা এটা। যুদ্ধ আমাদের সবকিছু নিয়ে গেছে। আমরা আর উনিশ বছরের তরুণ নই, আমরা উনিশ বছরের বৃদ্ধ। আমরা শুধুই ভেসে বেড়াচ্ছি, জীবনের মাটিতে আমাদের শিকড় ছড়ায়নি এখনও, কোনদিন ছড়াবেও না হয়তো। যে বয়েসে আমরা নতুন রঙে পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখছিলাম সেই মুহূর্তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমাদের জীবন। যুদ্ধ, হায়রে

যুদ্ধ, এতদিনে বুঝলাম যুদ্ধের প্রথম বোমাটা ঠিক হৃদয়ের মাঝখানে পড়ে। সমস্ত হৃদয়টাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এখন আমরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না।

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল অনুভূতিটা সরসর করে নিচে নেমে গেল।

বিকেলেই ডাক পড়ল আমাদের। দল বেঁধে গেলাম সবাই। গিয়ে দেখি হিমেলস্টোস, আমাদের লেফটেন্যান্ট বার্টিঙ্ক, আরও কয়েকজন বসে আছে। আমাদের দেখে গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসল হিমেলস্টোস। ক্রপ কানে কানে বলল, 'ব্যাটা যদি বেশি লাফালাফি করে তো এবারে ময়লার পাত্র না, আস্ত একটা কাঁটাতারের বাণ্ডিল ফেলব পায়ের ওপর।'

শুরু হলো জেরা। প্রথমেই ডাক পড়ল আমার, ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে। খুলে বললাম সব, প্যারেড করার ঘটনা থেকে জাদেনের বিছানা ভেজানো, হিমেলস্টোসের দাওয়াই, আজকের ঘটনা সব। ধমকে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'এসব ব্যাপার আগে বলোনি কেন?'

চুপ করে থাকলাম। রাতে বিছানা ভেজানো নিশ্চয়ই গর্বের কিছু নয় যে বলতে যাব। আর সেনাবাহিনীতে অভিযোগ করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

লেফটেন্যান্ট ব্যাপারটা বুঝল। ধরল হিমেলস্টোসকে। একথা সেকথা বলে প্রসঙ্গটা বদলানোর চেষ্টা করল হিমেলস্টোস। লেফটেন্যান্টও ধূর্ত লোক, ঠিক চেপে ধরল ওকে। শেষে আমতা আমতা করে 'অ্যা,–ব্যা,–না–মানে হ্যাঁ–' বলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল হিমেলস্টোস। আমাদের সামনেই একচোট বকুনি দিল হিমেলস্টোসকে। ফ্রন্টটা যে প্যারেড গ্রাউণ্ড নয় সেটা ভাল করে মনে রাখতে উপদেশ দিল। চোখমুখ লাল করে বসে রইল হিমেলস্টোস।

সবাইকে জেরা করার পর রায় বেরোল। জাদেনের তিনদিন আর ক্রপের একদিন ওপেন অ্যারেস্ট। বেরিয়ে যাবার মুখে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'আর যেন কখনও এমন ঘটনা না শুনি।'

হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলাম আমরা। ওপেন অ্যারেস্ট কিছুই নয়। যার সাজা তাকে সেলারে আটক থাকতে হবে, বাইরে আসতে পারবে না। কিন্তু একটু ম্যানেজ করতে জানলেই বাইরের লোকজন তার সাথে দেখা করতে পারবে। জাদেন আর ক্রুপ আটকা পড়ার পর যথারীতি আমরা ঢুকলাম ভেতরে। ঘণ্টাখানেক তাস পিটিয়ে ফিরলাম ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে ফেরার পর আমি আর কাট একা হতেই ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রাজহাঁসের রোস্ট কেমন লাগে?'

সাথে সাথে জিভে জল এসে গেল। সুড়ুৎ করে জলটা ভেতরে টেনে নিয়ে বললাম, 'খুব ভাল লার্গে, খুব ভাল লাগে।'

'চলো, তাহলে ব্যবস্থা করা যাক।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব, চলো যাওয়া যাক।'

বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

একটা রসদ বোঝাই লরিতে করে জায়গামত পৌছালাম। ভাড়া দিতে হলো দুটো সিগারেট।

বাড়িটা একটা রেজিমেন্টাল হেডকোয়ার্টার। ওর পেছন দিকে আছে হাঁসের খোঁয়াড়টা। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি আর কাট ফিসফিস করে খানিকক্ষণ পরামর্শ করে নিলাম। দেয়ালটা টপকালেই খোঁয়াড়, শুধু একটা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো থাকে।

দেয়ালের গায়ে ও শক্ত করে হাত রাখতেই তার ওপর পা রেখে একলাফে চড়ে বসলাম দেয়ালের মাথায়। কাট নজর রাখতে লাগল চারপাশে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম দেয়ালের ওপর। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই দেখতে পেলাম খোঁয়াড়টা। আস্তে করে ঝুলে পড়লাম দেয়াল ধরে। হাত ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে নামলাম বাকিটুকু। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে সাবধানে ছিটকিনিটা খুললাম। পাল্লা সরাতেই দেখি ভেতরে কোণের দিকে শাদা শাদা কি যেন একটু নড়েচড়ে উঠল। বুঝলাম, অবস্থা বেশি সুবিধের না। একটাকে ধরলেই

চেঁচিয়ে উঠবে আরেকটা। কি করা যায়, কি করা যায়, ভাবলাম খানিকক্ষণ। শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিলাম দুটোকেই ধরব।

আস্তে করে খোঁয়াড়ের ভেতর ঢুকলাম। হাঁস দুটো নড়েচড়ে আরেকটু কোণের দিকে সরে গেল। ঠিকমত তাক করে, লাফ দিয়ে একটার গলা চেপে ধরলাম, পরমুহূর্তেই ডানহাতে আরেকটার গলা। পাগলের মত দেয়ালে ওদুটোর মাথা ঠুকে দিতে লাগলাম। কিন্তু মুশকিল হলো দুটোকে একসাথে ধরে জোরই পাচ্ছি না হাতে।

গলা চেপে ধরলে কি হবে, ওর ভেতর দিয়েই গ্যাঁ গ্যাঁ আওয়াজ বের করছে হাঁস দুটো। আর সেই সাথে পাখা আর পায়ের ঝাপটানি। প্রাণপণে চেপে ধরে খোঁয়াড়ের দরজার দিকে আসতেই মনে হলো আমার বোধহয় দুটো পাখা গজিয়েছে, এক্ষুণি উড়ে যাব আকাশে। কোন রকমে টলমল করতে করতে বাইরের দিকে এগোলাম।

হঠাৎ কেমন করে যেন একটা হাঁস গলা ছাড়িয়ে নিল হাত থেকে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল সাইরেন। ক্যাঁ ক্যাঁ ডাক শুনে মনে হলো মড়াগুলো পর্যন্ত কবর থেকে উঠে আসবে। কিছু করার আগেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম মাটিতে। গড়াতে গড়াতেই শুনতে পেলাম গর্র্ গর্র্ শব্দ। ঘাড় ফেরাতেই দেখি বিশাল একটা বুলডগ। আমাকে নড়তে দেখেই লাফিয়ে এল টুঁটি কামড়ে ধরার জন্যে। সাথে সাথে কোটের কলারটা কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না, চোখ খুলতেই দেখি গলার কাছ থেকে সরে গেছে কুকুরটা, চুপচাপ জিভটা বের করে আমার পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে। একটু নড়তেই সাদা দাঁত বের করে 'ঘ্যাঁ' করে উঠল। বেকায়দায় পড়ে গেছি একেবারে। বুঝলাম, এখন রিভলভারটা ছাড়া গতি নেই। কেউ এসে পড়বার আগেই কাজ সেরে ভাগতে হবে।

সমস্যা হলো, হাত দুটো রয়েছে গলার কাছে। একটু নড়লেই শাদা দাঁত বের করে লাফিয়ে আসছে কুকুরটা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডান হাতটা নামাতে লাগলাম কোমরের দিকে। মনে হলো, কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। কোমরের কাছে আসার পর আস্তে করে হোলস্টার থেকে রিভলভারটা

বের করলাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই, সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। রিভলভারটা মাটির সাথে চেপে ধরে মনে মনে নিজেকে উপদেশ দিলাম, 'ভয় পেয়ো না, ঝট করে রিভলভারের নলটা ওপর দিকে তুলেই গুলি ছুঁড়বে, ব্যাটা কিছু বোঝবার আগেই একলাফে দেয়াল টপকে পগার পার।'

অনেকক্ষণ পরে কাঁপুনিটা থামতেই লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। দম আটকে রেখে ঝট করে রিভলভারের নলটা ওপর দিকে তুলেই টেনে দিলাম ট্রিগার। প্রচণ্ড শব্দের সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল কুকুরটা। কোনদিকে না তাকিয়ে আমি ততক্ষণে হানড্রেড মিটার "প্রীন্ট শুরু করে দিয়েছি। খোঁয়াড়ের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোতেই নরম কিসের ওপর পা পড়ল। 'ক্যাঁক' করে উঠল ওটা। বুঝলাম সেই হাঁসটা। এত পরিশ্রমের জিনিস, ফেলে তো আর দেয়া যায় না, আধা সেকেণ্ডের মধ্যে ওটাকে বগলদাবা করে ছুটলাম দেয়ালের দিকে। দেয়ালের কাছে এসে ওটাকে ছুঁড়ে দিলাম বাইরে। একলাফে দেয়ালের মাথায় চড়ে বসতেই দড়াম করে দেয়ালে ধাক্কা খেলো কুকুরটা। আরেকবার লাফ দেবার আগেই ওটার দিকে ভেংচি কাটলাম। লাফিয়ে নেমে পড়লাম বাইরে। দেখি দশ পা দূরে কাট, হাঁসটাকে বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। চোঁচা দৌড় লাগালাম দু'জনেই। বহুদূর এসে যখন বুঝলাম তাড়া করে আসছে না কেউ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম তখন।

এতক্ষণে হাঁসটার দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পেলাম। দেখি কাটের হাতের চাপে ওটার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এখন কেউ টের পাবার আগেই ওটাকে রোস্ট করে পেটে চালান করে দিতে হবে।

ক্যাম্প থেকে খুঁজে পেতে একটা ডেকচি নিয়ে এলাম আমি। একটু দূরেই একটা পরিত্যক্ত ঘরমত আছে। এরকম চোরাই খানাপিনার দরকার হলে ঘরটাকে ব্যবহার করি আমরা। সুতরাং ওটার দিকেই রওনা দিলাম। আশপাশ থেকে কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিলাম আগুন জ্বালবার জন্যে।

ঘরটার একটাই জানালা, মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া, যাতে

বাইরে থেকে আলো দেখা না যায়। ঘরের মধ্যে আগে থেকে ইট দিয়ে চুলো বানানো আছে। কাজেই আর দেরি না করে চুলো ধরিয়ে ফেললাম।

কাট হাঁসের পালক ছাড়াতে বসে গেল। ও পালক ছাড়ায়, আমি ওগুলো পাশে জমা করে রাখি। বালিশ বানাব ওগুলো দিয়ে। ফ্রন্ট লাইনে যখন ঘুমোব তখন ওটা মাথার নিচে দিয়ে ঘুমোব। আমাদের কথা হচ্ছে, মরিই যদি তো আরামে শুয়ে তারপর মরব।

বাইরে থেকে অবিরাম গোলার আওয়াজ আসছে। মাঝে মাঝে গোলা ফাটার আলোয় ঝলসে উঠছে আকাশ। খুব কাছাকাছি একটা বোমা পড়তেই ঘরটা ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। এর অর্থ বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে। খানিক পরেই একটু দূর থেকে ভেসে এল চেঁচামেচি হৈ চৈ-এর শব্দ। নিশ্চয়ই কোন ঘরের ওপর বোমা পড়েছে। অনবরত মেশিনগানের কাপড় ছেঁড়ার মত আওয়াজ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

আমি আর কাট মুখোমুখি বসে আছি, কেউ কথা বলছি না, কিন্তু আমি জানি মনে মনে আমাদের যত কথা হয়ে যাচ্ছে, প্রেমিক প্রেমিকাদেরও বুঝি অত হয় না। চুলোর লালচে আলোয় দেয়ালে ভৌতিক ছায়া পড়ে কাঁপছে। ঘরের মধ্যে আমরা দু'জন সৈনিক, ঢিলেঢালা কোট আর বুট পরে এই মাঝরাতে হাঁসের রোস্ট করছি।

এক নিমেষে কোন সুদূরে চলে গেল মনটা। এই যে আমরা দু'জন, জীবনের মহাসমুদ্রে স্ফুলিঙ্গমাত্র। বাইরে রাত নেমেছে, অন্ধকার কালো রাত, মৃত্যু নিঃশব্দ কুটিল হাসিতে ঘিরে ফেলেছে চারপাশ, আমরা দাঁড়িয়ে আছি জীবন-মৃত্যুর সীমানায়।

হাঁসের চর্বিতে দু'হাত মাখামাখি হয়ে গেছে। মুছে ফেললাম ন্যাকড়া দিয়ে।

কচি আর মোটাসোটা হাঁস রোস্ট হতে সময় নেয় অনেক। একজনের পক্ষে অতক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়, তাই আমি আর কাট পালা করে রোস্ট করতে লাগলাম। একজন কাজ করি অন্যজন তখন শুয়ে বসে একটু জিরিয়ে নেয়।

শুয়ে আছি আমি, কাটের দিকে তাকিয়ে। একটা খুন্তি দিয়ে ডেকচির মধ্যে নাড়াচাড়া করছে ও। আমি তাকিয়ে থাকলাম ওর কাঁধের দিকে, ওর আঙুলের দিকে, ওর নড়াচড়ার দিকে। কাট, আমার বন্ধু, আমি ভালবাসি ওকে।

অবিশ্রান্তভাবে ফ্রন্টের আওয়াজ ভেসে আসছে। শুনতে শুনতে কেমন যেন ছন্দময় মনে হতে লাগল শব্দটা। মনে হলো মা যেন ঘুমপাড়ানি গান গাইছে, 'ঘুমোও সোনামণি, ঘুমিয়ে পড়ো।' আধো ঘুম আধো জাগরণে তাকিয়ে আছি কাটের দিকে। হঠাৎ এক নিমেষে চোখের সামনে থেকে মুছে গেল কাট, মুছে গেল দেয়াল। দেখি, সামনে বিশাল বনভূমি, অন্ধকার রাত, আকাশে তারা জ্বলছে মিটিমিটি। কোথা থেকে সুরেলা কণ্ঠে ভেসে আসছে 'শান্তি, শান্তি', টুংটাং করে ঘণ্টা বাজছে। একজন সৈনিক হেঁটে চলেছে, বিরাট বুট পরেছে, কোমরে বেল্ট বাঁধা, কাঁধে ন্যাপস্যাক ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। মনে দুঃখ নেই, শুধু হেঁটেই যাচ্ছে সামনের দিকে। রাস্তাটা যেন অনন্তের দিকে চলে গেছে। সৈনিকটা হাঁটছে তো হাঁটছেই। যেতে যেতে মিলিয়ে গেল সে।

আবার দেখা গেল ছোট্ট সৈনিকটাকে। ও শুধু হেঁটেই যাচ্ছে। আশপাশ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে লোকজন, ফুল ছুঁড়ে মারছে গায়ে, ও তবু কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সোজা। এসব কোন কিছুই স্পর্শ করছে না ওকে। বিরাট বুট পরে হেঁটে যাচ্ছে মাথা নিচু করে। ও এসবের কিচ্ছু মানে বোঝে না। ও শুধু প্যারেড করা ছাড়া আর সবকিছু ভুলে গেছে।

দিগন্তে দেখা গেল স্বপ্নের মত সুন্দর একটা দেশ, ফুলে ফুলে ছাওয়া। ছোট্ট সৈনিকটা থেমে গেল। তাকিয়ে রইল ওদিকে। আস্তে আস্তে দু'চোখ বেয়ে নামল লোনা জলের ধারা। ও সবকিছু ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি ওই দেশে রেখে এসেছে তার জীবনের কুড়িটি বসন্ত।

আমার গাল কি লোনা জলে ভিজে গেছে? আমি কি কাঁদছি? কাট দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে, আগুনের আলোয় ওর বিশাল ছায়া পড়েছে আমার ওপর, ঠিক যেন বাড়িতে শুয়ে আছি। হাসছে ও, কত দূর থেকে

যে ওর কথা ভেসে আসছে, 'হয়ে গেছে, পল, ওঠো এবার।'

উঠে বসলাম আমি। ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলাম ঝলসানো বাদামী রঙের হাঁসটা। এমন চমৎকার ভুরভুরে গন্ধ বেরোচ্ছে যে মনে হলো আশেপাশের এক মাইলের মধ্যে যারা আছে ছুটে আসবে এখানে।

জিভের জল গড়িয়ে পড়ার আগেই ছুরি কাঁটা চালালাম আমরা। মুখে দিতেই যেন গলে গেল, আহ কি স্বাদ, অপূর্ব!

দু'জন পেট ভরে খাবার পরেও রয়ে গেল বেশ খানিকটা। আমি বললাম, 'আচ্ছা কাট, জাদেন আর ক্রপের জন্যে খানিকটা নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়।'

'চলো তাহলে।'

'চলো।'

বাকি মাংসটুকু খবরের কাগজ দিয়ে ভালমত জড়িয়ে নিলাম। কাট হেসে বলল, 'ওহ্, জাদেন।' ওতেই বুঝে নিলাম আমি। পালকগুলো গুছিয়ে সাথে রাখলাম।

বন্দীশালায় গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম ওদের। জাদেন কাছে এসেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। বুঝলাম পেটুকচাঁদ কিছু একটা আন্দাজ করেছে। তারপর কাগজ থেকে যখন সুস্বাদু রোস্ট বেরোল তখন জাদেনের চোখ ঠিকরে পড়ে আর কি। একখানা পাখনা ধরিয়ে দিতেই দু'হাতে ধরে সেটাতে এক রামকামড় বসাল। চোখ বন্ধ করে গপাগপ খেতে খেতে শুধু বলল, 'হাজার বছর বেঁচে থাকো, বাবা। তোমাদের কথা কোনদিন ভুলব না।'

বেরিয়ে এলাম আমরা। হাঁটা দিলাম ক্যাম্পের দিকে। ভোর হয়ে আসছে। ছাই-এর মত ধূসর আকাশ। এখনও টিমটিম করছে দু'একটা তারা, তারই নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমরা, দু'জন সৈনিক। লম্বা কোট, বিশাল বুট, ভরা পেটে ছোট্ট একজন সৈনিক, সাথে পোড় খাওয়া একজন কমরেড, দু'জনে হেঁটে যাচ্ছি সূর্যোদয়ের দিকে।

ভোরের আলোয় ক্যাম্পের আবছা অবয়ব পরিষ্কার হয়ে উঠল।

ছয়

গুজব শুনতে পাচ্ছি, এবার নাকি আমরাই আক্রমণ শুরু করব। সম্ভবত সে কারণে দু'দিন আগেই ফ্রন্টে যেতে হলো আমাদের। লরি ভর্তি হয়ে যাচ্ছি। যাবার পথে দেখি, গোলায় বিধ্বস্ত স্কুল বিল্ডিং-এর দেয়ালে সারি সারি অসংখ্য হলুদ রং-এর পাইন কাঠের কফিন হেলান দিয়ে রেখে দেয়া। একেবারে নতুন, কাঠের গা দিয়ে এখনও রস গড়িয়ে পড়ছে। কমপক্ষে একশো কফিন তো হবেই।

'চমৎকার,' তিক্ত গলায় বলল মুলার, 'আক্রমণের জন্যে চমৎকার প্রস্তুতি। সাবাস!'

'আমাদের জন্যে কি সুন্দর ব্যবস্থা,' রাগে গরগর করতে করতে বলল ডেটারিং।

ধমক লাগাল কাট, 'বাজে কথা বোলো না।'

'আরে রাগছ কেন,' দেঁতো হাসি দিয়ে বলল মুলার, 'অক্কা পাবার পর কফিন পেলে তো বর্তে যাবার কথা, কি বলো?'

কিছু বলল না কাট, বলবেই বা কি? কথাটা তো সত্যি! বাকিরাও গজগজ করতে থাকল। আসলে ব্যাপারটা এত খোলামেলা ভাবে করা হচ্ছে যে খারাপ লাগছে সবারই।

সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফ্রন্ট যেন তপ্ত কড়াইয়ে বালির মত ফুটছে। যার যার জায়গায় গিয়ে অবস্থান নিলাম আমরা। প্রথম দিনটা চারপাশের অবস্থা বুঝে নিতেই গেল। মাঝে মাঝে যখন গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় তখন অন্য পাশ থেকে লরি, ট্রাক, জীপের আর কামান টানার

আওয়াজ ভেসে আসে। সারারাত ধরে বিরামহীনভাবে আসছে তো আসছেই। সমানে গোলাবারুদ অস্ত্রপাতি খাবার আর নতুন সৈন্য এনে জড়ো করছে ওরা।

ইংরেজদের আর্টিলারির শক্তি অনেক বাড়ানো হয়েছে। ওই খামারটার পাশে, ডানদিকে ন'ইঞ্চি কামানের কমপক্ষে চারটে নতুন ব্যাটারি বসেছে। পপলার গাছগুলোর পেছনে বসিয়েছে ট্রেঞ্চ মর্টার। সব দেখেশুনে মনমেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। তার ওপর জুটেছে নতুন এক ফ্যাসাদ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারে ঘণ্টা দু'য়েক থাকবার পর দেখি আমাদের কামানের গোলা আমাদের চাঁদির ওপরই পড়ছে। চার সপ্তাহে এ নিয়ে তিনবার হলো। যদি এরকম হত যে ভুল হয়ে গেছে, তাহলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু আসলে কামানের নলগুলো গেছে খয়ে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আগে থেকে বোঝার উপায় নেই, কার ঘাড়ে পড়বে গোলা। আজকে রাতেই তো দু'জন আহত হলো একই কারণে।

ফ্রন্ট একটা খাঁচা। যা-ই হোক না কেন, এই খাঁচায় বসেই কাটাতে হবে সময়টা। সেলারের নিচে মাথাটা গুঁজে দিয়ে পড়ে আছি। স্নায়ু সারাক্ষণ টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়, যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। যখন গোলার শব্দ শুনি, শুধু অভ্যাসবশে মাথাটা নিচু করি, জানার কোন উপায়ই নেই কোথায় পড়বে ওটা। বেঁচে আছি, অথবা এখনও যে মরিনি, সেটা ভাগ্য। ফ্রন্টে ভাগ্য যে কি, তা এখানে না থাকলে বোঝা যায় না। যেমন মাসখানেক আগে একদিন আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারে বসে তাস পেটাচ্ছি, বাইরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কি মনে হলো, বাকিদের বললাম, 'তোরা খেল, আসছি আমি।' বলে অন্য একটা সেলারের দিকে রওনা দিলাম। গিয়ে ওখানকার বন্ধুবান্ধবের সাথে খানিকটা আড্ডা মেরে ফিরতি পথে রওনা হলাম আগের সেলারে। কাছে এসে যা দেখলাম, ওটাকে ধ্বংসস্তূপ বললেও কম বলা হয়, একেবারে পুকুর হয়ে গেছে একটা। কি আর করা, ফিরলাম আগের সেলারের দিকে, দেখি ওটাকে ততক্ষণে কবর দিয়ে ফেলেছে আরেকটা বড়সড়ো গোলা। সোজাসুজি

এসে পড়েছে ওটার ওপর। হাত লাগালাম মৃতদের উদ্ধারে। এই যে বেঁচে যাওয়া আমার, এটাকে ভাগ্য বলব না তো কি? শেল-প্রুফ সেলারে বসে থেকেও এক নিমেষে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারি, আবার বাইরে দশ ঘণ্টা গোলাগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও হয়তো দেখা গেল গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। সবই ভাগ্য। এই ভাগ্যের ওপর ভরসা করেই তো বেঁচে আছি আমরা, নইলে কবেই মরে ভূত হয়ে যেতাম।

ইঁদুর-টিদুরের ওপর নজর না রেখে আর পারা যাচ্ছে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে বলার নয়। অবশ্য এর কারণও আছে। ট্রেঞ্চগুলোর অবস্থা একেবারে যাচ্ছেতাই। ডেটারিং-এর ভবিষ্যদ্বাণী, এর অর্থ সেবারের মত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হবে আবার।

এখানকার ইঁদুরগুলোর চেহারা বীভৎস। যেমন মোটা, তেমন কুৎসিত, লেজে মুখে লোম নেই, দেখলেই মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। বমি ঠেলে আসে গলার কাছে। আর সারাক্ষণ যেন সর্বগ্রাসী খিদে লেগেই আছে, খাবার জিনিস যা পাচ্ছে, একটা কামড় দিয়ে স্বাদটা একটু না নিলে যেন চলছে না ওদের। প্রত্যেকটা রুটিতে ওদের কামড়ের দাগ পাওয়া যাবে। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ক্রপ একবার ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে রুটিটা জড়িয়ে মাথার নিচে রেখেছিল। ব্যস, সে রাতের জন্যে ঘুম হারাম হয়ে গেল ওর। কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছিল ওরা, ওর মুখের ওপর দিয়ে সবরকমের লাফ-ঝাঁপ চালিয়েছে ইঁদুরগুলো। রকমসকম দেখে ডেটারিং ছাদ থেকে একটা তার ঝুলিয়ে তারের শেষ মাথায় রুটির মোড়কটা আটকে রেখে বলল, 'দেখি ব্যাটারা, এবার কেমন করে খাস!'

তা ব্যাটারা ডেটারিং-এর ইচ্ছে অপূর্ণ রাখল না, দেখাল কেমন করে খেতে হয়। রাত্রে কিচমিচ শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালল ডেটারিং। দেখে এপাশ ওপাশ দুলছে তারটা। রুটির ওপর আলো ফেলতেই দেখল ওটার ওপর 'চল্ ঘোড়া চল্' ভঙ্গিতে সওয়ার হয়ে আছে বিশাল একটা ধেড়ে ইঁদুর।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। একটা বিহিত না করলেই নয়। রুটি তো আর ফেলে দেয়া যায় না, তাহলে সকালে খাব কি? শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রে রুটির খয়েরি অংশটুকু কেটে আলাদা করে সবগুলো টুকরো একসাথে মেঝের ঠিক মাঝখানে জড়ো করলাম। কাট, ডেটারিং, ক্রুপ সবাই একহাতে পকেট টর্চ, অন্য হাতে ছোট একটা লাঠি নিয়ে রেডি।

খানিকক্ষণ পরেই কিচমিচ আর তুমুল হুটোপুটির শব্দে উৎসব শুরু হয়ে গেল। খুট করে টর্চ জ্বালানোর সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল দমাদ্দম বাড়ি।

'ওই যে, এ, এই…পালাল, পালাল…এই যে, এই যে…, ওই যে, লাগা, লাগা, এহ্–, মরেছে ব্যাটা' শব্দগুলো শেষ হতেই দেখা গেল রক্তের মধ্যে মুখ গুঁজে বেশ কয়েকটা ইঁদুর পড়ে আছে মেঝেতে। কয়েকটা লেজ নাড়াচ্ছে এখনও। আরও গোটাদুই ঘা খেতেই থেমে গেল ওগুলো। মরা ইঁদুরগুলো ফেলে দিয়ে রুটির টুকরোগুলো আবার গুছিয়ে রাখলাম। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম চুপচাপ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

কয়েকবার এভাবে চলার পর ইঁদুরগুলো চালাক হয়ে গেল। টর্চ নেভালেও আর আসে না। খানিকক্ষণ পরে সেদিনের মত রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘুমোতে গেলাম। সকালে উঠে দেখি রুটির একটা টুকরোও আর পড়ে নেই মেঝেতে। একেবারে ঝকঝকে, তকতকে, যেন কেউ ঝাড়ু দিয়ে রেখে গেছে।

প্রচুর গোলাবারুদ আর হ্যাণ্ডগ্রেনেড এসেছে। আমরা বসে বসে বেয়োনেটগুলো ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নিলাম। ব্যবহার না করতে করতে ওগুলোতে মরচে ধরার জোগাড়। আর ব্যবহার করবটাই বা কোথায়!

যেসব বেয়োনেটের ভোঁতা দিকটা করাতের মত, ওগুলো বদলে ফেলে সাধারণ বেয়োনেটগুলো লাগালাম রাইফেলের মাথায়। ওই করাত

দেয়া বেয়োনেটসুদ্ধ যদি কেউ ওদের হাতে বন্দী হয় তাহলে আর দেরি করবে না, সাথে সাথে খতম করে দেবে। অন্য সেক্টরের কয়েকজন ধরা পড়েছিল ওই ধরনের বেয়োনেট নিয়ে। ওদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল নাক কাটা, চোখ ওপড়ানো অবস্থায়।

নতুন কিছু রিক্রুটদের হাতে দেখি করাত দেয়া বেয়োনেট, সাথে সাথে বদলে দিলাম ওগুলো। কিন্তু দিয়েও লাভ নেই। সত্যি বলতে কি, আজকাল বেয়োনেট দিয়ে যুদ্ধ করার চল উঠে গেছে। এখন চলে হ্যাণ্ডগ্রেনেড আর দু'মুখো কুড়োল যার হাতলের মাথাটা চোখা। কুড়োলগুলো ব্যবহার করতে খুব সুবিধা, যে কোন দিক দিয়ে কোপ দিলেই হলো, দরকার পড়লে বেয়োনেটের মত খোঁচাও দেয়া যায়। ওজনে খানিকটা ভারি হওয়ায় আরও সুবিধা হয়েছে। ঘাড়ের ওপর জুতসই একটা কোপ মারতে পারলে একেবারে বুক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ফলাটা। অথচ বেয়োনেটের হাজার ফ্যাকড়া। একবার পাঁজরের ফাঁকে আটকে গেল তো গেল! টানা হ্যাঁচড়া করতে করতে নিজেরই পেট ফুটো হয়ে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা টানাটানির সময় মট করে ভেঙে যায়।

গভীর রাতে গ্যাস আক্রমণ চালাল ওরা। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম, জানতাম এমন কিছু একটা ঘটবেই। তাই গ্যাসমাস্ক সাথে নিয়েই শুয়েছিলাম। গ্যাস-শেল ফাটার সাথে সাথে পরে ফেললাম ওটা।

বিবর্ণ একটা ভোর উপহার দিয়ে বিদায় নিল রাত্রি। সারারাত ঘটেনি কিছুই কিন্তু সেই যে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে ট্রেন আর লরির আনাগোনা, তার আর থামাথামি নেই। আসছে তো আসছেই। কি যে আনছে ওরা আর কোথায় জমা করছে তা ওরাই জানে। আমাদের কামানগুলো অবিশ্রান্তভাবে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে ওদিকে। শব্দের আর বিরাম নেই।

চোখমুখ বসে গেছে সবার। কেউ কারও দিকে ভাল করে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

'আমার মনে হয় সোমের (Somme) যুদ্ধের মত কিছু একটা

ঘটতে যাচ্ছে এখানেও,' বিষণ্ণ আর চিন্তিতমুখে বলল কাট, 'ওখানে সেবার সাতদিন সাতরাত একটানা গোলাবর্ষণ হয়েছিল আমাদের ওপর।'

এখানে আসার পর থেকে কাটের মেজাজটা কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। হাসিঠাট্টা করছে না একবারও। তারমানে খুব খারাপ লক্ষণ। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করছে ও। শুধু জাদেন খুব খুশিতে আছে, কারণ খাবার সাপ্লাই যথেষ্ট এবার। ও ভাবছে এভাবে আর ক'টা দিন গেলে কোনকিছু ছাড়াই ক্যাম্পে ফিরতে পারবে বিশ্রামের জন্যে।

প্রায় ওর ভাবনা মতই দিনগুলো কাটতে থাকল। ভোর হচ্ছে, সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে মাথার ওপর, ঢলে পড়ছে পশ্চিমে, রাত আসছে, আবার ভোর হচ্ছে—চলছে এভাবেই। আমার ডিউটি পড়েছে রাতে, লিস্‌নিং পোস্টে। পালা করে পাহারা দিতে হয়।

পাহারা দিচ্ছি লিস্‌নিং পোস্টে। অন্ধকার ঝলসে উঠছে রকেট আর প্যারাশুট লাইটের আলোয়। আমার দেখার ওপরই নির্ভর করছে কতজনের জীবন, ভাবতেই শিরশির করে উঠল বুকের মধ্যে। সারাক্ষণ টানটান হয়ে থাকে স্নায়ু, কিছু একটা সন্দেহ হলেই বুকের মধ্যে দুরমুশ পেটা শুরু হয়ে যায়। সময় যেন আর কাটতে চায় না। লুমিনাস ঘড়ির কাঁটা মনে হয় চুম্বকের মত আটকে থাকে এক জায়গায়। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে থাকতে থাকতে স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসতেই ঘুম পেয়ে গেল আমার। ঘুম তাড়ানোর জন্যে জুতোর মধ্যে পায়ের আঙুলগুলো ঘোরাতে থাকলাম, একবার ডান থেকে বামে, আরেকবার বাম থেকে ডানে। শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্নের মত কেটে গেল সময়টুকু। আমার পালা শেষ। রওনা হলাম সেলারে। এখনও শোনা যাচ্ছে ওদের ট্রেন আর লরির শব্দ।

ক'দিন যেতেই সয়ে গেল অনেকটা। এখন আর ওই ট্রেন-লরির শব্দে তেমন কোন বিকার হয় না আমাদের। অবসর পেলেই কয়েকজন একসাথে বসে তাস পেটাই। কে জানে, এমন ভাবে চলতে চলতেই হয়তো ফিরে যাবার সময় এসে যাবে আমাদের।

সারাদিন ধরে অবজারভেশন বেলুনগুলো আকাশে উড়ছে। গুজব

শুনি, এবারে ওরা ট্যাঙ্ক আর খুব নিচু দিয়ে উড়তে পারে এমন প্লেন নিয়ে আক্রমণ চালাবে। এসব কথায় পাত্তা দেই না তেমন। তার চেয়ে ওরা আগুন ছুঁড়ে মারবার কি এক যন্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছে, সেটার প্রতিই আগ্রহ বেশি আমাদের।

রাতে শুয়ে পড়েছি অন্যান্যদিনের মতই। হঠাৎ মনে হলো একশোটা বাজ একসাথে ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। থরথর করে কেঁপে উঠছে সেলার।

সবাই যার যার জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে কোণের দিকে সরে গেলাম। কিছুটা বেশি নিরাপদ ওখানটা। খানিকক্ষণ পরপরই হাত দিয়ে দেখছি জিনিসগুলো আছে কিনা জায়গামত।

প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে থরথর করে কেঁপে উঠছে সেলার। মাঝে মাঝে ভারি গোলা যখন ধারেকাছে ফাটছে, ঠেলে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে পুরো সেলারটা। পরমুহূর্তেই নিচে নেমে আসছে। ছাদ থেকে ঝুরঝুর করে বালি সিমেন্ট খসে পড়তে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

বিদ্যুতের ঝলকের মত গোলা ফাটার আলো ভেতরে আসতেই সবার মুখের দিকে তাকালাম। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে সবাই। নতুন রংরুটগুলো ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে কোনরকমে কাঁপুনি থামিয়ে রেখেছে।

সেলারের ঠিক ওপরে যখন গোলা পড়ে তখন মনে হয় এই বুঝি শেষ। একমুহূর্তে সমস্ত কিছু ছবির মত ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। ট্রেঞ্চের মধ্যে বোমা পড়তেই কেঁপে উঠল শরীর। ফাঁপা হিংস্র আওয়াজ, মনে হয় হাজার হাজার বাঘ ডেকে উঠল একসাথে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যারা এর আওয়াজ আগে শোনেনি তাদের এ অনুভূতি বোঝানো যাবে না। সকাল হতেই দেখা গেল বেশ কিছু রংরুট আতঙ্কে সবুজ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর পরই বমি করছে।

চাঁদের আলোর মত চুইঁয়ে এল ভোর। আলোর ঝলকানি আবছা হয়ে এল। গোলাবর্ষণ এমন অবিশ্রান্ত ভাবে চলছে যে মনে হলো অনন্ত

কাল ধরে চলতেই থাকবে। হঠাৎ আওয়াজটা যেন বদলে গেল খানিকটা, কান পাততেই বুঝলাম কামানের সাথে যোগ হয়েছে মাইন ফাটার শব্দ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। টাল সামলানোর জন্যে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। অসহ্য! সারা পৃথিবীটা বোধহয় গোরস্থান হয়ে গেছে!

ডিউটি বদলের সময় হয়ে গেছে। একদল বেরিয়ে যেতেই ফিরে এল রাতের দলটা। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল ওরা। হাঁটু কাঁপছে, সারা গা-মাথা ধুলো-মাটিতে ভর্তি, আলাদা করে চেনার উপায় নেই কাউকে। একজন সোজা কোণের দিকে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। কোনদিকে না তাকিয়ে খাওয়া শুরু করে দিল। আরেকজন দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল, কিছুক্ষণ পর পরই কেঁপে কেঁপে উঠছে ও। শুনলাম, ও ছিল দেয়ালের মাথায়। শক ওয়েভের ধাক্কায় দু'বার দেয়ালের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আহত হয়নি কিন্তু আতঙ্কে স্বাভাবিক বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে ও।

খেয়াল করলাম, রংরুটগুলো একভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। জিনিসটা মনে রাখলাম আমি। রংরুটদের চোখে চোখে রাখতে হবে। আতঙ্ক জিনিসটা খুব ছোঁয়াচে আর এ মুহূর্তের জন্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এরমধ্যেই দেখি নতুন কয়েকজন আরও কোণের দিকে সরে গেল। থর থর করে ঠোঁট কাঁপতে শুরু করেছে ওদের। তবে খানিকটা আশার কথা যে সকাল হয়ে গেছে। দিনের আলোয় ভয়টা কেটেও যেতে পারে। তবে এমন গোলাবর্ষণের মানে বোঝা হয়ে গেছে আমাদের। আসবে ওরা, সর্বশক্তি নিয়ে। কচুকাটা করে ফেলবে আমাদের যদি ঠেকাতে না পারি। তবে দুপুরের আগে আসছে না ওরা।

গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। ভেতর থেকে দেখা যায় শুধু কাদার ফোয়ারা। ছিটকে উঠে আস্তে করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এতক্ষণে কিছু কিছু রংরুটও বুঝে গেছে কি হতে যাচ্ছে। আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওরা। যত সময় যাচ্ছে ততই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে

যাচ্ছে আমাদের, কিন্তু হামলা আর আসে না। আড়ষ্ট হয়ে গেছি সবাই, কথা বলছি খুব কম।

আমাদের ট্রেঞ্চগুলো আর ট্রেঞ্চ নেই, ওগুলো এখন গোলার গর্ত আর মাটির স্তূপ। কোথাও কোথাও দেড় ফুট উঁচু হয়ে আছে মাত্র। সেলারের মুখে একটা গোলা পড়তেই প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল। শক্ ওয়েভের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম মেঝেয়। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল সেলারটা। মাটি দিয়ে বুজে গেছে বেরোনোর মুখটা।

চিৎকার করে উঠল কয়েকজন রংরুট। কষে ধমক লাগাল কাট। এক্ষুণি পরিষ্কার করতে হবে মুখটা, নইলে বাতাস বন্ধ হয়ে মারা পড়ব সবাই। হাত লাগালাম কয়েকজন। পাগলের মত মাটি সরাতে থাকলাম। অল্পক্ষণেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো। অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে সরে এলাম। যাকে হাতে বাধল, ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম কাজে। দেয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। একটু পর হঠাৎ করে মনে হলো, কাজে ব্যস্ত থাকলেই আতঙ্ক ভুলে থাকা যাবে। সাথে সাথে যারা কাজ করছিল তাদের ফিরতে বললাম। ওদের বদলে রংরুটদের পাঠালাম পালা করে। ঘণ্টাখানেক একটানা পরিশ্রমের পর হুড়মুড় করে গড়িয়ে নামল মাটির স্রোত, সেই সাথে খুলে গেল বেরোনোর মুখ। আলো দেখা যেতেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সাথে সাথে জোরাল হয়ে উঠল গোলার আওয়াজ।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কোম্পানি কমাণ্ডার। আমরা তাড়াতাড়ি ঘিরে ধরলাম তাকে। রংরুটদের আগ্রহই বেশি, পেছন থেকে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল সামনে আসার জন্যে।

'খবর বেশি ভাল না বেশি খারাপও না,' শুরু করল কমাণ্ডার, 'ওদিকে দুটো সেলার মিশে গেছে মাটিতে। যাক সেসব কথা, এখন খাবার আনার ব্যবস্থা করতে হয়।'

খাবারের কথা শুনেই চোঁ করে মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। এতক্ষণ উত্তেজনায় খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম সবাই, শুধু জাদেন

ছাড়া। দেখি রংরুটদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার বুঝলাম, কি ভাবছে ওরা। খাবার যখন আনা যাবে তখন অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ নয়।

যুদ্ধে গোলাবরুদ যেমন দরকার, খাবার দরকার তার চেয়ে কম নয়। আমরা পুরানোরা বেশি আশান্বিত হলাম না। যতক্ষণ খাবার না আসছে ততক্ষণ আশা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খাবার আনা গেল না। প্রথমে একদল পাঠানো হলো, ফিরে এল অল্পক্ষণের মধ্যেই। দ্বিতীয় দল ফিরল আরও তাড়াতাড়ি। সবশেষে কাট নিজেই গেল। একটু আশান্বিত ছিলাম কিন্তু সে-ও ফিরল খালি হাতে। খবর দিল, যেরকম গোলাবর্ষণ হচ্ছে তাতে মানুষ তো দূরের কথা একটা মাছিও জীবিত গলে যেতে পারবে না ফাঁক দিয়ে।

কি আর করা, অগত্যা কোমরের বেল্টই খানিকক্ষণ পর পর কষে কষে বাঁধছি। রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে আমাদের। কিন্তু উপায় নেই। সামান্য একটু রুটি ছিল, তার শাদা অংশটুকু একবারের জায়গায় তিনবার করে চিবিয়ে খেলাম। তা-ও শেষ হয়ে গেল একসময়। রুটির খয়েরি অংশটুকু রেখে দিয়েছি ব্যাগে। কিছুক্ষণ পর পরই বের করে চেটে নিচ্ছি একটু করে।

হিংস্র শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে রাত্রি এল। প্রচণ্ড খিদের চোটে ঘুমাতে পারছি না পর্যন্ত, শুধু ঢলে পড়ছি মাঝে মাঝে। জাদেনের দুঃখ যে সেদিন ইঁদুর মারার জন্যে অতগুলো রুটির টুকরো ওভাবে নষ্ট না করলেই ভাল হত। এখনও যদি ইঁদুরগুলো এসে রুটির টুকরোগুলো ফেরৎ দেয় তাহলে জাদেন ওদের পায়ে সালাম ঠুকবে সাথে সাথে। এদিকে পানির পরিমাণও কমে আসছে দ্রুত। এখনও টান পড়েনি কিন্তু পড়তে কতক্ষণ!

মাঝরাতের দিকে তুমুল হুটোপুটির শব্দে কান খাড়া হয়ে গেল। শব্দটা দ্রুত কাছে আসতে আসতে ঢুকে পড়ল সেলারের মধ্যে।

কেউই তো ঘুমাইনি বলতে গেলে, সাথে সাথে টর্চ জ্বাললাম। ইঁদুর,

শত শত, হাজার হাজার। টর্চের আলো পড়তেই ঝিলিক দিয়ে উঠল ওদের কুতকুতে চোখগুলো। হাতের কাছে লাঠিসোটা যা ছিল তাই নিয়ে শুরু হলো অভিযান। ঘণ্টার পর ঘণ্টাব্যাপী উৎকণ্ঠা, রাগ-ক্ষোভ-হতাশা আর খিদের জ্বালা একসাথে প্রকাশ পেল। পাগলের মত মেরে চললাম। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ভয় হলো নিজেদের মাথা ফাটিয়ে ফেলব কিনা। কোনরকমে শান্ত করা হলো সবাইকে।

শান্ত হতেই প্রচণ্ড ক্লান্তি ভর করল শরীরে। হাত-পা আর নিজের বশে রইল না। মেঝের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তাও ভাল যে এখনও বেঁচে আছি। আমাদের সেলারের যে অবস্থা, খুব বেশি মাটির নিচে নয়।

একজন কর্পোরাল ভেতরে ঢুকল। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকালাম। চোখ বোজার ঠিক পূর্বমুহূর্তে দেখলাম হাতভর্তি রুটি। একলাফে উঠে দাঁড়ালাম। শুনলাম গভীর রাতে তিনজন লোক কোনরকমে ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। ওরাই রুটিগুলো এনেছে। ওদের কাছে খবর পাওয়া গেছে যে এখন আমাদের আর্টিলারি লাইন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ চলছে। শত্রুপক্ষ যে এত গোলা পাচ্ছে কি করে সেটাই ভাববার বিষয়।

তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করে আছি। দুপুরের দিকে যা ভেবেছিলাম, তাই হলো। একজন রংরুট অজ্ঞান হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছিলাম ওকে, দাঁতে দাঁত ঘষছে, হাত একবার মুঠো করছে আরেকবার খুলছে। আতঙ্কে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। এসব দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেছি। গত কয়েকঘণ্টা ওকে যখন খুব শান্ত দেখাচ্ছিল, তখনই বুঝেছি, পাকা আপেলের মত ও-ই টুক্ করে আগে খসে পড়বে, হলোও তাই।

কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরল ওর। আশেপাশে লোকজনের ভিড় একটু কমতেই উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল খানিকক্ষণ, তারপর চোরের মত নিঃশব্দে বাইরে যাবার রাস্তার দিকে হাঁটা দিল ও। আমিও এতক্ষণ ওর দিকেই নজর রাখছিলাম। দরজার দিকে যেতেই

থামালাম ওকে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই একটু বাইরে, এক্ষুণি ফিরব।' ধাক্কা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল ও।

'দাঁড়াও, বাইরে গোলা পড়া থামবে শিগ্‌গিরই, তারপর না হয় যেও!'

মনে হলো এক মুহূর্তের জন্যে ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল, পরমুহূর্তেই পাগলা কুকুরের মত জ্বলে উঠল চোখদুটো। কোন কথা না বলে প্রাণপণে ধাক্কা মারল আমাকে। আমিও প্রস্তুত ছিলাম, ফলে সুবিধা করতে না পেরে, টানা-হেঁচড়া শুরু করল ও, 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে, বাইরে যেতে দাও!'

'এত ব্যস্ত হবার কি আছে, কাট, এসো তো এদিকে।' কাটও এতক্ষণ ধরে খেয়াল করছিল সব, আমার ডাক শুনে এগিয়ে এসে রংরুটটাকে চেপে ধরল জোরে।

ব্যস্, শুরু হয়ে গেল হাত পা ছোঁড়া, চিৎকার, থুথু ছিটানো, যেন কোন বাচ্চা ছেলেকে জোর করে টিকা দেয়া হচ্ছে। থুথুতে মুখ ভরে গেছে ওর, চিৎকার করে আবোল-তাবোল কি বলছে ও-ই জানে, অর্ধেক কথা গলার মধ্যেই আটকে থাকাতে খক্ খক্ করে কাশি শুরু করল। এ এক ধরনের রোগ, নাম ক্লসট্রোফোবিয়া। এতে রোগী মনে করে যেখানে আছে সেখানে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফলে যে করেই হোক সে বাইরে যাবেই। আর বাইরে গিয়ে কোন আড়াল-টাড়ালের বালাই নেই, যেদিকে খুশি সেদিকে দৌড়ে পালাবে। ও-ই প্রথম নয়, এর আগে আরও কয়েকবার ঘটেছে এরকম ঘটনা।

হাত পা ছোঁড়া কমলেও এখনও আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে, চোখ পাগলের মত। এখন ওকে ভাল করার একটাই মাত্র উপায় আছে, আগাপাশতলা একটা রামধোলাই দেয়া। ওর এই অবস্থায় কাজটা করতে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু উপায় নেই। মারলাম, আমি আর কাট, হাতের সুখ মিটিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল ও। না হয়েই বা যাবে কোথায়। অন্য রংরুটদের দিকে তাকিয়ে দেখি মার দেখে ভয়ে শাদা হয়ে গেছে

মুখ। ভাল, তবুও যদি এমন করার ঝোঁকটা যায়। অবশ্য বেচারাদেরও দোষ দিই কি করে? রিক্রুটিং ডিপো থেকে সোজা পাঠিয়ে দিয়েছে ফ্রন্টে। ট্রেনিং-ফ্রেনিং-এর ধার-কাছ দিয়েও যায়নি। আর এসেই এমন অবস্থার মধ্যে পড়েছে, যে অবস্থায় ঝানু সৈনিকের চুলও একরাতে পেকে শাদা হয়ে গেলে অবাক হবার কিছু নেই।

ঘটনাটার পর সবাই আরও চুপচাপ হয়ে গেল। ফলে সময়টা আরও অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হলো যার যার কবরে বসে আছি, এখন শুধু মাটি চাপা দিলেই হয়।

সে আশাটা পূরণ করার জন্যেই মনে হলো সমস্ত সেলারটা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল। ঝাঁকুনির চোটে সিমেন্ট-বালি খসে পড়ল ছাদ থেকে। চেঁচিয়ে উঠল একজন রংরুট। একটা গোলা সরাসরি আঘাত হেনেছে সেলারের ওপর। এখনও বেঁচে থাকার কারণ হচ্ছে গোলাটা ছিল হালকা আর আমাদের ট্রেঞ্চটা পুরানো। এখনকার ট্রেঞ্চগুলোর মত হালকা কাঠামো আর মাটির অল্প নিচে হলে আর দেখতে হত না।

ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সেলারটা। ধোঁয়া একটু কেটে যেতেই যা ভয় করছিলাম তা-ই হলো। এতক্ষণ যদিও চুপচাপ ছিল, এই ব্যাপারের পর প্রচণ্ড স্বরে চেঁচানো শুরু করল সেই রংরুটটা। তার সাথে যোগ দিল আরও দু'জন। চিৎকারে কানে তালা লেগে যাবার দশা হলো। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বাইরে চলে গেল প্রথম রংরুটটা। সাথে সাথে আমিও ছুটলাম বাইরে। এক পলকে দেখলাম বাকি দু'জনকে জাপটে ধরেছে অন্যরা। বাইরে বেরিয়েই দেখি কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ছুট লাগিয়েছে। বুঝলাম দৌড়ে ধরে ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগবে তার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় পায়ে গুলি করে ফেলে দিলে। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়। কিন্তু কিছু করার আগেই তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল বাতাসে। দু'হাতে কান-মাথা ঢেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মাটিতে। প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটল সামনেই। মাটি, ইট-পাথরের ফোয়ারা ছিটকে উঠল আকাশে, বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল গায়ের ওপর। ধোঁয়াটা সরে

যেতেই দেখলাম ট্রেঞ্চের সারা দেয়াল কাদা, স্প্লিন্টার, মাংস চর্বি আর ইউনিফর্মের টুকরোয় ভর্তি। আস্তে করে ফিরে এলাম সেলারে।

ফিরে দেখি একজন রংরুট এরমধ্যেই পাগল হয়ে গেছে, পাঁঠার মত দেয়ালে মাথা ঠুকছে। বুঝলাম, যে করেই হোক আজকে রাতেই ওকে এখান থেকে সরিয়ে পেছনে দিয়ে আসতে হবে, নইলে বাকিদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। আমি আর কাট মিলে পিছমোড়া করে ওর হাতদুটো বেঁধে রেখে দিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি এভাবেই থাকুক ও। অবশ্য এমনভাবে বেঁধেছি যে দরকারের মুহূর্তে সহজেই বাঁধন খুলে ফেলতে পারব।

কাট বলল, 'তার চেয়ে বরং তাস পেটাই খানিকক্ষণ।'

'সেই ভাল, কিছু নিয়ে অন্তত ব্যস্ত থাকা যাবে।'

কয়েকজন বসে পড়লাম সাথে সাথে। কিন্তু লাভ হলো না কোন। ধারেকাছে গোলা পড়ার আভাস পেলেই সাথে সাথে খেলা বাদ দিয়ে ওটার দিকে খেয়াল করি, তারপর আবার যখন খেলায় মন দিতে যাই ততক্ষণে কি খেলা হচ্ছিল, কি কি তাস চলে গেছে ভুলে বসে আছি। এভাবে কি খেলা চলে? বাদ দিলাম একটু পরেই। আবার যে সেই। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে অসহ্য সময়। মনে হচ্ছে, মুখবাঁধা একটা বস্তার মধ্যে পুরে চারপাশ থেকে খোঁচাচ্ছে কেউ আমাদের।

দুঃস্বপ্নের মত রাত এল আরেকটা। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা থাকে। আমরা সে সীমা অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি। এ পরিস্থিতিতে মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে। আত্মহত্যা করাও বিচিত্র কিছু নয়। পা থর থর করে কাঁপছে, শরীরের ভার বহন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। হাত অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে একটা জন্তুকে শুধু মানুষের চামড়া দিয়ে মুড়ে রাখা আছে। ভয়ে অন্যের দিকে তাকাচ্ছি না পর্যন্ত যদি সত্যিই তেমন কিছু দেখে ফেলি! দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে বসে আছি, যা হয় হোক, তবু শেষ হোক এর।

হঠাৎ করে ধারে কাছের গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। এখন যেগুলো

পড়ছে ওগুলো পড়ছে অনেক পেছনে। আমাদের ট্রেঞ্চে কোন আক্রমণ নেই। হ্যাণ্ডগ্রেনেডগুলো নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম সাথে সাথে। এসে গেছে ওরা!

বাইরে ছুটে যাবার আগে পিন খুলে একটা হ্যাণ্ডগ্রেনেড ঠিক সেলারের বাইরে ছুঁড়ে দিল হাই। যদি ওখানে পৌছে গিয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাবে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল গ্রেনেডটা কিন্তু কোন আর্তনাদ ভেসে এল না, তার মানে এখনও এখানে পৌছয়নি। ছুটে বাইরে এলাম সবাই।

চারদিকের অবস্থা শোচনীয়, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকার অবস্থাও বোধহয় এমন হয় না। দেখলে বিশ্বাস হবে না, এখানে কোন জীবিত লোক থাকতে পারে। কিন্তু আছে। ট্রেঞ্চের সর্বদিক থেকে হেলমেট পরা মাথা নড়াচড়া করছে। ওদিকে গজ পঞ্চাশেক দূরে এরই মধ্যে একটা মেশিনগান কাপড় ছেঁড়ার মত আওয়াজ শুরু করে দিয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়া আর বেড়া নেই, টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে; তবু যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে সেটুকুও যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করতে পারবে।

এতক্ষণে দেখা গেল ওদের, আসছে, প্লাবনের ঢেউয়ের মত, অমোঘ নিয়তির মত আসছে ওরা। পেছন থেকে গর্জে উঠল কামান। আর্টিলারি ফায়ার শুরু হয়েছে। মেশিনগান তো আগেই ছিল, সেইসাথে যোগ হলো রাইফেলের আওয়াজ।

হাই আর ক্রপ হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছোঁড়া শুরু করল। অক্লান্তভাবে ছুঁড়ে যাচ্ছে ওরা। দু'জন পিন খুলে ওদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, ওরা ক্রমাগত ছুঁড়ে যাচ্ছে। হাই ছুঁড়তে পারে পঁচাত্তর গজ, ক্রপ ষাট গজ, মেপে দেখা। গ্রেনেডের ক্ষেত্রে দূরত্বটা অত্যন্ত জরুরী কারণ চল্লিশ গজের মধ্যে না আসতে পারলে ছুটন্ত শত্রু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না।

মুখের চেহারা স্বাভাবিক না থাকলেও হেলমেট দেখে বোঝা গেল ওরা ফরাসী। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর এতটা প্রতিরোধের কথা ওরা ভাবতেও পারেনি। যেজন্যে ভাঙাচোরা কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌছনোর আগেই প্রচণ্ড মার খেয়েছে ওরা। ওদের পুরো একটা লাইনকে শুইয়ে দিয়েছে আমাদের মেশিনগান। এরপরও একটার পর একটা বাধা

টপকে এগিয়ে আসছে ওরা।

একজন মাথা নিচু করে ছুটে এল সামনে, এসেই পড়ল কাঁটাতারের ফাঁদে। বেড়ার নিচে গভীর গর্ত। হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেড়ার ওপরে। হাতদুটো জোড়হাতের ভঙ্গিতে আটকে রইল খানিকক্ষণ। মেশিনগানের গুলি ওকে ওই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে দিল। হাতদুটো রয়ে গেল ওখানেই, মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে।

এবার পিছোতে হবে। এটাই এ যুদ্ধের নিয়ম। যে মুহূর্তে পিছোতে যাব, ঠিক তখনই সামনে ভোজ বাজির মত উঠে দাঁড়াল তিনটে মুখ, কাদামাটিতে মাখামাখি। ভেবেই পেলাম না এত কাছে এল কি করে? স্টীলের হেলমেটের নিচে কালো ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা একজন, একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখে তাকাল আমার দিকে। হাত উঠিয়েছি গ্রেনেড ছুঁড়ব বলে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিতের মত হয়ে গেলাম, ওটাও তো মানুষের! এক মুহূর্ত কাটল, মনে হলো যেন কতশত বছর ধরে তাকিয়ে আছি! সমস্ত হত্যাকাণ্ড ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়। নিস্পলক ভাবে তখনও তাকিয়ে আছে চোখজোড়া। ওর পেছন থেকে একটা মাথা উঠে দাঁড়াল, হাত উঁচু করল। বিদ্যুৎ খেলে গেল সারা শরীরে। হ্যাণ্ডগ্রেনেডটা ঠিক গিয়ে পড়ল ওদের মাঝখানে। প্রচণ্ড শব্দের সাথে ছিটকে উঠল রক্তমাংস, ইউনিফর্ম।

ছুটলাম এবার পেছনে। যাবার আগে প্রত্যেকটা ট্রেঞ্চের মধ্যে কাঁটাতারের টুকরোগুলো দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখলাম। ওগুলোর সাথে গ্রেনেডগুলোর রিং এমনভাবে আটকে রাখলাম যেন একটু টান লাগলেই ফেটে যায় ওগুলো। মেশিনগানও সরিয়ে নেয়া হয়েছে পেছনে। ওখান থেকে নবোদ্যমে শুরু করেছে আবার।

আমরা এখন হিংস্র জানোয়ার। যুদ্ধ নয়, প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রাম করছি আমরা। মানুষের ওপর বোমা ফেলছি না, ফেলছি মৃত্যুদূতের ওপর। এই তিনদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি আমরা, এতদিনে চেহারা দেখতে পেয়েছি ওদের। প্রচণ্ড ক্রোধে চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠল। এরাই যত কষ্টের হোতা, এবার পেয়েছি ওদের। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল

প্রতিশোধের আগুন। এবার দেখে নেব, কচুকাটা করে ছাড়ব ওদের!

প্রতিটি কোণে ঘাপটি মেরে আছি আমরা। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করছি। প্রতিটা কাঁটাতারের ফাঁদ বা কোন বাধার কাছে এসে শত্রুর গতিটা কমলেই গ্রেনেডের বন্যা বইয়ে দিচ্ছি সেখানে। দিয়েই পেছনে ছুট। এত কাছে গ্রেনেড ফাটে মাঝে মাঝে যে তাপে হাত-পা ঝলসে যায়, বোমার ছোটখাটো টুকরো বিঁধে যায় শরীরে। গুড়ি মেরে পালাই, বেড়ালের মত চার হাত পায়ে ছুটি মাঝে মাঝে। মনে হয় আমরা নিজেরা দৌড়াচ্ছি না, পেছনে পেছনে প্রচণ্ড একটা অশুভ শক্তি তাড়া করছে, তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে আমাদের ওপর, সেই ধাক্কাতেই ছুটে চলছি। ছুটতে ছুটতে ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। পরিষ্কার অনুভব করলাম, মনেপ্রাণে আমি এখন একজন খুনী। দানবের হিংস্রতা চলে এসেছে আমার মধ্যে। মনে হলো এখন ওদের খুন করে চোঁ চোঁ করে রক্ত পান করতেও বিন্দুমাত্র বাধবে না আমার। যতবার পেছনে ছুটি, মনে হয় ক্রোধে ফেটে চৌচির হয়ে যাব। দানবের শক্তি এসে ভর করে শরীরে, বেপরোয়া হয়ে উঠি। এখন যে-কোন কিছুই করতে পারব আমি।

সামনের দিকের ট্রেঞ্চগুলো ছেড়ে এসেছি। ওগুলো এখন নামেই ট্রেঞ্চ। মাটির স্তূপ, গর্ত, ইট-কাঠের টুকরো দেখলে বিশ্বাস হবে না যে ওগুলো কোনকালে ট্রেঞ্চ ছিল। তবু ওর মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করে যাচ্ছি আমরা, শত্রুর ক্ষয়ক্ষতিও প্রচুর হয়েছে। একটানা তিনদিন গোলাবর্ষণের পরও এত বাধা পাবে স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা। অবশ্য স্বপ্ন যদি দেখে থাকে তবেই।

দুপুর হয়ে গেছে। মাথার ওপর অকৃপণ হাতে আগুন ঢালছে সূর্য। কুলকুল করে ঘাম নামছে জুলফি আর কপাল বেয়ে। চোখে ঢুকতেই জ্বালা করে ওঠে। ইউনিফর্মের হাত দিয়ে মুছে নিচ্ছি বারবার। জামার হাতার রক্তে মুখটুখ ভরে গেছে।

পিছোতে পিছোতে শেষ পর্যন্ত আরেকটা ট্রেঞ্চে পৌঁছলাম। মোটামুটি অক্ষত অবস্থা এটার। বেশ কিছু সৈনিক জড়ো হয়ে পাল্টা আক্রমণের

প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরাও যোগ দিলাম ওদের সাথে। ট্রেঞ্চের মধ্যে নামতেই শুরু হলো গোলাবর্ষণ। আমাদের তাড়া করে আসছিল যারা, তাদের পুরো একটা লাইন অদৃশ্য হয়ে গেল এক পলকে। থমকে দাঁড়াল বাকি দলটা। এইবার বাছাধনেরা ফাঁদে পড়েছ! দেখে নেব এবার!

আমাদের গোলা পড়ছে প্রায় শ'খানেক গজ সামনে। ছুটে ওটুকু রাস্তা এগোলাম। আমার পাশে দৌড়ুচ্ছিল এক ল্যান্স কর্পোর্যাল। হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল তার মাথাটা, ঝর্ণার মত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। গা-গুলিয়ে উঠল সাথে সাথে। মাথা ছাড়াই ছুটল তিন্ চার পা, তারপর দড়াম করে মাটিতে পড়ল লাশটা। এক পলকের মধ্যে সবকিছু দেখা হয়ে গেল আমার।

এবার কুকুর যেভাবে শেয়াল তাড়া করে, সেভাবে তাড়া করলাম আমরা। দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে নিয়ে ছুটল ওরা। তাড়া করতে করতে পৌঁছলাম আমাদের বিধ্বস্ত ট্রেঞ্চের কাছে, ছুটতে ছুটতে পার হয়ে গেলাম ওটা।

ওহ্, আবার সেই সেখানে, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সকালে। ছুটতে ছুটতে রিজার্ভ সৈনিকদের বিশ্রাম করার জায়গায় পৌঁছুতেই শরীরের সমস্ত শক্তি এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল, মনে হলো ধপ করে শুয়ে পড়ি ওখানেই। এখন তো আমরা পশু ছাড়া আর কিছুই নই। মানুষ হলে ওখান থেকে আমাদের নড়ায় কার বাবার সাধ্য! পশু বলেই ছুটতে থাকলাম নরকের দিকে। ওদেরকে মারতেই হবে, খতম করে দিতে হবে সবাইকে। কোন দয়ামায়া নেই, শুধু হত্যা। রক্তের সাগরে হোলি খেলব আজ। মারতেই হবে ওদের, নয়তো ওরা আমাদের মারবে। এর এদিক ওদিক হবার যো নেই।

ছেঁড়াখোঁড়া ঝলসানো বাদামী ম্যাটি সূর্যের খরতাপে চকচক করছে। ওর ওপর দিয়ে খ্যাপা মোষের মত ছুটছি আমরা। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁটদুটো চেটে ভিজিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। থুথু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে তবু

থামা যাবে না। ছুটছি তো ছুটছি, শুধু গর্ত বাঁচিয়ে যাচ্ছি, কিসের ওপর পা পড়ল দেখার সময় নেই। কত আহত নিহত সৈনিকের গায়ের ওপর দিয়ে ছুটলাম তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে পড়ে থাকা আহত সৈনিক পা চেপে ধরে গোঙাতে থাকে। লাথি মেরে সরিয়ে দিই হাত, ওসব দেখার সময় নেই। সামনে ছুটছে যারা ওদের মারতে হবে, এছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নেই এখন।

দয়া মায়া বলে কিছুই নেই এখন আর আমাদের মধ্যে, বিপক্ষের কাউকে দেখলেই হলো। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। আমরা এখন আর মানুষ নই, আমরা লাশ, কোন মন্ত্রবলে এখনও ছুটে বেড়াচ্ছি, মেতে উঠেছি নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞে।

অল্পবয়সী এক ফরাসী সৈনিক, পিছিয়ে পড়েছে ছুটতে ছুটতে। ধরে ফেললাম। দু'হাত উঁচু করল ও। একহাতে তখনও রিভলভার ধরা। আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে নাকি গুলি করতে যাচ্ছে কে জানে! ওসব বোঝার সময় কই? শুধু দেখলাম একটা ঝিলিকের সাথে সাথে মাথাটা ছিটকে পড়ল পাশে। শরীরটা মাটিতে পড়ার আগেই ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। আরেকজন ফরাসী পিছিয়ে পড়ল, কিছু বোঝার আগেই এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা, দু'হাতে বাতাসে কি যেন খামচে ধরতে চাইল। এক লাথিতে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। বেয়োনেটটা বের করে নিয়েই আবার ছুটলাম। আরেকজনকে ধরতে পারলাম একটু পরেই। ধরা পড়ে গেছে বুঝে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলল ও। দু'হাতে চোখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। কিছু করলাম না ওকে। আরও কয়েকজন বন্দীর সাথে আহতদের বয়ে নেবার কাজে লাগানো যাবে ওকে।

ধাওয়া করতে করতে যখন ওদের ছুঁই ছুঁই অবস্থা হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম পৌঁছে গেছি ওদের লাইনে। এখন পর্যন্ত তেমন কোন বড় বিপর্যয় ঘটেনি আমাদের। ভাবতেই গর্জে উঠল মেশিনগান। এক সেকেণ্ডের মধ্যে হ্যাণ্ডগ্রেনেডের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিস্তব্ধ হয়ে গেল ওটা। কিন্তু এরমধ্যেই যা হবার হয়ে গিয়েছে। গোটাপাঁচেক পেট ফুটো হয়ে

গেছে। গানার মোটামুটি অক্ষতই ছিল, একলাফে কাট পৌঁছে গেল ওর কাছে। প্রচণ্ডবেগে নেমে এল রাইফেলের বাঁটটা ওর মাথায়, এক সেকেণ্ডের মধ্যে রক্তমাংসের একটা পিণ্ড হয়ে গেল ওটা, একটা চোখ ছিটকে পড়ল বাইরে। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। অন্যান্যরা ততক্ষণে বাকিদের কচুকাটা করে ফেলেছে।

একটু বিশ্রাম করা যায় এখন। পাশেই কামানের সারি, তার পাশে বালতি ভরা পানি, কামানের নল ঠাণ্ডা করার জন্যে। তাতে কি, পানি হলেই হলো। চোঁ চোঁ করে আকণ্ঠ পান করলাম। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল সাথে সাথে।

কাঁটাতার কাটার দল পৌঁছে গেছে। কট্‌কট্‌ করে তারের বেড়া কেটে লম্বা একটা তক্তা ফেলে দিচ্ছে ওর ওপর দিয়ে। এক জায়গার কাজ শেষ হলেই ছুটছে অন্যখানে। উঠে দৌড় দিলাম, বেড়া পার হলেই সামনে ট্রেঞ্চে ঢোকার সরু মুখ। বাঁক ঘুরতেই দৈত্যের মত এক ফরাসী সৈনিকের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত নেমে গেল হাই-এর কুড়োল। কুড়োলটা টেনে বের করে হ্যাণ্ডগ্রেনেডের পিন খুলে ছুঁড়ে দিল ভেতরে। লাফ দিয়ে সরে এলাম বুক সমান উঁচু দেয়ালের আড়ালে। বন্ধ জায়গায় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ফাটল গ্রেনেডটা। ধোঁয়া সরে যেতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। খালি, কেউ নেই ওখানে। প্রত্যেকটা কোণে একটা করে হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে দিতে দিতে ছুটলাম আমরা। যখনই কোন সেলার চোখে পড়ল, একসাথে যতগুলো সম্ভব গ্রেনেড ছুঁড়লাম ওগুলোর ভেতরে। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল মাটি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সেলারগুলো। ধুলোর পাহাড় উঠল আকাশে।

রক্ত আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি। দলা দলা মাংস আর রক্তের ওপর দিয়ে ছোটার সময় মনে হলো পা পিছলে পড়ে যাব। আর, একবার পড়ে গেলে উঠতে পারব না কোনদিন। পড়ে থাকা শরীরগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেল প্যায়ের চাপে। হঠাৎ আমার পা-টা ভক্‌ করে ঢুকে গেল একজনের বুকের বিশাল গর্তের মধ্যে। গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

পাশেই দেখি পড়ে আছে একটা অফিসার্স ক্যাপ। ঝক্‌ঝক্‌ করছে, একটুও ময়লা লাগেনি ওতে।

যুদ্ধ আপাতত শেষ। ধারেকাছে কোন ফরাসীর চিহ্নমাত্র নেই। এখন আমাদের গোলা যতক্ষণ পড়ছে, তার ফাঁকে জান নিয়ে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাড়াতাড়ি অক্ষত সেলারগুলোতে ঢুকে পড়লাম। হাতের কাছে খাবার যা পেলাম দু'হাত ভর্তি করে নিলাম। অবশ্য কর্নড বীফ আর মাখনের দিকেই নজরটা বেশি।

বহাল-তবিয়তেই ফিরলাম জায়গামত। শত্রু আর আক্রমণ করেনি। উত্তেজনা কমতেই প্রচণ্ড অবসাদ এসে ভর করল শরীরে। ধপ্‌ করে শুয়ে পড়লাম যে যেখানে পারি। পুরো এক ঘণ্টার আগে একটা কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে পেটে দানাপানি না থাকলেও খাবার কথা মনেই হয়নি কারও। এতক্ষণ বিশ্রামের পর যেই মনটা শান্ত হয়েছে, অমনি টান পড়েছে পেটে। এতক্ষণ পরে নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

কর্ন আর বীফগুলোর সুনাম সারা ফ্রন্ট জুড়ে। শুধু এর জন্যেই মাঝে মাঝে আমরা ফরাসীদের আস্তানায় চোরা হামলা করতাম। এর কাছে আমাদের খাবার! ফুঃ, মুখে দিলে বমি আসে।

গুণে দেখি মোট পাঁচটা টিন পাওয়া গেছে: হাই জোগাড় করেছে পাতলা একটুকরো ফরাসী রুটি, এমনভাবে কোমরে গুজে রেখেছে সেটা যে মনে হচ্ছে ছোরা ঝুলিয়ে রেখেছে। ওটার একপাশে আবার একটু রক্তও লেগে আছে। অসুবিধে নেই, খাবার সময় ওটুকু ফেলে দিলেই হলো।

যাক, বহুদিন পর যথেষ্ট খাবার পাওয়া গেছে, তাও আবার এমন সুস্বাদু! জিভে জল এল সাথে সাথে। বাবা, খাবার হচ্ছে নিরাপদ একটা সেলারের মত, এও জীবন বাঁচায়।

জাদেন দেখি দু'বোতল কনিয়্যাক জোগাড় করে এনেছে। সাবাস, বেঁচে থাকো বাবা! দু'ঢোক মেরে দিয়ে পাশের জনের হাতে চালান করে দিলাম বোতলটা।

*

গা থেকে রোদের রঙ মুছে ফেলে সন্ধ্যা নামল চারপাশে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল। গর্তগুলো থেকে পাক খেতে খেতে অলসভঙ্গিতে ওপরে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। মনে হলো ভৌতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। শিরশির করে উঠল শরীরের মধ্যে। গর্তের কিনারায় পৌঁছেই চারপাশে গড়াতে শুরু করল শাদা কুয়াশা, আস্তে আস্তে সমস্ত ট্রেঞ্চ আর খানাখন্দগুলো ঢেকে ফেলল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে আছি রাইফেল হাতে। পাহারার ভার আমার ওপর। গায়ে আর বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। প্রচণ্ড অবসাদ আর হতাশা ঘিরে ধরেছে আমাকে। প্রত্যেকবারই আক্রমণের পর এরকম হয়, এ সময় একা একা থাকা যে কি কষ্টকর, যে জানে না তাকে বোঝানো যাবে না।

বসে থাকতে থাকতে কত এলোমেলো ভাবনা যে মাথায় এলো তার ঠিক নেই। টুকরো টুকরো সব ভাবনা। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেলাম আমার গ্রামে। গির্জার ঘণ্টা বাজছে, মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। গির্জার মাঠে দাঁড়িয়ে আছি, তাকিয়ে দেখছি সবার যাওয়া আসা। ফ্রকের ঝালর দুলিয়ে হেঁটে গেল একজন কিশোরী, আমার দিকে চোখ পড়তেই হাসল একটু, বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। আমার বয়স তো এখন বিশ বছর প্রায়, এটাই তো প্রেমে পড়ার সময়!

প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটল একটা। চমকে উঠলাম। এক লাফে ফিরে এলাম বাস্তবে। রাইফেলের ব্যারেলে হাত দিয়ে দেখি কুয়াশায় ভিজে উঠেছে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেললাম পানিটুকু।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেই আবার লাফিয়ে এল ভাবনাগুলো। চোখ বন্ধ করতেই চলে গেলাম নদীর ধারে। আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরেই নদীটা। নদীর ধারে পপলার গাছের সারি। আমাদের খুব প্রিয় জায়গা ওটা। পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছি আমরা, মাঝে মাঝে এ ওর গায়ে পানি ছিটাচ্ছি, হাসছি খুশিতে। কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নদী, বাতাসে পপলার পাতার ঝিরিঝিরি গান।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। এই যে সব এলোমেলো ভাবনা আসে মনে, সব কি শান্ত, কি সুন্দর। ফ্রন্টের মত জায়গায় এত শান্ত চিন্তা আসে কি করে ভেবে পাই না।

একের পর এক ছবি ফুটে উঠতে লাগল চোখের সামনে আর প্রচণ্ড এক বিষণ্ণতায় ভরে উঠল মন। ছবিগুলো এত শান্ত বলেই এত কষ্ট। ওখানেই তো যেতে চাই আমরা! ক্যাম্পে থাকার সময় আরও বেশি করে মনে পড়ে ওগুলো। আমাদের গানে, আমাদের কথাবার্তায় ফুটে ওঠে বাড়ি ফেরার আকৃতি। কিন্তু ফ্রন্টে থাকার সময় পরিষ্কার বুঝি ওগুলো শুধু কল্পনাই থাকবে, কোনদিন আর ফিরে পাব না সে দিনগুলো। মনে হয় বহুদূর দিগন্তে দেখছি ওদের, কিন্তু যতই এগিয়ে যাই, ততই সরে যায় ওরা।

আসলে আমরা মরে গেছি। সেই দিনগুলো আবার যদি ফিরেও পাই, ভেবেই পাই না কি করব তখন। কল্পনা করি মাঝে মাঝে, বাড়িতে ফিরে গেছি আবার। কিন্তু মেলাতে পারি না নিজেকে। মনে হয় একটা কিশোর থাকত ওখানে, যুদ্ধে গিয়েছিল সে। ওর জীবনের সব কথা বলে গেছে আমাকে। তারপর মরে গেছে ও। যাবার সময় ওর শরীরটা দিয়ে গেছে আমাকে।

জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে উঠল মনে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল একসময়।

বড় অসহায় মনে হলো নিজেকে। আমরা মনেপ্রাণে এখনও শিশু, কিন্তু অভিজ্ঞতায় পূর্ণবয়স্ক মানুষ। ভেসে যাচ্ছি কোথায়, কিচ্ছু জানি না। আমরা হারিয়ে গেছি, আমরা হারিয়ে গেছি!

টপ্ করে ঝরে পড়ল অশ্রুর প্রথম বিন্দুটা।

ঠাণ্ডায় হাত জমে গেছে, বরফ হয়ে গেছে শরীর। এই কুয়াশাটাই ঠাণ্ডা বরফ। আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে ভূতুড়ে কুয়াশা। লাশগুলো থেকে অবশিষ্ট যা ছিল সব শুষে নিয়ে এগিয়ে আসছে আরও। বাতাসে লাশের গন্ধ। সকালবেলাতেই দেখা যাবে কালচে জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে ফুলে ওঠা লাশ।

মাঝে মাঝেই হাউই ছোঁড়া হচ্ছে, শোঁ শোঁ শব্দে উঠে গিয়ে ফাটছে ওপরে। সারা ফ্রন্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর আলোয়। নিবে যেতেই আবার লাফিয়ে নামে অন্ধকার। তখন আরও অসহায় মনে হয় নিজেকে।

হঠাৎ শুনলাম ঝনঝন্ শব্দ। খাবার টিন ওগুলো। সাথে সাথে মোচড় দিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। এখন গরম খাবার আর কারও সঙ্গ যে আমার কতটা দরকার সে আমিই জানি। কিন্তু ডিউটি শেষ হতে আরও খানিকটা বাকি। কি আর করা, দাঁতে দাঁত চেপে পার করে দিলাম সময়টুকু।

বদলি গার্ড আসতেই ছুটলাম সেলারে। সুপ রান্না হয়েছে। আহ্, কি যে সুন্দর গন্ধ, চর্বি দিয়ে রান্না। জিভের জল গড়িয়ে পড়ে আর কি! তবু ধীরেসুস্থ্যে একটু একটু করে খেতে লাগলাম। খেতে খেতে খেয়াল করলাম অন্যরা আমার চেয়ে বেশ ভাল মুডে আছে। কারণটা হলো, ওদের একা একা থাকতে হয়নি আর গোলাবর্ষণও বন্ধ হয়ে গেছে।

দুঃস্বপ্নের মত ঘণ্টাগুলো আসতেই থাকে একের পর এক, দিনের পর দিন। এরমধ্যে আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণের শেষ নেই। যেন সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত শেষ হবে না এর। লাশের স্তূপ জমা হতে থাকে মাটির ওপরে, গর্তে, ট্রেঞ্চে, সবখানে। আহতদের মধ্যে যারা কাছাকাছি, তাদেরকে কোনরকমে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে আসি কিন্তু দূরে যারা, তাদের কাতরানি শোনা ছাড়া করার কিছু থাকে না।

একজনকে তো পুরো দুটো দিন একেবারে গরু খোঁজা করে খুঁজলাম। খুব সম্ভব ও উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, ঘুরতেও পারছিল না। তা না হলে ওকে খুঁজে না পাবার কোন কারণই নেই। কেউ যদি উপুড় হয়ে মাটির কাছে মুখ রেখে চিৎকার করতে থাকে, তখন কোনদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছে বের করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ও। এগুলো সেই আঘাত যা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারে।

'যতদূর বুঝেছি তাতে হয় ওর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে নয়তো নিতম্বের

হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে একেবারে,' বিষণ্ন গলায় মন্তব্য করল কাট। 'বুকে আঘাত পায়নি, এটা নিশ্চিত। নইলে এত চিৎকার করতে পারত না। আর অন্যরকমের আঘাত হলেও অন্তত হামাগুড়ি দিত, নড়াচড়া করত।'

চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে গেল ওর। চিৎকার শুনে কেঁপে ওঠে শরীর। অপার্থিব সেই চিৎকার, সবদিক থেকে ভেসে আসছে যেন।

প্রথম রাত্রে তিন তিনবার বেরোলাম আমরা, অবিশ্রান্ত গোলা-বৃষ্টিকে পরোয়া না করেই। চিৎকার শুনে যেদিকে ছুটে গেছি, পরমুহূর্তেই ঠিক উল্টোদিক থেকে ভেসে এসেছে শব্দটা।

সারারাত ধরে খুঁজলাম ওকে। ভোর হতেই ফিরে এলাম ট্রেঞ্চে। দিনের পুরো সময়টা ধরে দূরবীন দিয়ে সারা মাঠ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, যদি কোথাও নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

দ্বিতীয় দিনে ওর গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। না হবার কোন কারণই নেই। একে তো আহত, তারপর চিৎকার করতে করতে ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে এরমধ্যে।

আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার ঘোষণা করলেন, যে ওকে খুঁজে আনতে পারবে তাকে ছুটির সময় তিনদিন অতিরিক্ত ছুটি দেয়া হবে। নড়েচড়ে উঠল সবাই। তিনদিন অতিরিক্ত ছুটি তো চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার!

শেষ শক্তিটুকু খরচ করে খুঁজলাম। অবশ্য অতিরিক্ত ছুটির লোভ না থাকলেও খুঁজতাম ওকে। অসহ্য ওর চিৎকার, খেপে গিয়ে সবকিছু ভেঙেচুরে খানখান করতে ইচ্ছে করে একেক সময়।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে কাট আর ক্রপ বিকেলের দিকে খুঁজতে বেরোল ওকে। একটু পরেই ছুটতে ছুটতে ফিরল ওরা। লাভের মধ্যে ক্রপের কানের লতি হারানোর ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কাটল।

সেলার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কি বলছে ও। প্রথম প্রথম চিৎকার করত সাহায্যের জন্যে।

'ধারে কাছে কেউই কি নেই আমাকে বাঁচানোর জন্যে?' ওর এই

চিৎকার শুনে নিজের অক্ষমতায় মরে যেতে ইচ্ছে করত আমাদের।

দ্বিতীয় দিনে বিকার উঠল ওর। চিৎকার করে বউ আর ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগল। পরিষ্কার শুনতে পেলাম ডাকছে 'এলিস' বলে। ওর বউয়ের নাম নিশ্চয়।

আজকে শুধু কাঁদছে ও। সন্ধ্যা থেকে শুরু হলো গোঙানি। বাতাস বইছে আমাদের দিকে তাই পরিষ্কার ভেসে আসছে আওয়াজটা। সারারাত ধরে শুনলাম শব্দটা। সকালের দিকে হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ করে উঠল ও, তারপর থেমে গেল সব।

ভ্যাপসা গরম পড়ে দিনের বেলায়। লাশের স্তূপ জমে আছে মাঠের মধ্যে। কিছু কিছু বয়ে আনতে পেরেছি ভেতরে, বাকিরা পড়ে আছে খোলা আকাশের নিচে। আর এনেই বা করবটা কি, কিছুই তো করতে পারব না! তার চেয়ে থাকুক ওখানে। গোলার আঘাতেই কবর হোক ওদের।

লাশগুলোর পেট ফুলে উঠেছে বেলুনের মত। হিস্‌হিস্ করে গ্যাস বেরোচ্ছে আর পেটগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নীল আকাশ, কোথাও মেঘ নেই একটুও। সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠল চারপাশ। ভাপ বেরোনো শুরু করল মাটি থেকে। বয়ে আসা বাতাসে রক্তের গন্ধ গোলার গর্তের বিষাক্ত হাওয়ার সাথে মিশে অসুস্থ করে ফেলল আমাদের। বমি ঠেলে উঠল বেশ ক'জনের।

সন্ধ্যার পরপরই থেমে গেল গোলাবর্ষণ। অন্ধকারটা আরেকটু ঘন হয়ে আসতেই সব হুড়মুড় করে ছুটল ফ্রেঞ্চ ফ্লেয়ারের প্যারাশুটের কাপড় আর তামার রিং কুড়োতে। এই তামার রিং দিয়ে যে কি হবে তা ওরাই জানে। ভাবখানা এমন যে খুব দামী কিছু জমা করছে । কয়েকজন এত জমিয়েছে যে ওগুলো আর বয়ে নিতে হবে না, পিঠে তুললে ওর ওজনেই কাজ হয়ে যাবে।

হাই অবশ্য ভাল যুক্তি দেখিয়েছে রিংগুলো সংগ্রহ করার। 'ওগুলো আমি আমার ওকে দেব, গার্টার হিসেবে পরবে ও।'

'সাব্বাস,' হাঁটু চাপড়ে চিৎকার করে উঠল বাকি সবাই, 'তোমার তো বেরেন আছে হে!'

জাদেন আরেক কাঠি সরেস। লাফ দিয়ে উঠে সবচেয়ে বড় রিংটা বের করে একটা পা ঢোকাল ওর মধ্যে। ঢলঢল করছে দেখে একটা হাতও চালান করে দিল ওর ভেতরে।

'দেখ, হাই, তোর প্রেমিকার পা-খানা কি চমৎকার সাইজের, আর পায়ের ওপরে শরীরটা নিশ্চয়...,' হাসিতে কথা বন্ধ হয়ে গেল ওর। হাসি কিছুটা কমতেই শেষ করল কথাটা, 'পাক্কা সাড়ে তিন মণ।'

হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। হাই-এর ওদিকে খেয়ালই নেই। উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। মুখে মৃদু হাসি। নিশ্চয়ই 'ও'র কথা চিন্তা করছে।

প্যারাশুটের কাপড়গুলো কাজে লাগে আসলে। জাদেনের বর্ণনামত হাই-এর প্রেমিকার শরীর না হলে মোটামুটি তিনটে বা চারটে টুকরো দিয়ে একটা ব্লাউজ হয়ে যাবে। যাদের বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে আছে তারা ওগুলো বাড়িতে পাঠায়। আমি আর ক্রপ ওগুলো রুমাল হিসেবে ব্যবহার করি। বাড়িতে যারা ওগুলো পরে, তারা যদি জানত, কি বিপদ মাথায় নিয়ে কাপড়গুলো সংগ্রহ করা হয়, তাহলে এই কাপড়ের জামা পরাই ছেড়ে দিত হয়তো। আর জাদেন যেভাবে তামার রিঙ সংগ্রহ করে, জানলে স্রেফ হার্টফেল করত সবাই। ধারেকাছে থাকা তো দূরের কথা, ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে আমাদের। যে গোলাগুলো ফাটেনি, সেগুলোর গা থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তামার রিঙ খোলে ও। আর কেউ হলে ফাটতোই ওগুলো। জাদেনের ভাগ্যটা একটু বেশি ভাল মনে হয়।

একদিন সকালে দেখি দুটো প্রজাপতি উড়ছে আমাদের ট্রেঞ্চের সামনে। কী সুন্দর দেখতে, বাদামী ডানার ওপরে লাল লাল ফুটকি। সবকিছু ভুলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। মরতে এল নাকি ওরা এখানে! ধারেকাছে মাইলখানেকের মধ্যে তো কোন গাছই নেই, ফুল

তো দূরের কথা। এঁকেবেঁকে উড়তে উড়তে একটা খুলির দাঁতের ওপর বসল একটা প্রজাপতি। আরেকটা উড়ে উড়ে ঘুরতে লাগল ওটার চারপাশে। খানিক পরে দুটোই চলে গেল নতুন কিছুর খোঁজে।

যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে থাকলাম ওদের দিকে। চোখের আড়াল হতেই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। ওরা যতক্ষণ ছিল বড় ভাল লাগছিল।

মাঝে মাঝে পাখি ডাকে সকালে, খুব ভাল লাগে তখন। এখনও কয়েকটা লার্ক আছে ধারেকাছে। যুদ্ধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ওরা। গতবছরই দেখেছিলাম ওদেরকে বাসা বাঁধতে। এখন বেশ বড়সড়ো হয়ে উঠেছে।

রাত হলেই ট্রেঞ্চের সামনে ইঁদুরের উৎসব শুরু হয়ে যায়। মোটা মোটা সব ধাড়ি ইঁদুর। লাশের মাংস খেয়ে খেয়ে আরও মোটা হচ্ছে। দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারি ওদের দিকে। মাঝে মাঝে দু'একটা লেগেও যায়। ওতেই খুশিতে হৈ হৈ করে ওঠে সবাই।

রাত হলেই শত্রু লাইনের পেছনে শুরু হয় ট্রেন আর ট্রাকের ঘড়ঘড়ানি। কান ঝালাপালা হয়ে যায় শব্দে।

সারাদিন ধরে গোলাবর্ষণ হয় ধীরেসুস্থে। ভাবখানা যেন ওটুকু না হলে যুদ্ধ যে হচ্ছে সেটা যদি বোঝা না যায়? সেজন্যে দিনের বেলায় ট্রেঞ্চ বা সেলারের যা যা মেরামত করা দরকার, সেরে রাখি সব।

প্রায় প্রত্যেকদিনই আকাশ যুদ্ধ দেখি প্রাণ ভরে। যে দলের প্লেনই ঘায়েল হোক না কেন, জ্বলতে জ্বলতে পড়ছে দেখলে খুব মজা লাগে। তাছাড়া ওতে তো আর আমাদের সরাসরি কোন বিপদের আশঙ্কা নেই! কিন্তু প্লেগের মত ঘেন্না করি অবজারভেশন প্লেনগুলোকে। শয়তানের হাড্ডি ওগুলো। ঠিক ঠিক খবর দিয়ে দেয় কোথায় আছি আমরা। ওগুলো অদৃশ্য হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায় আমাদের ওপর। একদিন হঠাৎ করে এমন গোলাবর্ষণ শুরু হলো যে মুহূর্তের মধ্যে এগারোজন খতম হয়ে গেল আমাদের। এরমধ্যে পাঁচজন ছিল স্ট্রেচারবাহক। দু'জন তো একেবারে কিমা হয়ে গেল সাথে সাথে।

জাদেনের পরামর্শই মনে হলো কাজে লাগবে শেষ পর্যন্ত, দেয়াল থেকে ওদেরকে চামচ দিয়ে আঁচড়ে তুলে মাংসের টিনে ভর্তি করে তারপর কবর দিতে হবে। একজনের কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত নেই হয়ে গেল চোখের পলকে। ট্রেঞ্চের দেয়ালের ওপর ঝুঁকে ছিল, ওভাবেই রইল। হলদে মুখে সিগারেটটা জ্বলতেই থাকল। ঠোঁট পুড়িয়ে দিয়ে নিবল ওটা।

গোলাবর্ষণ থামলে কবর দিতে শুরু করলাম আমরা। ট্রেঞ্চে যারা মরেছে, তাদের কবর দিই গোলার গর্তে। এর মধ্যেই তিন থাক হয়ে গেছে ওখানে।

আবার শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ। সাথে সাথে চেপে বসল উৎকণ্ঠা আর দাঁতে দাঁত চেপে প্রতীক্ষার পালা।

আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ চলছে তো চলছেই, অবাস্তব, অর্থহীন লাগে এসব। কি হবে এ দিয়ে! অনেক তো জীবন হারিয়েছি, আর কত? মরছি দলে দলে, বেশির ভাগই নতুন রিক্রুট। মরছি যেমন, রিইনফোর্সমেন্টও আসছে তেমন। সব আনাড়ি, নাম লিখেই পাঠিয়ে দিয়েছে ফ্রন্টে, ওদের আদৌ কোন ট্রেনিং আছে কিনা না কে জানে। শুধু মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কিছু তত্ত্ব। ছোঃ, হাতাহাতি যুদ্ধের সময় তত্ত্ব! ফলে যা হবার তাই হচ্ছে, মরছে ওরা, ঝাঁকে ঝাঁকে, একেবারে মশামাছির মত।

মরবেই বা না কেন, দেখেছে হ্যাণ্ডগ্রেনেড কাকে বলে, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী যেটা, সেই আড়াল সম্পর্কে দেখার চোখ তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই ওদের। দেড় ফুটের চেয়ে নিচু কোন আড়ালই চোখে পড়ে না।

রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে যাদের পাচ্ছি, তাদের নিয়ে সুবিধার চেয়ে ঝামেলাই হচ্ছে বেশি। যুদ্ধের সময় একেবারে অসহায়। ট্রেঞ্চের যুদ্ধের জন্যে যা যা দরকার, অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান, কিচ্ছু নেই ওদের। বুঝতেই পারে না মাটির উঁচু নিচু, আড়াল আবডাল। গোলার আওয়াজ আলাদা করে চেনা, কোথায় পড়বে ওটা, কখন ফাটবে কিচ্ছু জানা নেই।

জানা থাকবেই বা কোত্থেকে, কে শিখিয়েছে ওদের যে জানবে? যার

জন্যে মরে ওরা, খুব সহজে। বহুদূরে যখন ভারি গোলার আওয়াজ কান পেতে শুনছে, তখন মৃত্যুদূত হালকা গোলার তীক্ষ্ণ শিষ ঢোকেই না ওদের কানে। যখন দরকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড়াল নেবার, তখন গাদাগাদি করে থাকে একসাথে। প্লেন থেকে মেশিনগান দিয়ে ঝাঁজরা করতে খুব সুবিধা হয় তখন শত্রুপক্ষের।

এই সব দুধের বাচ্চাদের যারা যুদ্ধে পাঠায় তারা কি মানুষ? বিবর্ণ শুকনো মুখ আর ভয়ে শক্ত করে মুঠি পাকানো হাত দেখলে মায়া হয়। এরপরেও ওরা যুদ্ধ করে। যুদ্ধের বীভৎসতা আর ভয়াবহতায় কাঁদতেও ভয় পায় ওরা। ক্ষতবিক্ষত শরীর, পিঠের সাথে লেপটে যাওয়া পেট, তাকানো যায় না ওদের দিকে। মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে করে নিচু স্বরে কাঁদে ওরা, কেউ তাকাচ্ছে ওদের দিকে বুঝতে পারলেই থেমে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছু শিশুর লাশ বোধহয় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের সাথে।

যেভাবে ওরা ছুটে যায়, যুদ্ধ করে আর মরে; দেখলে দলা পাকিয়ে ওঠে গলার কাছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সবক'টাকে ঘাড় ধরে ফেরত পাঠিয়ে দিই, চিৎকার করে বলি ওদের, 'শুধু শুধু মরতে এসে কি লাভ, কার লাভ?'

কোট, বুট, ট্রাউজার যা পরেছে ওরা, সব ঢলঢল করে ওদের শরীরে। না করেই বা কি করবে, এত ছোট মাপের পোশাক তো সেনাবাহিনীর জন্যে বানানো হয় না কখনও।

হঠাৎ একদিন গ্যাস আক্রমণ করল ফরাসীরা। চমৎকার ফল পেল। মরল নতুন রিক্রুটগুলো, দলে দলে। ওরা জানতোই না কি করতে হয় গ্যাস আক্রমণের সময়। একটা সেলারে গিয়ে দেখি, সেলার ভর্তি নতুন রিক্রুট। সব মড়া, কালচে ঠোঁট, নীল হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। কয়েকজন ছিল গোলার গর্তে, ওপরে দেখেছে গ্যাস মাস্ক ছাড়া লোকজন, ব্যস্, খুলে ফেলেছে মাস্ক। গর্তের মধ্যে যে গ্যাস বহুক্ষণ থেকে যায়, কে শিখিয়েছে ওদের? মরেছে বেশির ভাগ, যে ক'টা বেঁচে আছে, মরে গেলেই বেঁচে যায় ওরা। কাশতে কাশতে ফুসফুসের পোড়া টুকরো বের

করছে মুখ দিয়ে।

একটা আক্রমণ শেষ করেই হুড়মুড় করে ঢুকলাম সেলারে। ঢুকেই দেখি হিমেলস্টোস, একই সেলারে ঢুকেছি দু'জন। ধপ্ করে শুয়ে পড়লাম মেঝেতে। মড়ার মত পড়ে থাকলাম খানিকক্ষণ, তারপর আক্রমণের সঙ্কেত পেতেই ছুটলাম বাইরে। অন্য কিছু ভাবার মত অবস্থা নয় তখন, তবুও হঠাৎ করে মনে পড়ল হিমেলস্টোসের কথা। ফিরলাম আবার সেলারে। দেখি সেলারের এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে ব্যাটা। হাতে একটুখানি আঁচড় লেগেছে, আমাকে দেখে এমন কাতর ভঙ্গি করল যেন পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর। প্যারেড করানোর সময় যত হম্বিতম্বি ব্যাটার, যুদ্ধে এসে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে প্রায়। চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়, বাচ্চা ছেলেরা পর্যন্ত মরতে পারছে, আর এ ব্যাটা বুড়ো-ধাড়ি লুকিয়ে আছে সেলারে।

'বেরোও,' চিৎকার করে বললাম আমি।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে আরও গুটিসুটি মেরে দেয়ালের দিকে সরে গেল ও। দেখি থর থর করে ঠোঁট কাঁপছে, গোঁফজোড়া ঝুলে পড়েছে একেবারে। দেখে রাগে জ্ঞান হারাবার দশা হলো আমার। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'বেরোও।'

পা দুটো বুকের কাছে জড়ো করে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল হিমেলস্টোস। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। ঠিক মনে হলো খেঁকি কুকুর একটা।

খপ্ করে হাত টেনে ধরলাম, শুরু হয়ে গেল ঘেউ ঘেউ, সেইসাথে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ও। ঘাড় চেপে ধরে বস্তার মত ঝাঁকুনি লাগালাম, 'হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা, ওঠ্, ওঠ্ শুয়োর।' পাঁজরের মধ্যে কষে লাথি লাগালাম একটা। কেঁউ করে উঠল ও। চোখমুখ ঘোলাটে হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

চুলের মুঠি ধরে লাথি মেরে কোনরকমে বাইরে বেরোনোর দরজার

কাছে নিয়ে এলাম ওকে।

দরজার কাছে আসতেই দেখি আমাদের আক্রমণ শুরু হয়েছে এবার। একদল ছুটছে, সামনে একজন লেফটেন্যান্ট। আমাদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'শিগ্‌গির এসো, এগোও সামনে।'

হিমেলস্টোস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। আমার এত লাথিতেও যে কাজ হয়নি, তাই হলো এখন। ছুটল হুকুম তামিল করতে। উপরওয়ালার হুকুমের এত মাহাত্ম্য!

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম হিমেলস্টোসকে, এখন সে প্যারেড গ্রাউণ্ডের সেই হিমেলস্টোস। এত জোরে ছুটছে যে লেফটেন্যান্টকেও অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। ছুটলাম লেফটেন্যান্টের সাথে সাথে। খানিক পরেই বোমা, মাইন, রক্ত, মৃত্যু, আগুন, কাঁটাতারের বেড়া এসব ছাড়া আর কোনকিছুর অস্তিত্বই রইল না আমাদের কাছে।

গায়ে-মুখে ময়লার চর পড়েছে, চিমটি দিলে উঠে আসবে, এমন অবস্থা। জানি না বেঁচে আছি না মরে গেছি। বিশ্রামের জন্যে যখন বসি, মনে হয় জীবনে আর দাঁড়াতে পারব না। তবুও আক্রমণ এলেই আবার ছুটতে হয়, লোকজনকে লাথি মেরে জাগাতে হয় ঝিমুনি থেকে। বুলেট, আগুনে চোখ ঝলসে গেছে আমাদের, হাতের চামড়া বলতে কিছু নেই, কনুইয়ে দগদগে ঘা, হাঁটু ফেটে রক্ত ঝরছে। আমরা কি মানুষ না জানোয়ার? ভাবতে অবাক লাগে, বেঁচে আছি কি করে!

কতদিন হলো আছি এখানে হিসেবও করতে পারি না। মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেছে সব। কতদিন হবে? এক সপ্তাহ, এক মাস নাকি এক বছর? অথবা কয়েকটা দিন মাত্র! ঘণ্টা মিনিট দিয়ে আমাদের দিন হয় না, আমাদের দিন হয় মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে, আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে।

ছুটছি, গুলি ছুঁড়ছি, গ্রেনেড ছুঁড়ছি, মারছি, মরছি, চলছে তো চলছেই। শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, কিছু ভাবারও ক্ষমতা নেই, শুধু জানি বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু অবাক হয়ে যাই, এর মধ্যে বেঁচে আছি কি করে! মৃত্যুকে আর কতবার ফাঁকি দিতে পারব?

তবে এরমধ্যেও অন্যদের কথা ভাবি। ওরা তো আমাদের চেয়েও অসহায়, আমাদের চেয়েও দুর্বল। একেবারে শিশু ওরা। আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন দেবতা আমরা। নইলে এর মধ্যে বেঁচে ফিরে আসি কি করে?

ঘন্টাখানেক অবসর পেলেই শেখাই ওদের, যা পারি। 'ওই যে আসছে কাঁপতে কাঁপতে, ওটা মর্টার। মাথা নিচু করলেই ওপর দিয়ে চলে যাবে ওটা। আর যদি সোজাসুজি আসে, খিঁচে দৌড় দেবে। খানিকটা সময় পাবে ওর গোলা থেকে সরে যাবার জন্যে। আর ওই যে মোটা আওয়াজ, ওটা ভারি গোলার। কান সজাগ করো, না হলে হালকা গোলার শিষের আওয়াজ আলাদা করে চিনতে পারবে না। এটাই কিন্তু সবচেয়ে জরুরী। হালকা গোলা ভারি গোলার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর, যদি না জানো কোথায় পড়ছে ওটা।'

ওদেরকে শেখাই, বিমান আক্রমণ হলে কি করে আড়াল নিতে হয়, লেজ গুটিয়ে পালানোর সময়ও কি করে আহত সৈনিককে বয়ে আনতে হয়, কেমন করে হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়লে মাটিতে পড়ার আধা সেকেণ্ড আগে ফাটবে ওটা, গোলা ফাটার আগের মুহূর্তে কি করে গর্তে লাফিয়ে পড়তে হয়।

'দেখো, যখন হাতভর্তি হ্যাণ্ডগ্রেনেড থাকে, তখন এভাবে ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করতে হয়।'

'ওদের গোলার ফিউজ লেংথ আমাদের গোলার চেয়ে আলাদা। ভাল করে খেয়াল করো গোলা ফাটার শব্দ, স্পষ্ট বুঝতে পারবে।'

'গ্যাস শেলের শব্দ হচ্ছে এরকম,' কাট মুখ দিয়ে শব্দটা করে দেখিয়ে দিল, 'গ্যাস বোমা পড়ার সাথে সাথে কি করবে, বলছি শোনো।'

নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতে থাকল কাট। গভীর মনোযোগের সাথে শুনল ওরা। সব সময়ই তাই করে। কিন্তু হলে কি হবে, যুদ্ধ যুদ্ধই। থিওরি নয়, বাস্তবই আসল এখানে। যখন যুদ্ধ আসে তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে, কোথায় যায় এসব শিক্ষা, গোলমালে সব গুলে খেয়ে বসে থাকে ওরা। ফলে মরেও তেমনি।

একটা আক্রমণের পর বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় ফিরল একটা দল। সাথে হাই। বিবর্ণ মুখ। চমকে উঠলাম। দেখি, জামা রক্তে-কাদায় মাখামাখি। পিঠে এত বড় একটা গর্ত যে ভেতরে ফুসফুসের নড়াচড়া পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগেও অনেককে দেখেছি এ অবস্থায়। দেখেই বুঝলাম, ভাল না ক্ষতটা। কিছু বলতে পারলাম না ওকে। পাছে কিছু বুঝে ফেলে তাই কত কষ্টে যে স্বাভাবিক থাকলাম সে আমিই জানি। শুধু ওর হাতটা চেপে ধরলাম। কি বুঝল জানি না, ওই যন্ত্রণার মধ্যেও ম্লানভাবে একটু হাসল ও। বলল, 'চললাম, পল।' চলে গেল ও, যন্ত্রণায় হাত কামড়াতে কামড়াতে।

যুদ্ধে এ তো স্বাভাবিক। খুলি উড়ে গেছে, তবুও দেখেছি বেঁচে আছে মানুষ; হয়তো দুটো পা-ই কাটা গেছে, তবু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এক ল্যান্স কর্পোরাল শুধু হাতের ওপর ভর দিয়ে দেড় মাইল রাস্তা ঘষটাতে ঘষটাতে এসেছে, হাঁটু চুরমার হয়ে গিয়েছিল তার। একজনের পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, দু'হাত দিয়ে কোনরকমে চেপে ধরে ছুটে গেছে হাসপাতালে। বাঁচার জন্যে এত আকুতি মানুষের!

হাসপাতালে গেলে বিশ্বাসই করা যায় না এরাও মানুষ। মুখ নেই, চোয়াল নেই, হাঁ নেই, বীভৎস দৃশ্য; তাকিয়ে দেখা যায় না ওসব। তবুও বেঁচে আছে ওরা। বাঁচার এত ইচ্ছে মানুষের। একজনের হাতের শিরা কেটে গিয়েছিল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছিল পুরো দুই ঘণ্টা, রক্ত পড়ে যাতে মারা না যায়।

ধীরে ধীরে ম্লান আলো ছড়িয়ে সূর্য ডোবে, রাত আসে ভয়াল অন্ধকার নিয়ে, গর্জে ওঠে কামান, জীবনকে সরিয়ে মৃত্যু এসে জায়গা নেয় সেখানে। তবুও পৃথিবী আছে, আমরা আছি। শত্রুর কাছ থেকে সামান্য কয়েকশো গজ ভূমি তো কেড়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু এর প্রতিটি ইঞ্চিতেই পড়ে আছে মৃতদেহ, এ মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় ঝরে গেছে মানুষের সুকুমার হৃদয়ানুভূতি।

*

অবশেষে বিশ্রামের পালা এসেছে আমাদের। কী যে ভাল লাগছে তা বলার নয়। হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম লরিতে। বোঝাই হয়ে যেতেই ছেড়ে দিল লরি। খানাখন্দে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চললাম আমরা। দাঁড়িয়ে আছি লরিতে, এত পরিশ্রান্ত যে হাঁটু ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে। মাঝে মাঝে সামনের পাহারাদার দু'জন চিৎকার করে উঠছে, 'তার'। অমনি হাঁটু ভাঁজ করে মাথা নিচু করে ফেলছি সবাই।

এলোমেলো কত ভাবনা যে খেলে যাচ্ছে মনে। কবে এসেছিলাম আমরা? ঠিক, যখন এসেছিলাম, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, গাছে গাছে সবুজ পাতা। আর এখন শরৎ, ধূসর পিচ্ছিল রাত।

হঠাৎ করে থেমে গেল লরিটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম এ ওর ঘাড়ে। জেগে উঠলাম তন্দ্রা থেকে। এসে গেছি।

লাফিয়ে নামার শক্তি নেই, কোনরকমে ঝুলে ঝুলে নামলাম মাটিতে। অন্ধকার, তার মধ্যে ভূতের মত নড়াচড়া করছে সবাই, প্রত্যেকে জমা হয়েছে লরির দু'পাশে।

নামা শেষ হতেই দু'পাশ থেকে দু'জন ব্রিগেড আর ব্যাটালিয়নের নাম ধরে ডাকা শুরু করল। প্রতিটা ডাকের সাথে সাথে একদল করে আলাদা হয়ে যেতে লাগল। নোংরা, ক্লান্ত বিধ্বস্ত একদল মানুষ। অন্ধকারে মনে হলো ভাগাড়ের ময়লার স্তূপ যেন একটু একটু করে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এত অল্প সৈন্য একেকটা ব্রিগেডে, একেকটা রেজিমেন্টে? আতঙ্ক এসে ভর করল সবার মনে।

হঠাৎ কানে গেল, আমাদের কোম্পানির নাম ডাকা হচ্ছে। আরে, ও তো আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডারের গলা। সেও এসেছে তাহলে আমাদের সাথে? অন্ধকারের মধ্যেই লক্ষ করলাম, একটা হাত পিংয়ে ঝোলানো। এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। কাছে যেতেই দেখি কাট আর ক্রপও দাঁড়িয়ে আছে পাশে। খুশি হয়ে উঠলাম। ওরাও। গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজন, দেখতে লাগলাম বাকিদের।

কমাণ্ডার আমাদের কোম্পানির নম্বর বার বার ডাকছে, 'দু'নম্বর

কোম্পানির আর কেউ?'

কেউ সাড়া দিল না। দেবে কি করে, হাসপাতালে আর গোলার গর্তে যারা পড়ে আছে, তারা তো আর ডাক শুনতে পাচ্ছে না।

শেষবারের মত চেঁচিয়ে উঠল কমাণ্ডার, 'দু'নম্বর কোম্প্যানির আর কেউ?'

কোন উত্তর এল না। শান্ত গলায় বলল কমাণ্ডার, 'দু'নম্বর কোম্পানি, এ-ই সব?'

তবু উত্তর দিল না কেউ। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শুকনো গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, 'এ-ই সব?'

সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পরে কমাণ্ডার বলল, 'নম্বর।'

আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে আসছে অন্ধকার। দূরের গাছপালাগুলো দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত।

শরতের ভোর। খোলা জায়গায় ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, 'এক'। চলতে থাকল 'দুই, তিন...।' বত্রিশে এসে থেমে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। কমাণ্ডার ডাকল, 'আর কেউ?' উত্তর দিল না কেউ। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা স্রোত থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল শরীরটাকে। গ্রীষ্মে যখন এসেছিলাম তখন ছিলাম দেড়শো জন, দেড়শোটা তরতাজা প্রাণ, এখন বত্রিশ জন!

ধরা গলায় থেমে থেমে কোনরকমে কমাণ্ডার বলল, 'লাইনে দাঁড়াও, আস্তে আস্তে সামনে এগোও।'

আরও আলো ফুটে উঠেছে আকাশে। ঘাসের ডগায় জমে আছে শিশির বিন্দু। বাতাসে ভেজা ভেজা গন্ধ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। তারই মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছোট্ট একটা লাইন, বত্রিশজন মানুষের।

সাত

ক্যাম্প থেকে আরও পেছনে নিয়ে এসেছে আমাদের। এটা একটা ফিল্ড ডিপো। আমাদের কোম্পানিকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে। শ'খানেকের বেশি লোক লাগবে আমাদের কোম্পানির জন্যে।

আপাতত আমাদের হাতে কোন কাজ নেই। খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক। দিনকয়েক পরেই হিমেলস্টোস এল আমাদের কাছে। কোথায় গেছে তার সেই চোটপাট, ভিজে বেড়াল এখন একেবারে। আমাদেরকে ভজানোর তালে আছে। আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই তাতে, কারণ আমি তো দেখেছি আহত হাইকে ও কিভাবে বয়ে এনেছিল। তাছাড়া খাবারের এই টানাটানির মধ্যেও ও আমাদের জন্যে যথেষ্ট করে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সাথে ভাব হয়ে গেল ওর, শুধু জাদেন ছাড়া। বেচারা বোধহয় এত তাড়াতাড়ি হিমেলস্টোসের আগের ব্যবহারগুলো ভুলতে চায় না। কিন্তু হিমেলস্টোসও ঘুঘু লোক। জানে, কোন্ দেবতা কোন্ ফুলে সন্তুষ্ট।

একদিন সবাই বসে আছি, হিমেলস্টোস এসে বসল আমাদের পাশে। একথা ওকথার পরে বলল, 'রান্নাঘরের সার্জেন্ট তো ছুটিতে গিয়েছে, তা আমিই ওর চার্জটা নিলাম। কেমন হলো বলো তো?'

জাদেনের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখমুখ চকচক করে উঠেছে পেটুক সোনার। বলল, 'ধুৎ, মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে কথা কেন হবে, এই দেখো, দু'পাউণ্ড চিনি আর আধা পাউণ্ড মাখন, নিতে পারো তোমরা।'

ব্যস, হয়ে গেল জাদেনের। পারলে এখন সারাক্ষণ হিমেলস্টোসের পায়ে পায়ে থাকে।

আরও একটা সুখবর দিল হিমেলস্টোস, আমাদেরকে আগামী কয়েকদিনের জন্যে রান্নাঘরের কাজে লাগানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও। সাবাস, এই না হলে অফিসার!

ব্যস, আর কি চাই? পেটপুরে খাওয়া আর প্রচুর বিশ্রাম, এ দুটো পেলে একজন সৈনিকের আর কি চাই। বছরকয়েক আগে হলেও ঘৃণা করতাম এটা। এই কি জীবন? কিন্তু এখন এটুকু পেলেই আমরা খুশি। কি এখানে, কি ফ্রন্টলাইনে।

এই অভ্যাসের জন্যে কত তাড়াতাড়ি আমরা দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতে পারি। কালকেই তো ছিলাম নরকে, আজকেই আবার খাচ্ছি-দাচ্ছি ফুর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আবার কালকেই হয়তো যেতে হবে সেই নরকে। আসলে ভুলি না কিছুই। কিন্তু যতদিন যুদ্ধের মাঠে আছি, বর্তমানই সব। যা ঘটে গেছে, ও নিয়ে মাথা ঘামাই না আর। টুপ করে ডুবিয়ে দিই মনের গহীনে। ওসব স্মৃতি এত দুঃখের, এত কষ্টের যে ওগুলো মনে করলে বহু আগেই মরে যেতাম। এই সত্যকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি আমরা। ভয়কে ভুলে থাকলেই হলো, কিন্তু ভয়ের কথা ভাবলেই মারা পড়ব একেবারে।

ফ্রন্টে গেলেই আমরা পশু হয়ে যাই। এছাড়া নিজেকে বাঁচানোর তো অন্য কোন উপায় নেই। আবার ফিরে এলেই ধপাস করে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেই, নয়তো ঘুরে-ফিরে বেড়াই এদিক ওদিক। সোজা কথা বাঁচতে চাই যে কোন মূল্যে। সুতরাং ওসব স্মৃতি নিয়ে ভাববার মত বিলাসিতা এই ফ্রন্টে শোভা পায় না। যুদ্ধ শেষে যদি বেঁচে থাকি, তখন ও নিয়ে অনেক ভাবা যাবে। কেমারিখ মারা গেছে, হাই মারা গেছে, ক্র্যামার নেই, ম্যাক্স নেই, মেয়ার, হ্যামারলিং কেউ নেই, মার্টিনের দুটো পা-ই নেই, আরও একশো কুড়িজন হাসপাতালে পড়ে আছে, কিন্তু ও নিয়ে তো আমাদের ভাবলে চলে না। রূঢ় হলেও কথাটা সত্যি। আমরা বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাই। যদি ওরা আবার ফিরে আসত, কী যে

খুশি হতাম তা বলার নয়। মৃত্যুযন্ত্রণা যে কত ভয়ঙ্কর, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তবু ওদেরকে ফিরে পাবার জন্যে যদি সে যন্ত্রণাও বরণ করতে হত, তা-ও করতাম।

কিন্তু ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না, এটাই সত্যি। আর আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে, কে জানে। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি, পেটপুরে খাই-দাই ফুর্তি করি, ঘুরে বেড়াই। একটা মুহূর্তও যেন অপচয় না হয়। জীবন বড় অল্প সময়ের।

ফ্রন্ট থেকে ফিরলেই হাসি ঠাট্টা শুরু হয়ে যায় আমাদের। এছাড়া আসলে মন থেকে বীভৎস স্মৃতিগুলো তাড়াবার আর কোন উপায় দেখি না। সবকিছু নিয়ে হাসিঠাট্টা করি আমরা, কেউ মারা গেলে বলি, 'ও ইন্তেকাল ফরমাইয়াছে।'

যুদ্ধের খবরে লেখে, সৈনিকেরা খুব শান্তিতে আছে, খুব হাসিখুশি। ফ্রন্টে যাবার আগের মুহূর্তে তারা নাচেগানে মেতে ওঠে। পিত্ত জ্বলে যায় এসব দেখলে। নাচেগানে যে মেতে উঠি, সে কি আর খুশির জন্যে? ও-তো দুঃখকে ভুলে থাকার জন্যে, নয়তো কবেই পাগল হয়ে যেতাম। আর এর পরেও তো মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

কিন্তু দুঃখকে ভুলতে চাইলেই কি আর সবটুকু ভোলা যায়? ঠিক জানি, যতদিন যুদ্ধে আছি, ওগুলো ঘুমিয়ে থাকবে ঝর্ণার নিচের নুড়ির মত। যুদ্ধ শেষ হলেই জেগে উঠবে ওরা। তখন জীবনের সব হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে হবে ওদের সাথে।

এই দিন, এই সপ্তাহ, এই বছরগুলো সব ফিরে আসবে একদিন। আমাদের মরে যাওয়া কমরেডরা সবাই উঠে দাঁড়াবে, গায়ে গা ছুঁইয়ে মার্চ করবে আমাদের সাথে। যুদ্ধ থেমে যাবে, সুন্দর উজ্জ্বল দিন থাকবে, আশা থাকবে, আনন্দ থাকবে, ভালবাসা থাকবে। ফ্রন্টের স্মৃতি পড়ে রইবে পেছনে, অনেক অনেক দূরে। দল বেঁধে মার্চ করে স্থির একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব সবাই। কিন্তু সে কার দিকে, কিসের দিকে?

*

একদিন আর্দালি-রুমে ডাক পড়ল আমার। দুরুদুরু বক্ষে গেলাম ওখানে, না জানি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। যেতেই কোম্পানি কমাণ্ডার একটা ছুটির পাস আরেকটা যাতায়াত পাস এগিয়ে দিল আমার দিকে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, বাঁচা গেল, আমি ভেবেছিলাম কি-না কি। ছুটির পাসের দিকে তাকালাম। সতেরো দিনের ছুটি, তার মধ্যে তিনদিন আবার যাতায়াতের জন্যে। তারমানে আসল ছুটি চোদ্দ দিন। একটু কম হয়ে গেল না?

'আচ্ছা, স্যার, যাতায়াতের জন্যে পাঁচদিন দেয়া যায় না?'

'এখনও দেখোনি তাহলে?' বার্টিঙ্ক হেসে আমার হাত থেকে পাসটা নিয়ে বলল, 'ছুটি শেষ হলেই ফ্রন্টে আসতে হচ্ছে না তোমার। ছুটি কাটিয়ে ট্রেনিং সেন্টারে রিপোর্ট করতে হবে তোমাকে।'

ওখান থেকে ফিরতেই ঘিরে ধরল সব, 'কি ব্যাপার, কি হলো ওখানে?'

বললাম সব, শুনে হৈ হৈ করে উঠল সবাই, 'খুব মজা হবে তো তোর!'

কাট বুদ্ধি দিল, 'শোনো, ওসব ক্যাম্প-ট্যাম্পেই একটা কাজ জোগাড় করে ফেলো। চোখ-কান খোলা রাখলেই আর ফ্রন্টে আসতে হবে না তোমাকে।'

বাড়ি যাব, কতদিন ধরে স্বপ্ন দেখছি বাড়ি যাব, সেই স্বপ্ন আজকে সত্যি হতে চলেছে। আমার তো খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু কেন জানি না, আনন্দের সাথে একটা বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মনটা। ভালই তো ছিলাম এখানে। সবার সাথে আরও সপ্তাহখানেক থাকতে পারলে আরও ভাল লাগত হয়তো।

ক্যান্টিনে গেলাম সন্ধ্যার পরে। আজকে সবাইকে খাওয়ানোর ভার আমার ওপর। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বসলাম। একমনে গ্লাস থেকে মুখে ঢেলে দিচ্ছি পানীয়। আস্তে আস্তে বেশ নেশা ধরে এল। মনটা আরও বিষণ্ন হয়ে গেল আমার। ওদেরকে ছয় সপ্তাহ দেখব না? আমি

তো একটা দিন নিরাপদেই থাকব, কিন্তু ওরা? এরমধ্যে তো কতকিছুই ঘটে যেতে পারে। আমি ফিরে এসে কি ওদের সবাইকে আবার এমন করে পাব? হাই আর কেমারিখ তো চলেই গেছে, এবারে কার পালা?

কেউ কথা বলছি না। আমার বিষণ্ণতা সবার মধ্যেই সংক্রমিত হয়ে পড়েছে। চুপচাপ গ্লাসগুলো ভর্তি করে নিচ্ছি বারবার।

প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আমার পাশে বসে আছে ক্রপ, সিগারেট টানছে একমনে, হাসিখুশি সারাক্ষণ। সেই স্কুল থেকে একসাথে আছি আমরা। উল্টোদিকে বসে আছে কাট, একটু কুঁজো হয়ে, ওর শান্তস্বরের কথাগুলো বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল কানে। ওর পাশে মুলার, দাঁতগুলো সারাক্ষণ বেরিয়ে থাকে বাইরে আর হাসার সময় প্রচণ্ড আওয়াজ করে মুখ দিয়ে। জাদেন তাকিয়ে আছে ইঁদুরের মত কুতকুতে চোখে। লিয়ার একমনে দাড়িতে আঙুল বুলোচ্ছে। দাড়ি গজিয়ে চেহারাটা করে ফেলেছে চল্লিশ বছরের বুড়োর মত।

মাথার ওপরে সিগারেটের ঘন ধোঁয়ার মেঘ জমেছে। তামাক সিগারেট না থাকলে একজন সৈনিকের অবস্থা যে কি হত, ভেবেই পাই না। ক্যান্টিন হলো তার আড্ডাখানা, বিয়ার শুধু পানীয় নয়, তার কাছে এটা এর চেয়েও অনেক অনেক বেশি কিছু।

অবিরাম সিগারেট টেনে যাচ্ছি সবাই। পাগুলো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে থুথু ফেলছি এদিক ওদিক। কোন মানে হয় না এসবের, কিন্তু কাল সকালে যে চলে যাচ্ছে, তার কাছে এর মূল্য যে কতখানি তা সে-ই জানে।

বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। বাতাসে ভেসে চলে গেল ধোঁয়ার মেঘ। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ঝকঝকে চাঁদ। একটা পাখি ডেকে উঠল কোথাও।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। ওরা সবাই মিলে আমার মাথার উকুন মেরে দিল যতটা পারে। তারপর রওনা হলাম স্টেশনের দিকে। ক্রপ আর কাট চলল সাথে সাথে।

স্টেশনে পৌঁছে শুনি, ট্রেন লেট হবে ঘণ্টাকয়েক। কাট আর ক্রপের

ডিউটি আছে, ওদের চলে যেতে হবে।

বিদায় নিলাম ওদের কাছ থেকে, 'আবার দেখা হবে, ভাই।'

'দেখা হবে।'

মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই হবে তো?

ওরা চলে গেল, যেতে যেতে হাত নাড়ল দু'জনেই। আমিও উত্তর দিলাম হাত নেড়ে। যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল ওদের মূর্তি দুটো। তবু ওদের আলাদা করে চিনতে পারলাম। ওদের প্রত্যেকের প্রতিটা ভঙ্গি আমার জানা, দূরত্ব যতই হোক না কেন, ওদেরকে চিনতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।

এক সময় মিলিয়ে গেল ওরা। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল একটা। মালপত্রের ওপর বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ট্রেনের জন্যে। হঠাৎ করে প্রচণ্ড বিষণ্ণতা গ্রাস করল আমাকে। আর ভাল লাগছে না, এখন যেতে পারলেই বাঁচি।

কত স্টেশনে শুয়ে, ঘুমিয়ে, কত ক্যান্টিনের জানালায় লাইন দিয়ে, কত বেঞ্চে বসে হেলান দিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি, যেখান থেকে পরিচিত হয়ে উঠছে বাইরের দৃশ্যগুলো। ট্রেন ছুটছে তো ছুটছেই। ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে বাড়িঘর, গাছপালা। শাদা চুনকাম করা একটা বাড়ি, মাথাটা গির্জার মত চোখা হয়ে উঠে গেছে ওপরে, সূর্যের সোনা রংয়ের আলোয় জ্বলছে মুক্তোর মত।

এক একটা স্টেশন পার হয়ে যাই আর বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে। সব নামই যে আমার চেনা। প্রতিটা নামের সাথে সাথে আমার সোনালী কৈশোর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের মধ্যে। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে কি যেন। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, খেত-খামার পার হয়ে যায় চোখের সামনে। ওই যে, বহুদূরে নীল আকাশের গায়ে কালো একটা ছবি, একজন মানুষ লাঙল ঠেলছে, দিগন্তের গায়ে কালো একটা সারি, একদল মানুষ চলছে বোঝা নিয়ে। ওই যে বাড়িটা, ওটার পাশে দুটো ছেলেকে মারামারি

করতে দেখেছিলাম যাবার সময়, পরিষ্কার মনে আছে ছবিটা। পাশের গাছ থেকে সুন্দর লাল হলুদে মেশানো একটা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গিয়েছিল তখন। তাড়াতাড়ি তাকালাম ভাল করে গাছটার দিকে, আবার যদি পাখিটাকে দেখতে পাই।

দূরে উঁচু একটা বাঁধ, বাঁধ থেকে রাস্তাটা নেমে রেললাইন পার হয়ে গিয়েছে আড়াআড়িভাবে। লোকজন দাঁড়িয়ে আছে কখন ট্রেনটা পার হয়ে যাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে বাঁধের ওপরে। ট্রেন দেখতে পেয়েই ছুটল কয়েকজন, চিৎকার করে কি যেন বলল, ট্রেনের আওয়াজে কানে গেল না কিছুই। ট্রেনটা পার হয়ে যেতেই আবার খেলায় মন দিল ওরা।

বিকেল এখন, চারদিকে সোনা রংয়ের আলোর ছড়াছড়ি। অপূর্ব সুন্দর লাগছে গাছপালা, বাড়িঘর, চক্‌চক্ করছে সবকিছু। দু'হাতে জানালার ফ্রেম আঁকড়ে ধরে আছি। বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট! অসহ্য রকমের শান্ত সব। লরির ঘড়ঘড়ানি নেই, গোলার গর্জন নেই, রক্ত-বারুদের গন্ধ নেই। এই শান্ত পরিবেশ, এ যে আমার কত চেনা, অথচ কত দূরের। ট্রেনটা যদি থেমে থাকত তাহলে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠতাম।

ট্রেন চলছে, দুলছি আমি, মন দুলছে, দুলছে সবকিছু। চোখ ভারি হয়ে আসে, চোখ ভিজে যায়। জানালার ফ্রেম চেপে ধরি আরও জোরে।

দূরে, পাহাড়ের কোমল নীল রঙ ফুটে ওঠে। দেখেই চিনতে পারি, ওটা ডলবেনবার্গ। বনের শেষ প্রান্ত থেকে খাড়া উঠে গেছে খাঁজ কাটা চিরুনির মত। ওটার পেছনে শহর আছে একটা।

সূর্য হেলে পড়েছে আরও পশ্চিমে। সারা পৃথিবীর ওপর লাল রং ঢেলে দিয়েছে কে যেন। সবকিছু লালচে আর চকচকে আলোয় ধোয়া।

একটা বাঁক ঘুরল ট্রেনটা; তারপর আরেকটা। দূরে পপলার গাছের লম্বা একটা সারি। যতই ট্রেনটা এগোতে থাকল, কাছাকাছি হতে লাগল গাছগুলো। একসময় একটা গাছ হয়ে গেল ওগুলো। পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সবক'টা গাছ। আবার দূরে সরে যেতে লাগল।

একসময় অন্য গাছের আড়ালে চলে গেল ওগুলো।

আরেকটা বাঁক ঘুরছে ট্রেন, দুলে দুলে ঘুরে যাচ্ছে গাছপালাগুলো। মনে হচ্ছে আমার ছোটবেলা আর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ওগুলো। কাছে গেলেই পরম মমতায় জড়িয়ে ধরবে আমাকে।

দূরে একটা রাস্তার চৌমাথা দেখা গেল। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে, ওঠার পরেই স্টেশন। নামতে হবে আমাকে। সবাই মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। আমি সরে আসতে চাইলাম জানালা থেকে কিন্তু মনে হলো কে যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছে আমাকে। মাথার মধ্যে ঘুরছে শুধু ফেলে আসা রাস্তার নামটা–ব্রেমারস্ট্র্যাস, ব্রেমারস্ট্র্যাস।

রাস্তায় সাইকেল, লরি, ঘোড়া সব মিলিয়ে জট পাকিয়ে গেছে। ধূসর রাস্তা, ধুলোয় ভরা। ওটার পাশ দিয়ে আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, ওটারও একই অবস্থা। ছেড়ে আসতে কেন যেন কষ্ট লাগল। ঠিক যেন মায়ের মতই টানছে আমাকে রাস্তাটা।

ঘড়ঘড় ঘটাং করে থামল ট্রেনটা। এবার নামতে হবে। চারদিকে হৈ চৈ, ছুটোছুটি আর ফেরিওয়ালার চিৎকারে কান পাতা দায়।

মালপত্র বাঙ্ক থেকে সীটের ওপরে নামিয়ে বেল্টগুলো টাইট করে নিলাম। ওটাকে কাঁধে তুলে, রাইফেলটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে নামলাম প্ল্যাটফর্মে।

এদিক-ওদিক তাকালাম খানিকক্ষণ, যদি চেনা কাউকে চোখে পড়ে। নাহ্, কেউ নেই। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম বাইরের দিকে। দু'পা এগোতেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন। রেডক্রসের সেবিকা, হাতে কফিভর্তি পেয়ালা। আমি ঘুরে তাকাতেই বোকার মত হাসল।

'কমরেড,' বলে এমনভাবে কফিটা বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে যে ভাবখানা, 'দেখো, আমি একজন সৈনিককে কফি খাওয়াচ্ছি।'

আমি কিছু না বলে ঘুরে রওনা দিলাম।

স্টেশনের সামনে, রাস্তার ধার ঘেঁষে চলে গেছে ছোট্ট একটা নদী। ছোট হলে কি হবে, স্রোত আছে বেশ। নদীর ওপর দিয়ে একটা ব্রিজ। ব্রিজের পিলারের সামনে বেশ বড়োসড়ো একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে।

পিলারে ধাক্কা খেয়ে শাদা ফেনা তুলে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে নদী। নদীর একধারে পুরানো ওয়াচটাওয়ার, আর ভাঙা একটা কারখানা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটার চিমনি দিয়ে। কারখানার পেছনে ঝোপঝাড়, তার মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা লাইম গাছ। তার পেছনে অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোটুকু।

ওই গাছটার নিচে কতবার বসেছি আমরা। কতদিন আগে? কতবার সাঁতরে গেছি নদীর ঠাণ্ডা পানিতে, তাকিয়ে থেকেছি পিলারের গায়ের সবুজ লতাপাতা আর শ্যাওলার দিকে। গরমের দিনে প্রায়ই এসে বসতাম লাইম গাছের ছায়ায়। নদীর ঠাণ্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে গল্প করতাম স্কুলের স্যারদের নিয়ে।

আস্তে আস্তে ব্রিজটা পার হয়ে এলাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাকাতে লাগলাম ডাইনে-বাঁয়ে। নদী এখনও কানায় কানায় পূর্ণ, পিলারের গায়ে ঝোপঝাড় আরও ঘন হয়েছে। পুরানো ওয়াচটাওয়ারের মধ্যে লণ্ড্রিতে কাপড় ইস্ত্রি করা হচ্ছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে কাপড় থেকে। রাস্তার পাশে দুটো কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। সব ফেলে সামনে এগিয়ে গেলাম আমি। লোকজন তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দেখছে নোংরা পোশাক পরা, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে বাড়ি ফিরছে একজন সৈনিক। কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে।

রাস্তার মোড়ে একটা কনফেকশনারি। প্রায়ই আইসক্রীম খেতাম এখানে। এখানেই প্রথম সিগারেট খেতে শিখেছিলাম আমি। হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেকটা দোকানই চিনতে পারলাম, ওষুধের দোকান, মুদির দোকান, রুটির দোকান, সব। শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম আমার অতি পরিচিত পোকায় খাওয়া বাদামী দরজাটার সামনে। মরচে ধরা ছিটকিনিটা এখনও তেমনি আছে। আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল, হাত লোহার মত ভারি। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার সামনে। কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানি না, সংবিৎ ফিরতেই আস্তে করে ছিটকিনি খুলে ভিতরে ঢুকলাম। আশ্চর্য শান্ত একটা অনুভূতি জড়িয়ে ধরল আমাকে। ঝাপসা হয়ে এল চোখ।

সিঁড়িতে পা রাখতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল পুরানো সিঁড়িটা। ওপরে একটা দরজা খোলার শব্দ হলো, কে যেন হেঁটে এসে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

যে দরজাটা খুলেছে, ওটা রান্নাঘরের। আলু-রুটির গন্ধে মৌ মৌ করে উঠল চারদিক। তাই তো, আজকে শনিবার, প্রত্যেক শনিবারে আমার বোন আলুর পুর দিয়ে রুটি বানায়।

ওপরে নিশ্চয় আমার বোন দাঁড়িয়ে। হেলমেট খুলে ওপরে তাকালাম। রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার বড় বোন।

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলাম না কেউ। একটু পরে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'প্...প্ল।'

মাথা নাড়াতে পারলাম শুধু, রেলিংয়ের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। রাইফেলটার ওজন মনে হলো কয়েক মণ।

দৌড়ে ছুটে গেল ও। দড়াম করে দরজা খুলল একটা। পরিষ্কার শুনতে পেলাম এখান থেকে, ও চিৎকার করে বলছে, 'মা, মা, তোমার পল এসেছে, পল এসেছে তোমার।'

সারা বাড়ি জুড়ে যেন ওর কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগল, 'মা, মা, তোমার পল এসেছে, পল এসেছে তোমার।'

আমার শরীরের সমস্ত শক্তি এক মুহূর্তে কে যেন শুষে নিল। হাঁটু কাঁপতে লাগল থরথর করে। দেয়ালে হেলান দিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে কোনরকমে রক্ষা করলাম নিজেকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে রাইফেলটা চেপে ধরলাম কিন্তু মনে হলো আমার হাত থেকে যে কোনো মুহূর্তে খসে যাবে ওটা। একটা পা ফেলার শক্তি রইল না আমার। সিঁড়ির ধাপগুলো আস্তে করে ঝাপসা হয়ে এল চোখের সামনে। অনেকগুলো আলোর তারা জ্বলে উঠল দু'চোখে।

রাইফেলের বাঁটের ওপর ভর রেখে দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সমস্ত শরীর। বোনের ওটুকু কথাই আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে।

বুকের ভেতর জমে থাকা সব কথা একসাথে বেরিয়ে আসতে

চাইছে। আমি হাসতে চাইছি, কথা বলতে চাইছি কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, একটা শব্দও বের করতে পারলাম না। জিভটা যেন সীসার মত ভারি হয়ে গেছে।

অসহায়, সম্পূর্ণ শক্তিহীনভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারার আলো নিবে গিয়ে দু'কূল প্লাবিত করে নামল অশ্রুর বন্যা।

ওপরে পায়ের শব্দ পেলাম, তারপরেই শুনলাম আমার বোনের গলা। একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, পল?'

জামার হাতায় তাড়াতাড়ি চোখদুটো মুছে নিলাম। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে রাইফেল আর হেলমেটটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলাম। মালপত্রগুলো এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে কোনরকমে বললাম, 'একটা রুমাল দিবি?'

তাড়াতাড়ি আলমারি থেকে পরিষ্কার একটা রুমাল এনে দিল ও। ভাল করে চোখমুখ মুছে নিলাম আমি। দেখলাম, দেয়ালের তাকের ওপরে কাচের জারে আমার কবেকার ধরা সেই প্রজাপতিগুলো এখনও আছে।

মায়ের গলার আওয়াজ পেলাম। ভেতরে শোবার ঘর থেকে আসছে। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'মায়ের কি হয়েছে, শুয়ে আছে কেন?'

'মায়ের অসুখ।'

তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলাম। দেখি মা শুয়ে আছে বিছানায়, বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা।

বিছানার পাশে বসে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম মাকে, 'এই দেখো, মা, তোমার পল তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তোমার নাকি অসুখ করেছে, মা?'

'তুই এসেছিস, আমার অসুখ অর্ধেক ভাল হয়ে গেছে, বাবা, এবার আমি ভাল হয়ে উঠব।' বলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল মা, 'তুই জখম হোসনি তো, বাবা?'

'মা, মা, ছুটিতে এসেছি।'

মা আশ্বস্ত হলো। দুর্বল হাত দিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে লাগল আমার।

ঘরে ম্লান একটা আলো জ্বলছে, তাতে সবকিছু আরও বিবর্ণ লাগছে। মায়ের অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম।

'দাঁড়া, রান্নাটা পুড়ে না যায় আবার,' বলেই বড়বোন ছুটল রান্নাঘরে। একটু পরেই অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে এ ঘরে ঢুকল।

ও ঢুকতেই মা বলল, 'দেখ্ তো, এর্না, তাকের ওপর জামের আচারের শিশিটা আছে। পলকে দে। ও জামের আচার খেতে খুব ভালবাসে। কতদিন যে সোনা আমার জামের আচার খায়নি!'

'হ্যাঁ, মা, অনেকদিন খাই না, ওদিকে তো জামের আচার পাওয়াই যায় না।'

এর্না শিশিটা নামিয়ে দিয়ে একটা প্লেট আর চামচ আনতে রান্নাঘরে ঢুকল। মা আপনমনেই বলতে লাগল, 'কোথায় আজকে আমি নিজের হাতে ওকে খাওয়াব, তা না বিছানায় পড়ে রইলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মায়ের বুক থেকে।

'আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, তুই আসবি,' হাসতে হাসতে বলল এর্না, 'দেখ না, যা যা তুই ভালবাসিস, সব তৈরি। আলুর পুর দেয়া রুটি, সাথে জামের আচার।'

'আজকে যে শনিবার।'

এর্না আবার ছুটল রান্নাঘরে, খাবারটা দেখতে। মা বলল, 'আমার আরও কাছে এসে বস, বাবা।'

আমি মায়ের মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। মা শীর্ণ হাতটা দিয়ে আমার হাতের ওপর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'বাপ আমার!'

ছোট্ট একটু কথা, কিন্তু ওটুকুতেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। মায়ের স্নেহধারা দু'কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। ছলছল করে উঠল চোখ দুটো। মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডাকলাম

'মা!' মা শুধু চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল।

সারাক্ষণই ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এই বুঝি মা জিজ্ঞেস করে যুদ্ধের কথা। কিন্তু এখনও বলেনি কিছু। বেঁচে গেছি।

এর্না প্লেটে করে জামের আচার আর কয়েক টুকরো কেক দিয়ে গেল। কেকগুলো শুকনো, বেশ আগের। সম্ভবত সস্তায় পেয়েছিল কখনও, কিনে রেখেছে আমার জন্যে। কিন্তু আমি তো জানি, এই সামান্য জিনিসটুকুর জন্যেও কতটা কষ্ট করতে হয়েছে ওদের।

মায়ের পাশে বসে আছি। আমার হাতটা মায়ের হাতে ধরা। জানালা দিয়ে দেখছি তারাভরা আকাশ। ফুরফুরে বাতাসে দোল খাচ্ছে চেস্টনাট গাছের বাদামী সোনালী পাতা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। আমি এখন বাড়িতে। বাড়ি ফেরার কত স্বপ্ন দেখতাম ফ্রন্টে, সারাক্ষণ, যুদ্ধের মাঝেও আমার ছোট্ট বাড়িটাতে ফেরার স্বপ্ন ভেসে বেড়াত। এই তো আমি এখন সেখানে। কিন্তু যতটা ভেবেছিলাম, ততটা খুশি হয়ে উঠতে পারছি না। কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে নিজেকে, মনে হচ্ছে এ জায়গা আমার জন্যে নয়। মায়ের হাতে আমার হাতটা বাঁধা, রান্নাঘরে আমার বোন, তাকের ওপর আমার ধরা প্রজাপতিগুলো, ঘরের কোণায় আমার মেহগনি কাঠের পিয়ানো, সব আমার কত আপন, কিন্তু তবু যেন কেমন একটা দূরত্ব অনুভব করছি সবার সাথে। মনে হয় সূক্ষ্ম একটা পর্দা ঝোলানো আছে আমাদের মাঝখানে। একটা দূরত্ব যেন থেকেই যাচ্ছে সারাক্ষণ।

'দাঁড়াও, আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।' মার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে থেকে আমার মালপত্রগুলো ভেতরে এনে মেঝের ওপর রাখলাম।

ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে একে একে বের করলাম আস্ত একটা এডেমার পনির, দু'খানা বিশাল সাইজের পাউরুটি, পৌনে এক পাউণ্ড মাখন, দুই-টিন সসেজ, এক পাউণ্ড চর্বি আর একটা প্যাকেটে বেশ খানিকটা চাল। পনিরটা কাট দিয়েছিল আমাকে।

'কয়েকদিন চালানো যাবে, তাই না?'

হাসল ওরা।

'আচ্ছা, এখানে খাবার জিনিসপত্রের অবস্থা খুব খারাপ নাকি?'

'বেশ খারাপ, পাওয়াই যায় না কিছু। তোদের ওখানে কেমন?'

আমি হাসলাম। জিনিসগুলোর দিকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখতেই পাচ্ছ কেমন। অবশ্য সবসময় যে এমন পাওয়া যায় তা নয়, তবে খারাপ না।'

এর্না জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেল। ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মা খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'পল, ওখানে নাকি ভয়ঙ্কর অবস্থা?'

মা, আমি এর কি উত্তর দেব, মা? তুমি বুঝবে না, মা, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে ওখানে কি ঘটছে। আর তুমি জিজ্ঞেস করছ, অবস্থা নাকি ভয়ঙ্কর!

আস্তে করে মায়ের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'না, মা, যতটা ভাবছ ততটা খারাপ নয়। আর আমরা তো অনেকজন একসাথে থাকি, তেমন খারাপ লাগে না।'

'তবে যে সেদিন ব্রেডমেয়ার এসে বলল ওদিকের অবস্থা খুবই খারাপ, গ্যাস ছাড়ছে ওরা, আরও নাকি কত কি সব?'

মা, তুমি জিজ্ঞেস করছ, গ্যাস, আরও কত কি! সব কথা যদি বলি, মা, তাহলে তুমি তো মরে যাবে। আমি ওখানে আছি বলেই না তোমার এত চিন্তা।

কি হচ্ছে না ওখানে? সব—মানুষ আর মানুষ নেই ওখানে। গ্যাসের কথা বললে তুমি, একদিন শত্রুর তিনটে ট্রেঞ্চ আর সেলার ভর্তি সৈনিক পেয়েছিলাম। দেয়ালের গায়ে হেলান দেয়া, বসে, শুয়ে, যে যেভাবে ছিল সেভাবেই। শক্ত, নীল। কেউ বেঁচে ছিল না। একথা তুমি সহ্য করতে পারবে, মা?

বললাম, 'বাদ দাও ওর কথা, কার কাছ থেকে কি না কি শুনে এসে উল্টা-পাল্টা কথা বলছে। এই তো আমি তোমার পাশে বসে আছি, কই, আমার কি কিছু হয়েছে?'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মা।

কেমন স্বচ্ছন্দে মিথ্যে কথাগুলো বলতে পারলাম, নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। বেশ একটু ঝরঝরে লাগল নিজের কাছে। থাক, আর অসুবিধে হবে না ভবিষ্যতে। মায়ের যাতে দুশ্চিন্তা না হয় তার জন্যে এর চেয়েও অনেক বেশি করতে পারব আমি।

'একটু ধরত, বাবা, একটু উঠব আমি।'

'দাঁড়াও, একটু রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি,' বলে রান্নাঘরে বোনের কাছে চলে এলাম।

'এই, মায়ের হয়েছে কি আসলে?'

'মা তো কয়েকমাস ধরে বিছানায়। তোকে জানানো হয়নি চিন্তা করবি বলে। কয়েকজন ডাক্তার দেখানো হয়েছে, সোজাসুজি তো কেউ বলে না কিছু, খালি ওষুধপত্র দেয়। তবে একজন বলেছিল, "মনে হয় ক্যান্সার".'

পরদিন সকালে জেলা কমাণ্ড্যান্টের অফিসে গেলাম রিপোর্ট করতে। আস্তে আস্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, দু'পাশে তাকিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করছি আমার হারানো দিনগুলোকে। মাঝে মাঝে পরিচিত দু'একজনের সাথে দেখা হয়ে গেলেই থামতে হচ্ছে। দু'একটা কথা বলেই পাশ কাটালাম আমি। চুপচাপ একা একা থাকতেই ভাল লাগছে আমার।

ব্যারাক থেকে কাজ সেরে ফিরছি, পেছনে এক বাঁজখাই গলার চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। থতমত খেয়ে ঘুরতেই দেখি এক মেজর।

'স্যালুট দিতে জানো না?' গর্জে উঠল মেজর।

বিব্রতভাবে বললাম, 'দুঃখিত, মেজর, আমি আপনাকে খেয়াল করিনি।'

'কিভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মেজর।

মনে হলো এক ঘুসিতে হারামজাদার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিই, কিন্তু অতিকষ্টে রাগটা সামলে নিলাম। ওর ওপর আমার ছুটিটা নির্ভর করছে। বুটের গোড়ালি ঠুকে বললাম, 'আপনাকে দেখিনি,

মেজর।'

'চোখে ঠুলি আটকানো থাকে নাকি? এখন থেকে চোখকান খোলা রাখবে,' রাগে ঘোড়ার মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, 'নাম কি তোমার?'

'পল বোমার।'

লালমুখো শুয়োরটা ঘোঁতে ঘোঁত করে জিজ্ঞেস করল, 'কোন রেজিমেন্ট?'

বিগ্রেড, ব্যাটালিয়ন, রেজিমেন্ট, কোম্পানি যা যা আছে সবগুলোর নাম বললাম, তবু ব্যাটার আশ মেটে না। ফের জিজ্ঞেস করল, 'কোন জায়গায় থাকো?'

'লেঙ্গমার্ক আর বিকশুটের মাঝামাঝি।'

'চাপাবাজি করার জায়গা পাও না,' একটু বিভ্রান্তভাবেই বলল ও।

বললাম, 'আমি কালকে রাতেই পৌছেছি এখানে, ছুটিতে এসেছি।' মনে করলাম এবার বুঝি শান্ত হবে, দেখি ওটা একটা ঘেয়ো কুকুর, লেজে পোকার কামড়ে সারাক্ষণই খেপে আছে। আমার কথা শুনে আরও খেপে উঠল, 'ভেবেছ, ফ্রন্টের চাষামো এখানে চালাতে পারবে? এখানে নিয়ম-কানুন আছে, ওসব করতে গেলে ভূত ছাড়িয়ে দেব।'

হুকুম দিল, 'বিশ কদম পিছনে হটো, ডবল মার্চ।'

রাগে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। ও ইচ্ছে করলেই আমাকে গ্রেপ্তার করে রাখতে পারে। ডবল মার্চ করে পিছনে হটলাম, তারপর মার্চ করে এগোলাম সামনে। ওর থেকে ছয় পা সামনে ঠকাস করে স্যালুট ঠুকলাম একটা।

এতক্ষণে মন গলল ব্যাটার, একটু হেসে বলল, 'এবারের মত মাফ করে দিলাম। যাও, ডিসমিস।'

অ্যাবাউট টার্ন হয়ে মার্চ করে সরে গেলাম ওর সামনে থেকে।

এরপর মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল আমার। বাড়ি ফিরেই সামরিক পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এক কোণে। ওয়ারড্রোব থেকে পুরানো জামা-কাপড়গুলো বের করে পরলাম। পরার পরই অস্বস্তি হতে লাগল।

সুটটা ছোট আর টাইট। আসলে সেনাবাহিনীতে গিয়ে বেড়ে উঠেছি বেশ খানিকটা।

শার্টের কলার আর টাই নিয়ে বাধল ঝামেলা, কিছুতেই দুরস্ত করতে পারলাম না ও দুটোকে। শেষ পর্যন্ত এর্না এসে টাইটা ঠিক মত বেঁধে দিল। এতদিন সেনাবাহিনীর ভারি পোশাক পরে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে সুটটা একেবারে হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে শার্ট আর আণ্ডারঅয়্যার ছাড়া পরনে আর কিছু নেই আমার।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ও কে দাঁড়িয়ে আয়নার ভেতর? রোদে পোড়া এক যুবক অবাক হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

মা এই পোশাক দেখে খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'এতক্ষণে তোকে আমার ছেলের মত লাগছে।' বাবা কিন্তু চাইছিল, আমি সেনাবাহিনীর পোশাকই পরে থাকি, বিশেষ করে যখন তার পরিচিত লোকদের সাথে দেখা করতে যাব। মানে আর কিছুই না, গর্বে বুকটা একটু ফুলে উঠবে এই আর কি। সেজন্যে বারকয়েক বললও পোশাকটা পরার জন্যে। আমি রাজি হলাম না। অনেক হয়েছে, বাড়িতে অন্তত আমি আমার মতই থাকি।

বিকেল। একটা বারের পেছনের দিকের বাগানে বসে আছি। চেস্টনাট গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা একটা পরিবেশ। বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। টুপ টাপ করে পাতা ঝরে পড়ছে গাছ থেকে, দু'একটা টেবিলের ওপরই পড়ছে। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। সূর্যের শেষ আলোয় জ্বলছে গির্জার চূড়া। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। কোলাহল নেই, কামান লরির ঘড়ঘড়ানি নেই, গোলা ফাটার আওয়াজ নেই। প্রচণ্ড ভাল লাগত যদি একা থাকতে পারতাম। কিন্তু সেটা হবার যো নেই।

সামনে বসে আছে কয়েকজন। টেবিলের ওপর বিয়ারের গ্লাস। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছি ওতে। এ নিয়ে তিন গ্লাস হবে। বিয়ার খাবার অভ্যাস হয়েছে যুদ্ধে যাবার পর। আর এখানে তো যত খুশি খাওয়া যাবে। নিজে

না নিলে অন্যজন সাধবে।

চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু লোকজনের জন্যে তা একেবারেই সম্ভব নয়। সবাই, এমনকি বাবারও সারাক্ষণ কৌতূহল, কি ঘটছে ওখানে। শুধু মা-ই জিজ্ঞেস করে না কিছু। সবাই সারাক্ষণ ফ্রন্টের কথা এত জিজ্ঞেস করে যে বিরক্তি ধরে গেছে। ওরা বোঝে না কেন, আমি বাড়িতে এসেছি ছুটি কাটাতে। আমি এ ক'টা দিন শান্তিতে থাকতে চাই, আমি ওসব কথা ভুলে থাকতে চাই।

বাবা পর্যন্ত ফ্রন্টের কথা শোনার জন্যে কৌতূহলে ফেটে পড়ছে। বাবা, তুমি বোঝো না, একজন মানুষ ওকথা বলতে পারে না? ও কি বর্ণনা করার মত ব্যাপার? আমার ভয় হয়, চাপে পড়ে যদি কোনদিন বলতে শুরু করি তবে ঘটনাগুলো হয়তো দানব হয়ে উঠবে। ছারখার করে ফেলবে সুখ-শান্তি, কোমল অনুভূতি, সব। তার চেয়ে কেউ যদি না জানে কি ঘটছে ওখানে, কি এমন ক্ষতি হবে? মানুষের পাশবিকতার কাহিনী না হয় না-ই জানল ওরা।

ঠিক করেছি, এ প্রসঙ্গে খুব সামান্য কথা বলব সবাইকে। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে? একদিন আমাকে একা পেয়েই বাবা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কখনও তোকে হাতাহাতি যুদ্ধ করতে হয়েছে?'

'না হয়নি,' বলে উঠে এলাম ওখান থেকে।

কিন্তু আমি নিজেই তো ভুলতে পারছি না ওসব। রাস্তায় একদিন ট্রামের হর্ন শুনেই নিজের অজান্তে ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। মাথা নিচু করে ফেললাম। ঠিক মনে হয়েছিল, হালকা গোলা ছুটে আসছে। ওটা ট্রামের আওয়াজ বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি সোজা হলাম আবার। এদিক-ওদিক তাকালাম, কেউ দেখে ফেলেছে কিনা। নাহ্, কেউ খেয়াল করেনি। হাঁটতে লাগলাম সামনে।

কে যেন পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখল। ঘুরে তাকাতেই দেখি, আমাদের জার্মান-মাস্টার। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কথা শুরু করলেন, 'কি খবর তোমার, কেমন চলছে ওখানে? যা-তা অবস্থা, তাই না? তবুও

আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ওখানে তো তোমরা ভালই খাবার-দাবার পাচ্ছ তাই না? ওরকমই তো শুনলাম এখানে। তা তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে, পোড়খাওয়া, শক্তসমর্থ। এখানকার অবস্থা খারাপ। খাবার দাবারের বড় টানাটানি। এটা অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। ভাল জিনিসপত্র তো সৈনিকদের জন্যে যাবেই, এতে তো আর বলার কিছু নেই।'

আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর সাথে। একটা টেবিলে বসলাম। আরও কয়েকজন বসে আছে, ওঁর পরিচিত সব। একজন হেডমাস্টার বসে ছিলেন, উঠে হ্যাণ্ডশেক করলেন আমার সাথে।

'তুমি ফ্রন্ট থেকে এসেছ? ওখানে আমাদের সৈন্যদের মনোবল কেমন? দারুণ, তাই না?'

বললাম, 'তা ঠিক, তবে বাড়ি ফিরতে পারলেই সবাই খুশি হবে।'

হেসে উঠলেন তিনি, সেইসাথে সবাই, 'এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? আগে ওই ব্যাঙগুলোকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দাও। ভাল কথা, সিগারেট খাও? এই, ওয়েটার, এখানে আমাদের এই নওজোয়ানের জন্যে একগ্লাস বিয়ার নিয়ে এসো।'

একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। হাত বাড়িয়ে নিলাম ওটা। নিয়েই বুঝলাম কি ভুলটা করেছি। সিগারেটটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত থাকতে হবে এখানে। তাছাড়া ওঁরা সবাই এত ভাল ব্যবহার করছেন যে চট্ করে উঠে যাব সে উপায়ও নেই। নিজের ওপরই শেষে এত রাগ হয়ে গেল যে কষে টান দিতে লাগলাম সিগারেটে, সেইসাথে চিমনির মত ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম।

বিয়ার এল। এসেই যখন পড়েছে, না খেলে খারাপ দেখায়, তাই একচুমুকে শেষ করে ফেললাম ওটাকে। সাথে সাথে আরেক গ্লাসের অর্ডার চলে গেল। মহাজ্বালায় পড়লাম দেখছি।

বিয়ার আসার আগেই শুরু হয়ে গেল আলোচনা। আমাদের কি করা উচিত, কি না করা উচিত এই নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক সবার মধ্যে।

হেডমাস্টার ওঁর স্টীলের চেন দেয়া ঘড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'পুরো বেলজিয়াম তো আমাদের চাই-ই ফ্রান্সের

কয়লাখনি আর রাশিয়ার খানিকটাও আমাদের কব্জা করতে হবে।' গড়গড় করে বলে যুক্তি দেখালেন, কেন ওগুলো আমাদের দরকার। 'ওছাড়া সন্ধি করার প্রশ্নই আসে না।' তারপর ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন ফ্রান্সের কোথায় কোথায় কিভাবে আক্রমণ করা দরকার, সেভাবে আক্রমণ করলে কি হবে না হবে এসব।

'তোমাদের ট্রেঞ্চগুলো এগিয়ে নিয়ে যাও, ওদেরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাও, এ ছাড়া শান্তি আসার আর কোন উপায় নেই।'

আমি বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু যেভাবে আক্রমণ করতে বলছেন ওভাবে সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া ওদেরও তো প্রচুর রিজার্ভ আছে। যুদ্ধের ফলাফল যেমন ভাবছেন, তেমন নাও হতে পারে।'

'রাখো তোমার অন্যরকম,' টেবিলের ওপর থাপ্পড় মেরে বললেন হেডমাস্টার, 'তুমি কি জানো, তুমি তো জানো শুধু নিজের ট্রেঞ্চের খবর, পুরো খবর পাবে কি করে? যুদ্ধের সমস্ত খবরাখবর জানলে আর একথা বলতে না। অবশ্য তোমরা যেভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করছ, তাতে, আমার মতে তোমাদের সবাইকে "আয়রন ক্রস" দেয়া উচিত, কিন্তু তার আগে শত্রুকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

সশব্দে নাক ঝেড়ে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে আবার শুরু করলেন, 'প্রথমে হল্যাণ্ড, তারপর এগিয়ে যেতে হবে দুর্বার গতিতে। প্যারিসে পৌঁছে তবেই থামাথামি। তার আগে শান্তি নেই।'

ভাবলাম, একবার জিজ্ঞেস করি, এত চমৎকারভাবে সব হিসাব নিকাশ করলেন কিভাবে। তৃতীয় গ্লাসের বিয়ারটুকু শেষ করে ঠক্ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম। চতুর্থ গ্লাসের অর্ডার চলে গেল সাথে সাথে।

আর ভাল লাগছিল না একেবারেই। বললাম, 'উঠি এবারে।'

'আরে বসো বসো, এখনি কি যাবে।'

'না, না, বাড়িতে একটু কাজ আছে, আরেকদিন কথা বলব।'

'ঠিক আছে,' বলে জোর করে আমার পকেটে অনেকগুলো সিগারেট দিয়ে দিলেন ওঁরা। হেডমাস্টার আমার কাঁধে সস্নেহ চাপড় মেরে

বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছ থেকে সুখবর শুনতে চাই কিন্তু।'

ভেবেছিলাম ছুটিটা অন্যরকম হবে। বছরখানেক আগে হলেও তাই হত, কিন্তু এখনকার আমি-র সাথে তখনকার আমি-র আকাশ পাতাল তফাৎ। মানুষ কত তাড়াতাড়ি যে বদলে যায়! আমাদের সেক্টর তখনও শান্তই ছিল, যুদ্ধ যে কি, কিছুই জানতাম না। এখন যুদ্ধে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছি। বুঝে গেছি বাড়ি আর আমার জন্যে নয়।

লোকজন শুধু জিজ্ঞেস করে যুদ্ধের কথা, ফ্রন্টের কথা, যেন আমিই স্বয়ং কাইজার। কেউ কেউ অবশ্য কিছুই জিজ্ঞেস করে না। ভাবখানা, যেন তারা এত বেশি জানে যে ওকথা আর কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ও নিয়ে এত আলোচনারও দরকার নেই।

বেশিরভাগ মানুষ অবশ্য এই নিয়েই আছে। আগে আমিও এমনি ছিলাম কিন্তু এখন একেবারেই আলাদা। যুদ্ধ নিয়ে এই যে তাদের এত আশা, চিন্তা, আমি বুঝে উঠতে পারি না এসব। মাঝে মাঝে ওদের দু'একজনের সাথে একা একা কথা বলে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করি যে যেমন ভাবছে তারা, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। ওরা শান্তভাবে শোনে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওদের মন পর্যন্ত পৌঁছয় না কথাগুলো। মাঝে মাঝে আমারই মনে হয়, যা বোঝাতে চাইছি সে-কথা বলেছি তো?

যখন ওদেরকে ওদের ঘরে, দোকানে, অফিসে দেখি, প্রচণ্ড আকর্ষণ জাগে। যুদ্ধ ভুলে ওদের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু প্রচণ্ড একটা বিতৃষ্ণা এসে ভর করে সেইসাথে, এই কি জীবন? এত ক্ষুদ্র? এই টেবিল-চেয়ার, কলম পেশা, সকাল-সন্ধ্যায় একই আলোচনা, এসব দিয়েই একজনের জীবন ঠাসা? এরা আছে কি করে? ওদের মত মানুষরাই তো গোলার গর্তে মুখ গুঁজে আছে, মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে যাচ্ছে স্প্লিন্টারের টুকরো, গোলা পড়ছে বৃষ্টির মত, তারই মধ্যে ছুটে যাচ্ছে ওরা। আহতের আর্তনাদ, রক্ত, বারুদের গন্ধ, গ্যাস, তার মধ্যেও তো হাসতে পারছে মানুষ। আমি বুঝি না এদের মধ্যে

কাকে আমি ভালবাসব, কাকে ঘৃণা করব। আমি তো যুদ্ধ চাই না, কিন্তু এদের মতও হতে চাই না। আমি তো কাট, জাদেন, মুলার, ক্রপ, ওদের সবাইকে ভালবাসি। কি করছে ওরা এখন? নিঃসন্দেহে ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দিচ্ছে নয়তো সাঁতার কাটতে গেছে। একটু পরেই হয়তো ফ্রন্টে যেতে হবে ওদের।

আমার ঘরে বসে আছি। তাকিয়ে দেখছি চারপাশে। টেবিলের পেছনে বাদামী চামড়ায় মোড়া সোফা। তার পেছনের দেয়ালটা অসংখ্য ছবি দিয়ে ঠাসা। খবরের কাগজ থেকে কেটে নিয়ে সেঁটে দেয়া ছবি সব। ওর মধ্যে রঙিন ভিউকার্ডগুলোই বেশি ভাল লাগে আমার। ঘরের এক কোণে একটা স্টোভ। সামনের দেয়ালের সাথে লাগানো বুক শেলফ, আমার যত বইপত্র, সব ওখানে।

যুদ্ধে যাবার আগে পর্যন্ত কাটিয়েছি এই ঘরে। বইগুলো হাত খরচের টাকা জমিয়ে কেনা। অধিকাংশই অবশ্য সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। তা হোক, এভাবে অল্প পয়সায় অনেক বই কেনা যায়। কিছু কিছু বই অবশ্য অন্যভাবে সংগ্রহ করা। অর্থাৎ ধার নিয়ে গায়েব করে দিয়েছি।

বইগুলো কেনার পরে গোগ্রাসে গিলতাম। সব যে ভাল লাগত তা নয়। নতুন দিনের বইগুলোই বেশি ভাল লাগত।

একটা শেলফে এই সব বই ঠাসা, অন্যটা আমার স্কুলের বইপত্র, চিঠি, রাফ কাগজ, ম্যাগাজিন দিয়ে ভর্তি। গল্পের বইগুলোর যতটা যত্ন নিতাম, স্কুলের বইগুলোর জন্যে তার এক কণাও না। ওগুলোর পাতা কুঁচকে গেছে নয়তো ছিঁড়ে গেছে, বাঁধাই খসে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। কিছু কিছু পাতা অবশ্য বিশেষ কারণে ইচ্ছে করেই উধাও করে দেয়া হয়েছে।

ঘরের ছোট্ট জানালাটা খোলা। বাইরে শরতের উদাস করা নীল শাদা মেঘ। ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল একটা দিন। চেস্টনাটের পাতায় পাতায় হাওয়ার তুমুল মাতামাতি। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গির্জার উঁচু চূড়া।

ইচ্ছে হলো ফিরে যাই আগের দিনগুলোতে। চোখ ফেরালাম ঘরের ভেতরে। এই তো আমার ঘর, এখানে কাটিয়েছি আমার শৈশব, আমার

কৈশোর। যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে সব, এই চার দেয়ালের মধ্যে সময় বদলায়নি একটুও।

সোফার হাতলে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে আরামে বসলাম। আমি এখন বাড়িতে, আমার ঘরে, এই অনুভূতিতে ভরিয়ে দিতে চাইলাম মনটাকে।

টেবিলের ওপর একগোছা ফুল, একটা শঙ্খ, কালির দোয়াত, পেনস্ট্যাণ্ড, সব আমার, আমার ছোটবেলার, আমার কৈশোরের। সব তেমনি আছে।

যুদ্ধ শেষে যদি ফিরে আসি, আবার আমি বসে থাকব এমনি করে, এমনি করেই তাকিয়ে থাকব আমার জিনিসগুলোর দিকে।

সেই দিনগুলোর কল্পনায় অস্থির হয়ে উঠলাম মনে মনে। মনটাকে শান্ত করতে চাইলাম তাড়াতাড়ি। এইমুহূর্তে অস্থিরতা চাই না আমি। আমি চাই সুন্দর গন্ধভরা নতুন বই পড়ার রোমাঞ্চ, আনন্দ, আগ্রহ আমাকে জড়িয়ে ধরুক, সেই উত্তেজনায় বুক ভরে উঠুক, আমার মনের যে গহনে সীসার মত ভারি কিছু জমাট বেঁধে আছে, গলে গলে নামুক ঝর্ণাধারার মত, যৌবনের উচ্ছল আনন্দ আবার আমাকে পরিপূর্ণ করে দিক।

চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

মাথার মধ্যে অন্য চিন্তা এসে ভর করতে চাইছে। মনে পড়ছে কেমারিখ, হাই, ওদের কথা। চোখ মেললাম। তাকালাম জানালা দিয়ে। রাস্তা, গাছপালা, গির্জা ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল আরও দূরে। ওদিকে নীলচে ধূসর আবছা পাহাড়ের সারি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওগুলো একসময় মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। মন চলে গেল আরও দূরে। আগুনের পাশে বসে আছি, আমি, কাট, আর ক্রপ। আলু সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খাচ্ছি।

কিন্তু আমি ওগুলো চিন্তা করতে চাই না এখন। তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলাম চিন্তাগুলো। ঘরের মধ্যে চোখ ফেরালাম আবার। এই ঘরের মধ্যে যে সময় থেমে আছে, সে আমাকে জড়িয়ে

ধরুক, আপন করে নিক। আমি অনুভব করতে চাই, আমিও এদের মতই আছি। আমি শুনতে চাই, আমি জানতে চাই, যখন ফিরে যাব ফ্রন্টে, চরাচর ডুবে যাবে যুদ্ধ বিরোধী সঙ্গীতে, বাড়ি ফেরার আনন্দ জলোচ্ছ্বাসের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যুদ্ধকে। যা ঘটেছে, সব রয়ে যাবে ওখানে; আমাদের স্মৃতিতেও ফিরে আসবে না আর। শুধু নিয়ে আসব নিজের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রচণ্ড এক শক্তি।

বইয়ের তাকগুলোর দিকে তাকালাম। সারি সারি বাঁধানো বই। ধুলো জমে গেছে বেশ, অনেকগুলোর নাম মুছে গেছে। কিন্তু এখনও আমি প্রত্যেকটা বইয়ের নাম বলে দিতে পারি। ওই বইগুলোর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে আমার কৈশোরের স্পর্শ, আমার জীবন। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম ওগুলোর দিকে। কথা বলো তোমরা, তোমরা সুন্দর, তোমরা মুক্ত, আমাকে নাও তোমাদের সাথে।

অপেক্ষা করছি, শুধু অপেক্ষা করছি ওদের জন্যে।

ওদের ছায়া ভেসে যায়, স্মৃতি ভেসে যায় মনের ওপর দিয়ে। কিন্তু ওরা আমাকে ছোঁয় না, আমাকে নেয় না ওদের সাথে। ওগুলো শুধুই ছায়া, শুধুই স্মৃতি।

কিছুই হয় না, শুধু আমার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। হঠাৎ করেই প্রচণ্ড এক বিষণ্ণতা গ্রাস করল আমাকে। মনে হলো আমি অন্য জগতের লোক, এদের কেউ নই, কোনদিন ছিলামও না। আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে দিতে চেয়েছি ওদের, তবুও ওদের হতে পারলাম না কিছুতেই। ওরা নিল না আমাকে।

নিজেকে মনে হলো পরাজিত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। আমার অতীত বলে আর কিছু রইল না। কিন্তু আমি তো একজন সৈনিক। এত সহজে হার মানব কেন?

ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালাম আমি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওভাবে। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে।

বুকশেলফের কাছে গিয়ে একটা বই টেনে নিলাম। পৃষ্ঠা উল্টে পড়ার

চেষ্টা করলাম, ভাল লাগল না বইটা। ওটা রেখে আরেকটা টেনে নিলাম। পৃষ্ঠা খুলে দেখি, পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া। আমারই কাজ ওটা। এ বইটাও ভাল লাগল না।

একটার পর একটা বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছি, কিন্তু পড়তে পারছি না একটাও। আমার পাশে বইপত্র আর ম্যাগাজিনের স্তূপ হয়ে গেছে। পাগলের মত নতুন বই, নতুন ম্যাগাজিন টেনে বের করে পৃষ্ঠা ওল্টাই, ভাল লাগে না একটাও।

ফাঁসির আসামীর মত উঠে দাঁড়ালাম। আমার বিচারের রায় দেয়া হয়ে গেছে। আমি দোষী। থরথর করে কাঁপছে শরীর, জুলপি বেয়ে কুলকুল করে নেমে এল ঘামের ধারা। বইয়ের একটা জিনিসও আমার মনে দাগ কাটতে পারেনি। শুধু সুন্দর সুন্দর শব্দ, আর কিছু নয় ওগুলো। ওগুলো পৌঁছয় না আমার কাছে। দূর থেকে ওরা হেসে যায় শুধু।

ধপ্ করে বসে পড়লাম সোফায়। থরথর করে কাঁপছে শরীর। ঘামে ভিজে গেছে শার্ট। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে কাঁপুনিটা যখন কমে গেল, আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। বইপত্রগুলো জায়গামত সাজিয়ে রাখলাম আবার। অনেক হয়েছে, আর নয়। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

এর পরেও আশা ছাড়লাম না। ও ঘরে যাবার সাহস হচ্ছে না আর। কিন্তু নিজেকে বোঝালাম, সবে তো এলাম, এত তাড়াতাড়িই কি আর সম্ভব সবকিছু? এখনও তো অনেক সময় পড়ে আছে! একটু শান্ত হলো যেন মনটা।

মিটেলস্টেডের সাথে দেখা করতে গেলাম। ব্যারাকে ওর রুমে বসে অনেকটা স্বস্তি পেলাম। এ পরিবেশ আমি পছন্দ করি না, তবু এর সাথেই খাপ খাওয়াতে পারছি নিজেকে।

সিগারেট ধরালাম দু'জনে। খানিকক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পরে মিটেলস্টেড বলল, 'দারুণ একটা খবর আছে।'

কি?

'ক্যান্টোরেককে তলব করা হয়েছে টেরিটোরিয়াল আর্মিতে।'

'বলিস কি?' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম একেবারে, 'কবে থেকে?'

'এই তো, কিছুদিন হলো।' পকেট থেকে দুটো দামী সিগারেট বের করে একটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এখানের চার্জ পাবার পর প্রথমেই খোঁজ করেছি ওর, আগেই শুনেছিলাম যে ও এখানে আছে। আমাকে দেখেই দেঁতো একটা হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, "কি খবর, মিটেলস্টেড, কেমন আছ?"

'আমি ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললাম, "টেরিটোরিয়াল ক্যান্টোরেক, বিজনেস ইজ বিজনেস, জিন ইজ জিন। তোমার সেকথা ভাল করে জানা উচিত। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াও, যখন তোমার উর্ধতন কারও সাথে কথা বলবে, তখন এভাবেই থাকবে, বুঝেছ?"

'তখন যদি ওর চেহারাখানা দেখতি! এরপরেও বারকয়েক চেষ্টা করেছে ও ভাব জমাতে। সুতরাং আমিও আরেকটু টাইট দিলাম। সুবিধা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওর সর্বশেষ অস্ত্রটা ছাড়ল। চোখমুখ পাকিয়ে একদিন বলল, "তুমি কি চাও যে আমি আমার ক্ষমতা খাটাই, তোমাকে একটা ইমার্জেন্সি একজামিনেশনে বসাই?"

'ও ব্যাটা চাচ্ছিল, আমি যেন স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করি। শুনে ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, "টেরিটোরিয়াল ক্যান্টোরেক, দু'বছর আগে তোমার অত্যাচারেই আমরা সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলাম। তখন জোশেফ বেম নাম লেখাতে চায়নি, মনে আছে তোমার? তুমি না থাকলে ওকে আরও তিনমাস পরে যুদ্ধে যেতে হত, আরও তিনমাস বেশি বাঁচত ও। ওর কথা ভুলে যেয়ো না। এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। তোমাকে কি কি করতে হবে না হবে, সে ব্যাপারে পরে হুকুম দেব। নাউ, ডিসমিস।"

'এরপর প্রথমেই ওর কোম্পানির চার্জ নিলাম আমি। তারপর স্টোরে গেলাম ওকে নিয়ে পোশাক টোশাক পরিয়ে আরেকটু দুরস্ত করে নিতে। দাঁড়া, আর একটু পরেই দেখতে পাবি ওকে।'

সিগারেট শেষ করে অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল ও। বলল, 'চল।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে দেখি সবাই সারি বেঁধে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিটেলস্টেড হাঁক ছাড়ল, 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ।' তারপর গদাই লশকরী চালে হাঁটতে লাগল লাইনের সামনে দিয়ে।

এতক্ষণে চোখ পড়ল ক্যান্টোরেকের ওপর। দেখার সাথে সাথে এত প্রচণ্ড হাসি পেল যে ঠোঁট কামড়ে ধরে হাসি থামাতে হলো কোনরকমে।

রঙ ওঠা নীলচে একটা শার্ট পরেছে ও। শার্টের হাতায় আর পিছনে আবার গাঢ় রং-এর স্টিকার লাগানো। শার্টটা নিশ্চয়ই কোন দৈত্যের জন্যে তৈরি হয়েছিল কারণ ওর মধ্যে আরও গোটা দুই ক্যান্টোরেককে অনায়াসে ঢোকানো যাবে। প্যান্ট যেটা পরেছে ওটা এত খাটো যে কাক তাড়ুয়ার মত লাগছে ওকে।

পুরানো একজোড়া বুট, চামড়া কুঁচকে গেছে, ডগা ভোঁতা, ফিতেগুলো মাটিতে ঝুলে আছে, এরকম অদ্ভুত সাজপোশাক পরে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাথার ওপর ক্যাপ একখানা আছে বটে, কিন্তু ওটা এত ছোট আর নোংরা যে মনে হচ্ছে জুতো পরিষ্কার করার ন্যাকড়া। মিটেলস্টেডের দুরন্ত করার নমুনা দেখে হাসিতে পেট ফেটে যাবার দশা হলো আমার। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলার অবস্থা একেবারে। ফাঁক ফোকর দিয়ে 'কুঁক, কুঁক' করে বেরিয়ে আসছে চেপে রাখা হাসিগুলো।

মিটেলস্টেড হাঁটতে হাঁটতে ক্যান্টোরেকের সামনে গিয়ে থামল।

'এই বোতামগুলো পালিশ করা হয়েছে বলবে?' ক্যান্টোরেকের জামার পেতলের বোতামগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল মিটেলস্টেড, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে তোমাকে কিছু শেখানো যাবে না। অকিঞ্চিৎকর, ক্যান্টোরেক, একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।'

হাসিটা যা-ও বা একটু কমে এসেছিল, এবারে একেবারে বুগবুগ করে ঠেলে বেরিয়ে এল। ঠোঁট কামড়ে আর সামলানো গেল না, মুখে হাতচাপা দিতে হলো হাসি লুকোতে।

শব্দটা ক্যান্টোরেকের আবিষ্কার, স্কুলে মিটেলস্টেডের ক্ষেত্রেই

বেশিরভাগ ব্যবহার করত। কিছু করতে না পারলেই জুটত শব্দটা, 'অকিঞ্চিৎকর, মিটেলস্টেড, একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।'

মিটেলস্টেড এখনও ছাড়েনি তাকে, 'বোয়েকারের দিকে তাকিয়ে দেখো, ওকে দেখেও তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত।'

নিজের চোখকেই আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। বোয়েকারও এখানে? ও আমাদের স্কুলের বেয়ারা। আর ও-ই কিনা ক্যান্টোরেকের আদর্শ! এবারে আর পারলাম না, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লাম আমি। হাসির চোটে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে একটু সুস্থির হয়ে, চোখটোখ মুছে ফিরে তাকাতেই দেখি বাঘের মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যান্টোরেক। পারলে খেয়ে ফেলে আর কি। আমি এমন নিরীহ ভাবে ওর দিকে তাকালাম যেন চিনতেই পারিনি ওকে।

এই সেই ক্যান্টোরেক, যাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখলেই আমাদের থরহরি কম্প শুরু হত। ঘ্যাচঘ্যাচ করে পেন্সিল চালাত আমাদের ফ্রেঞ্চ গ্রামার খাতার ওপর। তারপর শুরু হত তার বাক্যবাণ। অথচ ওর ওই ফরাসী ভাষা কাজে লাগাবার জন্যে ফ্রান্সের ভেতরে ঢোকাই হয়নি এখনও।

মাত্র দু'বছর আগের কথা, অথচ এখন সেই ক্যান্টোরেককে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে আজব একটা চিড়িয়া। অপূর্ব ইউনিফর্ম, কোথায় গেছে সেই হাঁকডাক। বাঁকা হাঁটু, নোংরা ক্যাপ, একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব। ওকে ফ্রন্টে পাঠালে ফরাসীরা হাসতে হাসতেই খুন হয়ে যাবে। আমাদের আর যুদ্ধ করতে হবে না।

ওকে দেখে বুঝলাম, যুদ্ধশেষে ও যদি আবার স্কুলে ফিরে যায়, আর আমরাও যদি ওর ক্লাসে গিয়ে বসি, জীবনেও আর বলতে পারবে না, 'পল বোমার, বলো দেখি ফ্রেঞ্চ গ্রামারের সাথে জার্মান গ্রামারের মূল পার্থক্যটা কি?'

মিটেলস্টেড এবারে প্যারেড করানো শুরু করেছে। জনাদশেকের একটা দল বানিয়ে ওটার লিডার বানিয়েছে ক্যান্টোরেককে। লিডারকে সবসময় দাঁড়াতে হয় তার দলের কুড়ি পা সামনে।

লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে সবাই। ক্যান্টোরেক কুড়ি পা সামনে। মিটেলস্টেড হুকুম দিল, 'অ্যাবাউট টার্ন।'

পুরো দলটা অ্যাবাউট টার্ন হতেই ক্যান্টোরেক ছুটল লাইনের সামনের দিকে। ওখানে পৌঁছুতেই আবার হুকুম হলো, 'অ্যাবাউট টার্ন।'

পুরো দলটা একজায়গায় দাঁড়িয়ে আরামে শুধু এপাশ ওপাশ ঘুরছে আর বেচারা ক্যান্টোরেককে প্রতিটা হুকুমের সাথে সাথে দৌড়াতে হচ্ছে চল্লিশ কদমেরও বেশি।

বেশ খানিকক্ষণ চলল এভাবে। মিটেলস্টেড যখন ক্ষান্ত দিল, ততক্ষণে ক্যান্টোরেকের জিভ ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে।

এটাও অবশ্য ক্যান্টোরেকেরই আবিষ্কার। আর ক্যান্টোরেকও মিটেলস্টেডের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করতে পারে না। স্কুলে থাকতে ও মিটেলস্টেডকে নিয়ে যা করেছে তার তুলনায় এটা কমই বলতে হবে। স্কুলে ক্যান্টোরেক ওকে আকাট মূর্খ, জরদ্গব যাই বলুক না কেন, ফ্রন্টে যাবার আগে প্রতিশোধ নেবার এমন একটা সুযোগ ছেড়ে দেবে, অতটা বোকা নয় ও। আর এমন সুযোগ পাবার পর হাসতে হাসতে মরতে পারে যে কেউ।

এর পরে শুরু হলো বন্দুক নিয়ে ক্রলিং করে সামনে এগোনো। হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগোতে লাগল ক্যান্টোরেক। মিটেলস্টেড গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে। স্কুলে ক্যান্টোরেকের দেয়া উদ্ধৃতিটাই হুবহু শুনিয়ে দিল ওকে, শুধু মিটেলস্টেডের জায়গায় টেরিটোরিয়াল ক্যান্টোরেক লাগিয়ে, 'টেরিটোরিয়াল ক্যান্টোরেক, এক মহান যুগে বাস করার সুযোগ এসেছে আমাদের, এর জন্যে আমাদের রণসাজে সজ্জিত হতে হবে, বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে হবে।'

মাথা তুলে তাকাবার শক্তি পর্যন্ত নেই ক্যান্টারেকের। থুঃ করে মুখের মধ্যে ঢুকে যাওয়া বালি আর কাঠের টুকরোগুলো ফেলল মাটিতে।

মিটেলস্টেড ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন দারুণ একটা কথা বলছে, এমনভাবে বলল, 'অতি ক্ষুদ্র জিনিস হলেও তাকে বিজয়ের স্পৃহা কখনও দমন কোরো না।'

আমি অবাক হচ্ছি, ক্যান্টোরেক কেন ফেটে পড়ছে না রাগে, বিশেষ

করে ফিজিকাল এক্সারসাইজের সময়। হরাইজোন্টাল বারে ক্যান্টোরেক যখন হাতের ওপর ভর দিয়ে ওপরে উঠতে চায়, মিটেলস্টেড তখন পেছন থেকে নিচে টেনে ধরে রাখে। ফলে শুধু চিবুকটা পৌছায় বারের ওপরে, বাকি শরীর ঝুলতে থাকে নিচে। এ সবই ক্যান্টোরেকের আবিষ্কার। মিটেলস্টেড শুধু জানিয়ে দিচ্ছে, আকাট মূর্খ হলেও কিছু কিছু জিনিস বেশ মনে আছে ওর।

'ক্যান্টোরেক, বোয়েকার, এদিকে এসো,' হুকুম দিল মিটেলস্টেড, 'ওই ঠেলাটা নিয়ে বিস্কুটের কারখানা থেকে ঘুরে এসো দু'জনেই।'

ক্যান্টোরেক হাঁপাচ্ছে, কিন্তু বোয়েকার নির্বিকার। ঠেলাটা নিয়ে রওনা হলো দু'জন, শহরের একেবারে শেষ প্রান্তের বিস্কুট কারখানার দিকে।

ওরা চলে যেতেই হাসিতে ফেটে পড়লাম দু'জনে। হাসিটা থামতেই মিটেলস্টেড বলল, 'এরকম আরও কয়েকবার হয়েছে। শহরের লোকেরা এখন অপেক্ষা করে থাকে ওদের জন্যে। এমন দৃশ্য তো পয়সা ফেলেও দেখা যায় না।'

'অপূর্ব,' বললাম আমি, 'কিন্তু রিপোর্ট করেনি তোর নামে?'

'চেষ্টা করেছিল, সুবিধা করতে পারেনি। আমাদের সি ও কথাটা শুনেই হাসতে হাসতে কার্পেটের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছিল। ওসব স্কুলমাস্টারের অভিযোগ শোনার মত সময় কোথায় তার। তাছাড়া ওনার মেয়ের সাথে আমার আবার একটু ইয়ে, মানে...।'

'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না,' বাধা দিয়ে বললাম আমি, 'কিন্তু ধর, আবার যদি তোকে পরীক্ষাতে আটকায় ও?'

'ধুৎ, ও আমার কচু করবে। তাছাড়া প্রমাণ করে দেব যে ওকে যে কাজ দিয়েছি, ওর চেয়ে হালকা কাজ আর হয় না।'

'ওকে একটু ঘষে-মেজে নেওয়া যায় না?'

'ধুর, ও একটা গাধা, ও শেখানোর অযোগ্য,' গম্ভীর গলায় রায় দিল ক্যান্টোরেকের আকাটমূর্খ ছাত্র মিটেলস্টেড।

ছুটিটা আসলে গতানুগতিক স্রোতের মধ্যে একটু বিরতি। ছুটির শেষে

সবকিছু যেন আরও দুঃখময় আর কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিদায়ের বিষণ্ণ ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। মা রোজ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, কিছু বলে না। আমি জানি, মা দিন গুণছে, প্রতিদিন সকালে মায়ের চোখে বিষাদের ছায়া আরও ঘন হয়ে নামে। একটা দিন চলে গেল। আমার মালপত্রগুলো সরিয়ে রেখেছে অন্য ঘরে যাতে চোখে না পড়ে।

ছুটির সময়গুলো বড় তাড়াতাড়ি চলে যায়। একদিন বোনের সাথে মাংসের দোকানে গেলাম যদি দু'এক পাউণ্ড হাড় অন্তত পাওয়া যায়। এসময়ে হাড় পাওয়াটাই বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। গিয়ে দেখি মস্ত লম্বা লাইন। লোকজন সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু'একজন এর মধ্যেই ফিট হয়ে গেছে।

বরাত খারাপ আমাদের। ঘণ্টা তিনেক দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনলাম সব শেষ। শুকনো মুখে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে।

আমাদের অবশ্য একটা সুবিধা আছে, আমি নিয়মিত রেশন পাই। তা দিয়ে প্রচুর না হলেও মোটামুটি ভাল কিছু খাওয়া চলে।

দিন যেতে থাকে, মায়ের চোখে দুনিয়ার দুঃখ এসে ভর করতে থাকে। আর চারদিন মাত্র আছে। আমাকে কেমারিখের মায়ের সাথে একবার দেখা করতে হবে।

কেমারিখের মায়ের সাথে দেখা হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন উনি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও মরে গেল, তোমরা বেঁচে থাকলে কেন।' চোখের পানিতে শার্ট ভিজিয়ে দিলেন আমার। কলার ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'তোমরা তাহলে ওখানে ছিলে কি করতে?' শেষ পর্যন্ত ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে চিৎকার করে বললেন, 'তুমি দেখছিলে তাকে? তুমি ওর শেষ সময় কাছে ছিলে? ও কেমন করে মরল? বলো আমাকে, বলো।'

বললাম, 'গুলিটা সোজা ওর বুকের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। সাথে সাথেই মারা গেল ও।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কেমারিখের মা তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে,

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, আমি জানি সব। আমি জানি ও খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে। প্রতি রাতে ওর গলার আওয়াজ পাই আমি, যন্ত্রণায় মা মা করে ডাকছে। আমাকে সত্যি করে বলো তো কি হয়েছিল, আমাকে জানাও সত্যি করে।'

'যা বললাম তাই ঘটেছিল, কিছু বোঝার আগেই মারা গেছে ও।'

শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন উনি, ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'সত্যি করে বলো কি ঘটেছিল। আমি জানি তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ। কিন্তু তুমি কি বোঝো না, সত্যি কথাটা না জানা পর্যন্ত আমি কি কষ্টে আছি? যা ঘটেছিল বলো আমাকে, যত কষ্টেরই হোক না কেন, বলো। তবু আসল কথাটা জানতে পারব আমি। না জেনে কষ্ট পাবার চেয়ে সে-ও ভাল।'

আমি জানি, আসল কথা বলার সাথে সাথে উনি ভেঙে পড়বেন একেবারে, সে কথা বলাই যাবে না। মনে মনে রাগই হলো ওঁর ওপর। আরে বাবা, এখন এত চিন্তার কি আছে, কেমারিখ তো মরেই গেছে। কিভাবে মরল সেটা জানলেই তো কেমারিখ ফিরে আসছে না। আর যেখানে হাজার হাজার ছেলে মারা যাচ্ছে, সেখানে একজনের জন্যে এত চিন্তার কি আছে। একটু অধৈর্য হয়েই বললাম, 'ও সাথে সাথেই মারা গেছে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই। ওর মুখটা পর্যন্ত শান্ত ছিল তখন।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকলেন কেমারিখের মা, তারপর বললেন, 'তুমি শপথ করে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'যা যা তুমি ভয় পাও, সেগুলোর নামে শপথ করছ?'

হাসি পেল আমার। ভয় পাওয়ার সংজ্ঞা যে কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কথা যদি সত্যি না হয় তাহলে তুমি আর ফিরে আসবে না?'

'আমার কথা সত্যি না হলে আমি আর ফিরে আসব না।'

ওঁকে বিশ্বাস করানোর জন্যে সবকিছুর নামে শপথ করতেও আমি রাজি ছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হলো না। উনি এর মধ্যেই আমার

কথা বিশ্বাস করেছেন।

মুখ নিচু করে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন উনি। তারপর বললেন, 'পুরো ঘটনাটা বলো আমাকে।' সাথে সাথে আমাকে কাল্পনিক একটা ঘটনা তৈরি করে নিতে হলো। এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে বললাম যে নিজেরই প্রায় বিশ্বাস জন্মে গেল, আসলেই বোধহয় ঘটেছিল সেরকম।

ফিরে আসার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কেমারিখের মা আমাকে চুমু খেয়ে ওর একটা ছবি দিলেন আমাকে। সৈনিকের পোশাক পরে বসে আছে। পেছনে আঁকা একটা পাইন গাছের ছবি। সামনে কাঠের টেবিলের ওপর একটা বিয়ারের মগ।

বাড়িতে আমার শেষ বিকেল আজকে। সবাই চুপচাপ। কথা বলছে না কেউ।

সকাল সকাল শুতে গেলাম। বালিশের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম সব কথা। আর কোনদিন এমন পালকের বিছানায় শোবার ভাগ্য হবে কিনা কে জানে।

গভীর রাত্রে আস্তে করে মা এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। মা ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আমিও কথা না বলে নিঃশব্দে শুয়ে থাকলাম। এখন জেগে থাকা, কথা বলা বড় কষ্টের, বড় দুঃখের।

মা চুপচাপ বসে থাকল আমার পাশে, আস্তে করে হাত দিয়ে চুলের মধ্যে বিলি কাটতে লাগল আমার। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যাবার পর আর থাকতে পারলাম না। জানি, মা ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। নড়েচড়ে উঠলাম, ভাব দেখালাম যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙল আমার।

'ঘুমোতে যাও, মা, এখানে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে তোমার।'

'ঘুমোতে তো আমি অনেক পারব, বাবা,' শান্ত, ভেজা গলায় বলল মা।

উঠে বসলাম আমি। বললাম, 'আমি তো এখান থেকে সরাসরি ফ্রন্টে যাচ্ছি না, মা। চার সপ্তাহ থাকব ট্রেনিং ক্যাম্পে। পারলে ওখান থেকে প্রত্যেক রোববারে এসে তোমাকে দেখে যাব আমি।'

নিঃশব্দে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। শান্ত স্বরে মা জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি খুব ভয় লাগে ওখানে?'

'না, মা।'

'ফ্রান্সের মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থাকিস। ওরা ভাল না।'

ওহ্ মা, মা আমার! তুমি এখনও ভাবছ তোমার পল সেই ছোট্টটিই আছে? আমি কেন তোমার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে পারি না, মা! কেন আমাকে বড় হতে হবে? ক'দিন আগেও তো আমি তোমার ছোট্ট পলই ছিলাম, এখনও আমার সেই জামা-কাপড়গুলো ঝুলছে আলমারিতে। মাত্র ক'টা দিন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন চলে যাবে ওগুলো?

গলাটা ভিজে আসতে চায়, তবুও শান্ত স্বরে বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, মা, ওখানে কোন মেয়েই নেই।'

'সাবধানে থাকিস, বাবা।'

মা, মাগো, তুমি আমাকে দু'হাত দিয়ে তোমার বুকে জড়িয়ে রাখো না আমাকে। মরলে তোমার সাথেই মরব আমি। আমি কি তোমার বুকে মাথা রেখে মরতেও পারব না? এত দুর্ভাগ্য আমার?

বললাম, 'আচ্ছা, মা।'

'আমি রোজ তোর জন্যে প্রার্থনা করব।'

মা, সোনা মা আমার, চলো না, মা, ফিরে যাই আগের দিনগুলোতে, তোমার পাশে বসে, তোমার সুরে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।

'আরেকটু কম বিপদের একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবি হয়তো তুই।'

'হ্যাঁ, মা, আমি রান্নাঘর আর ক্যান্টিনের চার্জেও থাকতে পারি। এমন কিছু কঠিন নয় কাজটা পাওয়া।'

'তাই কর, বাবা, অন্যেরা যদি কিছু বলে...।'

'কিচ্ছু বলবে না, মা। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না তুমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মায়ের বুক থেকে। অন্ধকারের মধ্যেও চিকচিক করে উঠল দু'গাল।

'এবারে তুমি ঘুমোতে যাও, মা।'

নিঃশব্দে বসে থাকল মা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার কম্বলটা মায়ের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলাম। মা আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথে মুখ বিকৃত হয়ে গেল ব্যথায়। ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণাটা সহ্য করল কোনরকমে। আস্তে আস্তে হেঁটে বিছানায় নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বসলাম মাথার কাছে।

'এবার যখন বাড়ি ফিরব, তার আগেই কিন্তু তোমার ভাল হয়ে ওঠা চাই।'

'আচ্ছা, বাবা।'

'আর তুমি কষ্ট করে, না খেয়ে জিনিসপত্র পাঠাবে না কখনও আমাকে, আমাদের ওখানে অনেক খাবারদাবার আছে। ওগুলোই খেয়ে শেষ করতে পারি না।'

সর্বস্ব হারানোর ব্যথা নিয়ে শুয়ে আছে মা। আমি তো জানি দুনিয়ার যে কোন জিনিসের চেয়ে মা আমাকে কত বেশি ভালবাসে।

ফিরে আসার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই মা বলল, 'তোর জন্যে দুটো উলের প্যান্ট বানিয়ে রেখেছি, মনে করে ব্যাগে ভরিস। ওখানে শুনেছি খুব ঠাণ্ডা পড়ে।'

মা, মা আমার, তুমি আমাকে এত ভালবাসো কেন, মা, আমার যে কষ্ট হয়! আমি তো জানি, এই প্যান্ট বানাতে তোমাকে হাত পাততে হয়েছে কত জায়গায়, কত হাঁটাহাঁটি আর অপেক্ষার ফসল ওগুলো।

মা, মাগো, তোমার সাথে আমার অনেক কথা ছিল, কথা তো শেষ হলো না। কোনদিন শেষও হবে না আর। আমার ওপর তোমার চেয়ে বেশি দাবি তো আর কারও নেই, মা, তবুও কার জন্যে, কিসের জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে আমার?

চোখের জলে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাই না। কোনরকমে বললাম, 'আসি, মা।'

'আচ্ছা, বাবা।'

ঘরটা অন্ধকার। মায়ের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, টিকটিক করছে দেয়াল ঘড়িটা। বাইরে চেস্টনাটের পাতায় সোনালি বাদামী হাওয়ার তুমুল মাতামাতি।

ঘরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। অসহ্য কষ্ট বুকের মধ্যে যেন মোচড় খেতে লাগল। আঙুল দিয়ে খাটের শিকগুলো আঁকড়ে ধরলাম প্রাণপণে। বালিশটা কামড়ে তুলো বের করে ফেললাম।

কেন এলাম আমি? ফ্রন্টে ছিলাম, আশা ছিল না, ভালবাসা ছিল না, তবু জীবন তো কেটে যাচ্ছিল একরকম। এখন তো আর আমি আগের মত হতে পারব না। সৈনিক ছিলাম আমি, কিন্তু এখন আমি নিজের কাছে পরাজিত, মা, বাবা, বোন সবার জন্যে একরাশ কষ্ট ছাড়া কিছু নই। ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসাই উচিত হয়নি।

আট

যে ট্রেনিং ক্যাম্পে এলাম সেটা আমার ভাল করেই চেনা। এটাই সেই ক্যাম্প যেখানে হিমেলস্টোস জাদেনকে তার সেই বিখ্যাত শিক্ষাটা দেবার চেষ্টা করেছিল। তবে এখানে পরিচিত কেউ নেই বললেই চলে এখন। কদাচিৎ দেখেছি আগে, এমন লোকের সাথে দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে। সবকিছুই বদলে গেছে আগের চেয়ে।

একঘেয়ে দিন কাটতে থাকল। সেই বাঁধাধরা রুটিন সব। বিকেলের দিকে সাধারণত সৈনিকদের কোয়ার্টারে যাই। খবরের কাগজ আসে প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু ওগুলো উল্টেপাল্টে দেখারও ইচ্ছে হয় না। তবে ওখানে একটা চমৎকার পিয়ানো আছে। আমার মূল আকর্ষণ ওটাই। অবশ্য ওখানে দু'জন মেয়ে অ্যাটেনড্যান্ট আছে, একজন আবার অল্পবয়সী এবং সুন্দরী।

পুরো ক্যাম্পটা উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সৈনিকদের কোয়ার্টার থেকে যদি ফিরতে দেরি হয়, তাহলে ক্যাম্পে ঢুকতে সবাইকে পাস দেখাতে হয়। গার্ডের সাথে যাদের খাতির আছে, তাদের কথা

আলাদা।

জুনিপার আর বার্চ গাছের সারি। তার মাঝখানে মাঠের মত জায়গাটুকুতে আমাদের প্রত্যেক দিন ড্রিল করতে হয়। জোরে দৌড়ে সামনে যাই, মুহূর্তে মাটিতে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ি। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। নাকের নিচে ঘাসের ডগা আর ফুলগুলো এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকে। মজাই লাগে দেখতে। অত কাছ থেকে বালির ছোট ছোট কণাগুলো দেখতে আরও ভাল লাগে। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, অসংখ্য ছোট ছোট কণা গায়ে গায়ে লেগে আছে চমৎকারভাবে। ঠিক যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে দেখছি ওগুলো। ইচ্ছে করে আস্তে হাত ঢুকিয়ে দিই ওর ভেতরে।

সবচেয়ে সুন্দর লাগে বার্চ গাছগুলোকে। সারি-সারি গাছগুলো প্রতি মুহূর্তেই রং বদলাচ্ছে। এই দেখা গেল ডালপালা কাণ্ড সব শাদা ধবধবে, যেই পাহাড়ের দিক থেকে মৃদু বাতাস বইল, অমনি রঙ বদলে হয়ে গেল নীলচে। আবার একটা মেঘ যদি ঢেকে দেয় সূর্যকে, মুহূর্তে সব হয়ে গেল কালো।

বাতাসে পাতার ছটফটানিতে ভৌতিক সব ছায়া পড়ে নিচে, সূর্য হেলে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় ছায়াগুলো। একটা জায়গা থেকে দেখলে মনে হয় বিশাল নীল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একসারি রঙ-বেরঙের পতাকা।

এই রঙের খেলা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে এত উদাস হয়ে যাই যে, কমাণ্ডগুলো প্রায় শুনতেই পাই না। নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে প্রকৃতির চেয়ে ভাল বন্ধু আর কেউ নেই। এখানে আমার বন্ধু বলতে কেউ নেই, সত্যি বলতে কি কারও সাথে কথা বলতেও আর ভাল লাগে না এখন। মাঝে মাঝে দু'একটা চুটকি বলা, নয়তো পোকার খেলা, এছাড়া একা একাই থাকি প্রায় সময়।

আমাদের ক্যাম্পের সাথে লাগানো বিশাল বন্দীশিবির। রাশিয়ানদের জন্যে। শিবিরটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ক্যাম্প থেকে আলাদা করা। তবুও ফাঁক-ফোকর গলে প্রায়ই এ পাশে চলে আসে ওরা। প্রায় সবারই লম্বাদাড়ি আর ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা।

চোরের মত ক্যাম্পে ঢুকে ডাস্টবিনে খাবার খোঁজে ওরা। কি পায়, তা ওরাই জানে। কারণ আমাদের নিজেদেরই খাবারের এত টানাটানি যে ডাস্টবিনে ফেলার মত কিছু থাকে না। খাবার যেটুকু দেয় তাতে প্লেট একেবারে চেঁছেপুছে খাওয়ার পরও খিদে থেকে যায়। কেউ যদি কোনসময় বলে যে তার খাবার খানিকটা না হলেও চলবে, সাথে সাথে ডজনখানেক লোকের লাইন পড়ে যাবে তাকে ভারমুক্ত করতে। ডাস্টবিনে যায় বড়জোর তরকারির খোসা, ছাতা পড়া রুটির টুকরো আর যতসব অখাদ্য জিনিসপত্র। তাই নিয়েই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যায় ওদের মধ্যে।

এত কাছ থেকে ওদের দেখতে অবাকই লাগে। ওরা তো আমাদের শত্রু। কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই মনে হয়, এরা সবাই নিরীহ কৃষক। চওড়া কপাল, ছড়ানো নাক-মুখ, শিরা ওঠা হাত, ঘন চুল, একেবারে আমাদের কৃষকদের মতই চেহারা। পরিষ্কার বোঝা যায়, যুদ্ধে আসার আগে ফসল বোনা, ফসল কাটা এসব ছাড়া আর কিছুই করেনি ওরা।

ওরা যেভাবে খাবারের জন্যে হা পিত্যেশ করে, দেখলে কষ্টই লাগে। কিন্তু আমাদেরই এত টানাটানি, ওদের দেব কি। যাতে মরে না যায়, শুধু ততটুকু খাবারই দেয়া হয় ওদের। ফলে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এর মধ্যেই ভালমত পেটের অসুখ বাধিয়ে ফেলেছে বেশির ভাগ। খাবার নেই, তার উপর অসুখ, পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর, হাঁটু বেঁকে গেছে। দু'একটা জার্মান শব্দ যা জানে, তাই ব্যবহার করে খাবার ভিক্ষা করে সবসময়। ওদের কথা শুনলে মনে হয় স্বর্গের কোন উষ্ণ, আরামদায়ক বাড়ি থেকে ভেসে আসছে শান্ত, গভীর সঙ্গীতময় কোন ঐশ্বরিক বাণী।

খাবারের জন্যে ওরা সারাক্ষণ এত ঘ্যানঘ্যান করে যে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাবার দশা হয়। দু'একজন তো লাথি কষিয়ে দেয় সাথে সাথে।

সন্ধ্যার পর ওরা আসে খাবার কিনতে। কেনা মানে, ওদের জিনিসপত্র যা আছে, তার সাথে বদলাবদলী করতে। ওদের কারও

কারও বেশ ভাল ভাল জিনিসপত্র আছে। ওদের হাঁটু পর্যন্ত ফিতে দেয়া নরম চামড়ার জুতো দেখলে লোভ হয়। ওগুলোর দাম দুটো কি তিনটে বিশাল সাইজের রুটি নয়তো একটা রুটি আর এক টিন শুয়োরের মাংসের সসেজ।

তবে ওদের বেশির ভাগই এতদিন ধরে এ কাজ করছে যে, এখন আর দেবার মত তেমন কিছুই নেই। নিজেরা পরে আছে ছেঁড়া ময়লা পোশাক, পায়ে দেবার মত কিছু নেই। ফ্রেয়ার নয়তো গোলার খোল থেকে পাওয়া তামার রিঙগুলো দিয়ে রুটি কেনে এখন। এসব সংগ্রহ করতে যত বিপদই থাক না কেন, এগুলোর দাম বড়জোর দুই কি তিন টুকরো রুটি।

আমাদের মধ্যে যাদের বাড়ি থেকে এটা সেটা আসে তারাই শুধু এই কেনাবেচা করতে পারে। আর আমাদের লোকগুলো দর কষাকষিতে ওস্তাদ। জিনিস কেনার সময় রুটির একটা টুকরোয় বেশ করে সসেজ মাখিয়ে যার কাছ থেকে কিনবে, ওর নাকের ডগায় ধরে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিভের জল গড়িয়ে পড়ে। এর পরে কি আর ওদের পক্ষে জিনিস না দিয়ে থাকা সম্ভব? জিনিসটা পাবার পরে পকেট থেকে ধীরে সুস্থে একটা ছুরি বের করে পরিমাণমত রুটি কেটে দেয় ওদের। এসব দেখলে মনে হয়, এক ঘুসিতে আমাদের লোকদের নাক-মুখ ভোঁতা করে দিই। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের কি ব্যবহার!

প্রায়ই আমার দায়িত্ব পড়ে, রাঁশিয়ানদের পাহারা দেবার। অন্ধকারে ওদের দেখে মনে হয়, বিশাল অসুস্থ বক। ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। বেড়ার ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে দিগন্তের দিকে। কেউ হয়তো কদাচিৎ দু'একটা ছোট্ট কথা বলে, তারপর আবার চুপচাপ। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়া ওদের ছেঁড়া পোশাক উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমার মনে হয়েছে আমাদের চেয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব অনেক বেশি। এর কারণ অবশ্য এ-ও হতে পারে যে ওরা আমাদের চেয়েও বেশি দুর্ভাগা। তবে ওদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা, মুক্তির অথবা অনাহারে, অসুখে মৃত্যুর।

রাত হলেই কাঁটাতারের বেড়ার সাথে সারি সারি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। একজন সরে গেলে সাথে সাথে আরেকজন এসে দখল করে জায়গাটা। চুপচাপ থাকে সবাই। মাঝে মধ্যে সিগারেটের পোড়া টুকরো বের করে কেউ কেউ।

আমি অন্ধকারে তাকিয়ে থাকি। বাতাসে দাড়িগুলো উড়তে থাকে ওদের। অন্ধকারে মধ্যযুগীয় কোন সন্ত বলে মনে হয় তখন।

ওদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। শুধু জানি ওরা বন্দী, আর এটাই আমাকে কষ্ট দেয় সবচেয়ে।

ওদের জীবন এখন পরিত্যক্ত, বিবর্ণ। যদি আরও কিছু জানতে পারতাম ওদের সম্পর্কে, ওদের নাম, ওরা কিভাবে থাকত, কিসের জন্যে অপেক্ষা করে আছে, ওদের সমস্যা কি ছিল। মনে হয়, এসব জানলে ওদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হতে পারতাম আমি। কিন্তু আমার সামনে এখন সৃষ্টির ধ্বংস, মানুষের নিষ্ঠুরতা আর দিগন্তবিস্তৃত বিষণ্নতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

একটা মাত্র শব্দ এইসব শান্ত মানুষগুলোকে আমাদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছে, আবার একটা মাত্র শব্দে ওরা আমাদের বন্ধু হয়ে যেতে পারে। শব্দের এত শক্তি, মানুষটা কিছুই না? কোথায়, কবে কোন টেবিলে একটা কাগজে স্বাক্ষর হলো, আমরা জানলাম না, ওরা জানল না, অমনি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠল একে অন্যকে ধ্বংস করা। আমরা এতদিন একসাথে থাকলাম, সে পরিচয় মুছে গেল এক নিমেষে। এইসব শান্ত শিশুর মত সরল লোকদের দেখিয়ে কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে ওরা আমাদের পরম শত্রু? ওদের চেয়ে একজন ননকমিশনড্ অফিসারও একজন নতুন রিক্রুটের বড় শত্রু, একজন স্কুলমাস্টারও একজন ছাত্রের বড় শত্রু। তার পরেও ওদেরকে গুলি ছুঁড়তে হবে আমাদের দিকে, আমাদের ছুঁড়তে হবে ওদের দিকে।

চিন্তাগুলো মাথায় আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলাম সাথে সাথে। ওসব চিন্তা করার সময় এটা নয়। আর তারপরই কেঁপে উঠল সারা শরীর, হার্টবিট বেড়ে গেল দ্রুত, শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল। পেয়ে গেছি আমি, ফ্রন্টে গোলার গর্তে

শুয়ে, ট্রেঞ্চে মুখ লুকিয়ে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস হতে দেখে যে জিনিস আমি খুঁজেছিলাম, পেয়ে গেছি। তা হলো যুদ্ধের পরে নতুন জীবনের সন্ধান।

এ সমস্ত চিন্তা আমি ভুলব না। এগুলো রেখে দেব আমার মনের গহীনে। ঘুমিয়ে থাক ওরা। যুদ্ধশেষে যখন ফিরে যাব এই নরক থেকে, তখন আবার জাগিয়ে তুলব ওদের। ওদের মধ্যেই আছে আমার নতুন জীবনের নির্দেশ। এখন ওদের কথা ভাবলে কোন অতল গহ্বরে যে হারিয়ে যাব আমি, তার ঠিক নেই।

পকেট থেকে সিগারেটগুলো বের করলাম। প্রতিটা সিগারেট দু'টুকরো করে রাশিয়ানদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে টুকরো ধরিয়ে দিলাম। নিচু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল ওরা। সিগারেটগুলো জ্বালিয়ে নিয়ে টানতে শুরু করল।

অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে এল। প্রত্যেকের মুখে এখন জ্বলন্ত এক টুকরো আগুন, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। অনেকটা হালকা মনে হলো নিজেকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, বিস্তীর্ণ শস্যখেতের ওপারে, বহুদূরের কোন গ্রামের শান্ত কুটিরের জানালায় জ্বলছে শান্তির প্রদীপ।

ভোরের কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো এখনও ঠিকমত পৌঁছয়নি পৃথিবীতে। শবযাত্রায় চলেছি আমি। একজন রাশিয়ান মারা গেছে রাতে। প্রায় প্রতিদিনই একজন না একজন মারা যাচ্ছে। ওদের কয়েকজনের কাঁধে কফিন, পিছনে পিছনে অন্যরা। আমি আর কয়েকজন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছি। কুয়াশার মধ্যে সবকিছু অবাস্তব, অশরীরি প্রেতাত্মা মনে হচ্ছে।

শোকসঙ্গীত গাইতে শুরু করল ওরা। এমনভাবে গাইতে লাগল যেন ওরা কোন শব্দ উচ্চারণ করছে না, কিন্তু বহুদূরের অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে অপার্থীব সঙ্গীতময় সুর। শিরশির করে উঠল শরীরের মধ্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সবকিছু।

সন্ধ্যায় আবার সবাই দাঁড়াল কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে। চুপচাপ। পাহাড়ের ওপার থেকে ভেসে আসছে ভেজা বাতাস।

ম্লান চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

ওদের মধ্যে যারা ভাঙাভাঙা জার্মান বলতে পারে, তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ হয়েছে আমার। ওদের মধ্যে একজন বেহালা বাদক আছে, ও নাকি যুদ্ধের আগে বার্লিনে বেহালা বাজাত। যখন শুনল আমি পিয়ানো বাজাতে জানি, তখন ঘরের মধ্যে থেকে ওর বেহালাটা নিয়ে এল। বাকিরা বেড়ার সাথে ঠেস দিয়ে বসল মাটিতে। ও দাঁড়িয়ে ছড় লাগাল বেহালার তারে।

বাজাতে বাজাতে চোখ মুদে এল ওর, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। শিল্পীর স্বভাবই এরকম।

ও যে সুরগুলো বাজাতে লাগল তার বেশির ভাগই লোকসঙ্গীত। বাকিরা ঠোঁট চেপে সুর মেলাল ওর সাথে। বেহালার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল চারধারে, আস্তে আস্তে পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে ছড়িয়ে গেল আরও দূরে, নেমে গেল মাটির গভীরে। বিষণ্ণ চাঁদের আলো, হাওয়ার মাতামাতি, তার মধ্যে কেঁদেই চলেছে বেহালা।

কোন রোববারেই আমি ছুটি পেলাম না, কারণ আমি লম্বা ছুটি কাটিয়ে এসেছি। তাই ফ্রন্টে যাবার আগের রোববারে বাবা আর এর্না এল দেখা করতে।

সারাদিন আমরা সৈন্যদের কোয়ার্টারে কাটালাম। ভুলেও ক্যাম্পের দিকে নিয়ে গেলাম না ওদের। বিকেলের দিকে উপত্যকার ওদিকে গেলাম বেড়াতে।

আমার কাছে প্রতিটা ঘণ্টাকে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার বলে মনে হলো। বলার মত কোন কথাই খুঁজে পাই না। শেষে মায়ের অসুখ নিয়ে কথা শুরু করলাম। ডাক্তাররা এখন নিশ্চিত যে ওটা ক্যান্সার। মা এখন হাসপাতালে আছে, খুব শিগ্‌গিরই অপারেশন হবে। ডাক্তার অবশ্য বলেছে চিন্তার কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু ক্যান্সার থেকে কে কবে ভাল হয়েছে, ঈশ্বরই জানেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'মা এখন কোথায় আছে?'

'লুইসা হাসপাতালে,' উত্তর দিলেন বাবা।

'কোন্ ক্লাসে?'

'থার্ড ক্লাসে। অপারেশন করতে কত খরচ পড়বে না জানা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতে হবে। আর মা-ও ওখানে থাকতে চাইল, বলল ওখানে লোকজন আছে, কথা বলা যাবে, আর খরচও কম পড়বে,' বলল এর্না।

'তার মানে ওই চেঁচামেচির মধ্যে থাকছে এই তো? একটু যদি শান্তিতে ঘুমোতে পারে ওখানে, তাহলেই হয়।'

বাবা ম্লান হাসলেন একটু, বাবার চোখমুখ বসে গেছে, কপালে অসংখ্য বলিরেখা। মা-তো অনেকদিন থেকে অসুস্থ আর হাসপাতালে একেবারে শেষ অবস্থায়। কত যে খরচ হয়েছে আর কত যে হবে, সে তো আমি বুঝি। এই খরচ জোগাতে বাবার জীবনটা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা বাবাকে দেখলেই বোঝা যায়।

চিন্তাজড়িত গলায় বাবা বললেন, 'খালি খরচটা কত পড়বে এটা জানতে পারলে হত।'

'জিজ্ঞেস করেছিলে কত খরচ পড়বে?'

'সরাসরি তো করিনি, ডাক্তার যদি আবার কিছু মনে করে অপারেশন না করে?'

ঠোঁট কামড়ালাম আমি। তিক্ততায় ভরে উঠল মন। গরীবদের এই এক সমস্যা। খরচ কত হবে সেই চিন্তায় মারা যাবে কিন্তু সাহস করে সেটা জিজ্ঞেসও করতে পারবে না, যদি ডাক্তার কিছু মনে করে বসে, সেই ভয়ে। অথচ খরচ যাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়, তারা অনায়াসে জিজ্ঞেস করে নেয়, ডাক্তাররাও কিছু মনে করে না।

বাবা বললেন, 'অপারেশনের পরে ড্রেসিংয়েই অনেক খরচ।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ইনভ্যালিড ফাণ্ড থেকে কিছু পাওয়া যাবে না?'

'সে সব তো কবেই নেয়া হয়ে গেছে, মায়ের অসুখ কি আর আজকে থেকে!' বলল এর্না।

বাবা মাথা নাড়ালেন, 'দেখি, ওভারটাইম করে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।'

আমি জানি এ কথার মানে কি। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হবে কারখানায়। আটটার দিকে জঘন্য কিছু পেটে পড়বে, তারপর প্রচণ্ড

মাথাব্যথা নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাসায় ফিরবে একটার দিকে। পরদিন ভোরেই আবার ছুটতে হবে কারখানায়।

সময়টা যেন আরও কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত আমি সৈনিকদের মধ্যে চালু কয়েকটা চুটকি শোনালাম এর্নাকে। হাসল ওরা।

যাবার সময় হয়ে গেল ওদের। স্টেশনে গেলাম ট্রেনে তুলে দিতে।

'ওহ্ হো' ভুলেই গিয়েছিলাম আরেকটু হলে, এর্না ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'মা তোর জন্যে দিয়েছে এগুলো।'

ব্যাগ থেকে ও বের করল এক শিশি জ্যাম আর আলুর কেক।

ট্রেনটা চোখের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম প্ল্যাটফর্মে। চোখের আড়ালে যেতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। জানি না আর কোনদিন ওদের সাথে দেখা হবে কি না।

বিকেলে কেক আর জ্যামের শিশিটা বের করলাম। খাবার ইচ্ছে নেই একেবারেই, তবু একটু মুখে দিলাম। ভাল লাগল না। ওগুলো ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক করেছি, রাশিয়ানদের দিয়ে দেব। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ মনে পড়ল, মা অসুস্থ শরীরে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে শুধু আমার জন্যেই ওগুলো বানিয়েছে। ফিরে এলাম আবার। আর সব রেখে দিয়ে শুধু দুটো কেক নিয়ে রওনা দিলাম বন্দী শিবিরের দিকে।

নয়

কয়েকদিন ধরে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, রাস্তা আর শেষ হয় না। আকাশে প্লেন দেখে একসময় বুঝলাম ফ্রন্টের কাছাকাছি এসে গেছি। রাস্তায় কামানের সারি, সব ফ্রন্টের দিকে রওনা দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম ক্যাম্পে। পৌঁছেই খোঁজ করলাম আমাদের রেজিমেন্টের। কেউ ঠিকমত বলতে পারে না কোথায় আছে। সবারই

উত্তরের সাথে একটা 'বোধহয়' লাগানো। শেষে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বোঁচকা বেঁধে আন্দাজমত রওনা দিলাম একদিকে। কিন্তু যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে ওরা নেই। শুনলাম, আমাদের রেজিমেন্টকে নাকি একটা ফ্লাইং রেজিমেন্ট করা হয়েছে। এর মানে হলো, আজ এখানে, কাল ওখানে, যেখানে যখন দরকার। শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। শোনা গেল আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা নাকি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। আমি কাট, ক্রপ এদের কথা জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেউ বলতে পারল না ওদের কথা।

আবার আন্দাজমত বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমি যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, জানি না তারা বেঁচে আছে কি নেই।

এক রাতে রেডইণ্ডিয়ানদের মত আগুন জ্বেলে রাত কাটালাম। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া গেল ওদের। সন্ধ্যার সময় গিয়ে পৌঁছলাম জায়গামত।

পৌঁছেই আর্দালি রুমে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। সার্জেন্ট মেজরের কাছে শুনলাম আমাদের কোম্পানি এখন ফ্রন্টে, দু'দিন পরে ফিরবে। বসে বসে গল্প করতে লাগলাম তার সাথে।

সার্জেন্ট মেজর জিজ্ঞেস করল, 'ছুটি কেমন কাটল? দারুণ, তাই না?'

'মোটামুটি।'

'হুঁ, তাই। আসলে যদি ফিরতে না হয়, তাহলেই মজা পাওয়া যায়। তা না হলে ছুটির অর্ধেক দিনগুলোর আনন্দ, শেষের অর্ধেক দিনগুলোর দুঃখেই ধুয়ে মুছে যায়।'

হাসলাম আমি, কি বলার আছে আর!

দু'দিন ঘুরেফিরে বেড়ালাম এদিক ওদিক। তৃতীয় দিন সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই টের পেলাম, ফিরেছে আমাদের রেজিমেন্ট। ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে। ভিড়ের মধ্যে খোঁজা শুরু করলাম ওদের। মনের মধ্যে যে কি তোলপাড় হচ্ছে সে আমিই জানি। ওরা আছে তো?

পেয়েছি, জাদেন, তার পাশে নাক উঁচু করে আসছে মুলার। ধক

করে উঠল বুকের মধ্যে। কাট আর ক্রপ কোথায়? আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলাম। নেই। প্রচণ্ড কষ্টে ব্যথা করে উঠল গলার কাছে। ফিরতে যাব, দেখি দু'জন একেবারে পেছনে, হেলেদুলে আসছে। কয়েক মুহূর্ত হাত পা নাড়াতে পারলাম না, তারপরই চিৎকার করে উঠলাম, 'জাদেন, কাট।'

চারজনেই ফিরে তাকাল, একসাথে। ছুটে গেলাম ওদের দিকে। ওরাও ছুটে এল আমার দিকে। একে একে জড়িয়ে ধরল সবাই। উচ্ছ্বাস কাটার পর কাট জিজ্ঞেস করল, 'কবে এলে?'

'এই তো দু'দিন হলো।'

'ছুটি কেমন কাটল?'

'মোটামুটি। চলো, বসি কোথাও।'

একটা খড়ের গাদার পাশে গিয়ে বসলাম সবাই। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, আর একটা লজ্জা লজ্জা ভাব চেপে ধরল আমাকে। হয়তো ছুটি কাটিয়ে আসার পর এরকম হয় সবারই।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'দাঁড়াও, আসছি।' একছুটে ঘর থেকে অবশিষ্ট জ্যাম আর কেকগুলো নিয়ে এলাম।

কেকের বাইরের দিকে ছাতা পড়ে গেলেও খাওয়া যাবে। ওগুলো নিজের জন্যে রেখে ভালগুলো ওদের দিলাম।

এক কামড়ে আধখানা কেক মুখে চালান করে দিল কাট। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মায়ের বানানো?'

মাথা নাড়লাম।

'মুখে দিয়েই বুঝেছি, চমৎকার জিনিস।'

কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। ছলছল করে উঠল চোখদুটো। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকিয়ে সামলে নিলাম নিজেকে।

সারাদিন একসাথে কাটালাম আমরা। অনেক দিন পরে যেন বাড়ি ফিরে এসেছি, এরকম লাগছে এখন।

রাতে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তেই রাজ্যের ঘুম এসে নামল চোখের পাতায়।

'পল, জেগে আছিস?' ফিসফিস করে ডাকল ক্রপ।

'উঁ।'

'আমাদের ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে। শুনলাম আমরা নাকি রাশিয়া যাচ্ছি।'

'হুঁ,' বলেই পাশ ফিরলাম। রাশিয়া, ভালই, ওখানে যুদ্ধ বোধহয় তেমন করে শুরুই হয়নি।

ফ্রন্টে গোলা ফাটার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

ঘষামাজার ধুম পড়ে গেছে ক্যাম্পে। মনে হচ্ছে, সবকিছু একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমেছে সবাই। আর দিনের মধ্যে দশবার করে ইন্সপেকশনে আসছে। ছেঁড়াখোঁড়া ভাঙাচোরা যা ছিল, সব বদলে দিচ্ছে। একেবারে আনকোরা নতুন একটা টিউনিক জুটেছে কপালে। কিন্তু আমাদের ওস্তাদ কাট ওস্তাদি দেখিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছু নতুন বাগিয়েছে। দেখা হলেই অনাবিল একটা হাসি উপহার দিচ্ছে সে।

এতসব মাজাঘষার কারণ কিন্তু জানি না এখনও। একেক সময় একেক গুজব শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে শান্তি আসছে, কেউ বলছে, এবার রাশিয়া পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছে। শেষেরটাই সত্যি হবার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু তার জন্যে এত নতুন জিনিসপত্রের দরকার কি, বুঝলাম না ঠিক। নতুন পোশাক পরে গেলেই তো আর রাশিয়ান মেয়েরা ছুটে আসছে না আমাদের গলায় মালা দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, কাইজার আসছেন পরিদর্শনে। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো সবকিছু।

পুরো আটটা দিন বলতে গেলে বেস-ক্যাম্পে কাটালাম। সারাদিন শুধু ড্রিল আর প্যারেড। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গেছে সবাই। এতদিন পরে নতুন কাপড়চোপড় পরে সঙ সেজে প্যারেড করা ফ্রন্টে থাকার চেয়েও অসহ্য।

অবশেষে সেই মহালগ্নটা এল। সবাই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কাইজার এলেন। আমাদের সবারই প্রচণ্ড কৌতূহল কেমন দেখতে উনি। লাইনের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে গেলেন, কিন্তু

দেখে একটু হতাশই হলাম। ছবি দেখে মনে মনে ভেবেছিলাম লম্বা-চওড়া মস্তবড় পালোয়ান মার্কা শরীর, বজ্রকণ্ঠ। কিন্তু কল্পনার সাথে মিলল না কিছুই।

কাইজার কিছু আয়রন ক্রস বিতরণ করলেন। তারপর ছোটখাট একটা ভাষণ দিয়ে বিদায় নিলেন। আমরাও মার্চ করে চলে এলাম।

আমরা ক'জন একসাথে হতেই জাদেন অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এই হলো অল হাইয়েস্ট? এঁর সামনেই সবাইকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াতে হয়, এমনকি হিণ্ডেনবার্গকেও?'

'অবশ্যই,' জোর গলায় বলল কাট।

'তার মানে একজন রাজাকেও সম্রাটের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে থাকতে হয়?'

একটু থতমত খেয়ে গেলাম আমরা। দৃশ্যটা কেন যেন ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

'ওসব রাজরাজড়ার কথা বাদ দাও,' একটু ঝাঁঝের সাথে বলল কাট, 'তোমাকে তাঁর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এটুকুই তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

কিন্তু জাদেনের পেটের মধ্যে এত প্রশ্ন জমা থাকে যে একবার বেরোনো শুরু করলে আর থামাথামি নেই।

বলল, 'কিন্তু একটা জিনিস আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে সম্রাটও আমাদের মত ল্যাট্রিনে যায়।'

'তোমার বুটজোড়া বাজি ধরতে পারো।'

'চারের সাথে তোমার বুদ্ধি যোগ করলে সেন্ট পারসেন্ট পাগলামি হয়,' খেপে উঠল কাট, 'তোমার মাথার মধ্যে গোবর পচে গেছে, যাও, ল্যাট্রিনে গিয়ে পরিষ্কার করে এসো।'

জাদেন চলে গেল। ল্যাট্রিনেই গেল কি না কে জানে!

'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝি না,' শুরু করল ক্রপ, 'কাইজার যদি বলতেন "না", তাহলে যুদ্ধ হত কিনা।'

'হতই,' আমি বললাম, 'সে তো যুদ্ধের বিপক্ষেই ছিল।'

'আচ্ছা, ধরো আরও বিশ অথবা তিরিশ জন যদি "না" বলত,

তাহলে কি যুদ্ধ হত?'

'তাহলে বোধহয় হত না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ওদের বেশির ভাগই "হ্যাঁ" বলেছে।'

কাট শুরু করল, 'আমার মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে, আমরা তো আমাদের পিতৃভূমি রক্ষা করতে যুদ্ধ করছি, ফরাসীরাও তাই, তাহলে কোন্‌টা ঠিক?'

'সম্ভবত দুটোই,' আমি বললাম।

'বেশ,' কথার খেই ধরে শুরু করল ক্রপ, সাথে সাথে বুঝলাম ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি, 'কিন্তু আমাদের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা, খবরের কাগজ, সবাই তো বলে যাচ্ছে, শুধু আমরাই ঠিক কাজটি করছি।' তাহলে কার কথা ঠিক?'

'জানি না,' শুরুতেই আত্মসমর্পণ করলাম আমি, 'কিন্তু যাই হোক না কেন যুদ্ধ হচ্ছে এটাই সত্য কথা। আর খেয়াল করছ, প্রত্যেক মাসে কত নতুন নতুন দেশ জড়িয়ে পড়ছে যুদ্ধে?'

দূরে দেখা গেল জাদেনকে, দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আসছে। কাটের কথা রেখেই এল কিনা কে জানে। এসেই শুরু করল তার প্রশ্ন, 'আচ্ছা, যুদ্ধ বাধে কি করে?'

'অধিকাংশ সময়ই যখন কোন দেশ অন্য দেশকে ভালমত অপমান করে, তখন,' উত্তর দিল ক্রপ।

জাদেনের চোখমুখ ঝুলে পড়ল। যেন উচ্চমার্গের কথাবার্তা, কিচ্ছু বুঝছে না এমন ভাব করে বলল, 'দেশ? আমার মাথায় তো ঠিক ঢুকল না। জার্মানির একটা পাহাড় কি করে ফ্রান্সের একটা পাহাড়কে অপমান করবে? কিংবা নদী, বনজঙ্গল, খেতখামার?'

'তোর মাথার মধ্যে ঝামা পাথর ঠাসা,' খেপে উঠল ক্রপ, 'পাহাড়, নদী এসবের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে যখন কোন মানুষ অন্য দেশের মানুষকে...।'

'মানুষ? তাই বলো,' বাধা দিয়ে বলে উঠল জাদেন, 'তাহলে যাই, এখানে আমার কোন কাজ নাই। আমাকে তো কেউ অপমান করেনি।'

'তোর তো গণ্ডারের চামড়া, মান অপমান শব্দগুলো তোর জন্য না।'

'তাহলে বসে থেকে কি করব, বাড়িতে যাই।' ওর কথা শুনে হেসে উঠল সবাই।

'আসলে ও বুঝিয়েছে-জনগণ, রাষ্ট্র এসব,' ব্যাখ্যা করল মুলার।

'রাষ্ট্র তাই না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল জাদেন, 'তার মানে পুলিস, ট্যাক্স এই তো? তাই যদি হয় তো আর কোন কথা নেই।'

'সাবাস, জাদেন,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কাট, এতদিনে একটা কথার মত কথা বলেছিস্। তোর মাথায় দেখছি বেরেন আছে। রাষ্ট্র আর পিতৃভূমির মধ্যে অনেক তফাৎ।'

'কিন্তু তাহলেও একটা ছাড়া আরেকটা থাকে না।'

'মানলাম, কিন্তু তার পরেও ভেবে দেখো আমাদের কথা। আমরা কারা? অধিকাংশই সাধারণ লোক, তাই তো? ফ্রান্সের কথা ভাব, ওরাও অধিকাংশই আমাদের মত সাধারণ লোক। তাহলে ওইসব সাধারণ লোকের কি দরকারটা পড়েছে আমাদের মত সাধারণ লোককে আক্রমণ করার? আসলে আমরা ওরা কিছু না, এটা যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের ব্যাপার। কই, যুদ্ধে আসার আগে তো কোনদিন কোন ফরাসীকে দেখিনি? ওরাও নিশ্চয়ই তাই।'

'কিন্তু তাহলে যুদ্ধটা হচ্ছে কেন?'

'কে জানে,' কাঁধ ঝাঁকাল কাট, 'অনেক লোক আছে, যুদ্ধ লাগলে যাদের হাসি কান পর্যন্ত পৌঁছয়, তাদের জন্যে হয়তো।'

'জাদেন বলল, 'আমার তো পৌঁছয় না।'

'তোমারও পৌঁছয়, তবে খাবার দেখলে। তা যাক, সোজা কথা যুদ্ধ করে তোমার আমার কোন লাভ হচ্ছে না।'

'তাহলে কার লাভ হচ্ছে? আমার তো মনে হয় স্বয়ং কাইজারেরও না। তার তো সবই আছে। যা চায় তাই পায়, তাহলে?'

'আমার মনে হয় কাইজারের লাভ আছে, কারণ এটা ছাড়া কোন যুদ্ধই করতে হয়নি তাকে। যুদ্ধ না হলে সম্রাটেরা বিখ্যাত হবেন কি করে? ইতিহাস বইয়ে দেখোনি এসব?'

এতক্ষণে মুখ খুলল ডেটারিং, 'জেনারেলদের বিখ্যাত হবার জন্যেও যুদ্ধ দরকার।'

'এমনকি কোন কোন সময় সম্রাটের চেয়েও বেশি বিখ্যাত হয়ে যায় ওরা।'

'যুদ্ধ করে মরি আমরা, আর ফায়দা লোটে যতসব চাটার দল,' রাগে গজগজ করতে করতে বলল ডেটারিং।

ক্রপ যেন একটা সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আসলে এটা একটা অসুখের মত, কেউ আমরা চাই না, তারপর একদিন দেখা গেল ধরে ফেলেছে সবাইকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওরা তো মিথ্যে কথায় শয়তানকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে। বন্দীদের কাছ থেকে পাওয়া লিফলেটগুলো দেখেছ? বলেছে আমরা নাকি বেলজিয়ামে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ধরে ভেজে খেয়েছি। ব্যাটাদের ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকানো উচিত। এরাই আসল শয়তান।'

'তাও ভাল যে যুদ্ধটা এখানে হচ্ছে। আরও ভেতরের দিকে হলে যে কি হত! গোলার গর্তগুলো দেখেছ?'

'তা ঠিক,' জাদেন বলল, 'তবে যুদ্ধ বোধহয় এর চেয়ে আর ভাল হয় না।'

জাদেন বেশ গর্বের সাথে এর ওর দিকে তাকাতে লাগল। ভাবখানা এমন যে, কি, যা যা বললাম, উত্তর তো দিতে পারলে না কোনকিছুরই।

ক্রপ শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। ঝাঁজাল স্বরে বলল, 'ওই সব প্যাচাল পেড়ে কোন লাভ নেই।'

'ঠিক তাই, কোন লাভ নেই,' সায় দিল কাট।

সন্ধ্যার মধ্যেই যা কিছু নতুন পোশাক-আশাক, জিনিসপত্র দিয়েছিল আমাদের, সব ফিরিয়ে দিতে হলো। ওগুলো শুধু দেখানোর জন্যে দেয়া হয়েছিল।

ছেঁড়া পোশাক পরে, নতুন পোশাকগুলো জমা দিয়ে ফেরার পথে কাটের দিকে আড়চোখে একবার তাকালাম।

রাশিয়া তো দূরের কথা, ওর ধারে কাছেও যেতে হলো না আমাদের। সেই ফ্রন্টেই পাঠাল আবার।

রাস্তাটা চলে গেছে একটা বনের মধ্যে দিয়ে। কিছুদূর ঢুকতেই দেখি গভীর একটা গর্ত, তার চারপাশে গাছপালা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। মাটিতে মনে হচ্ছে বারকয়েক লাঙল চালানো হয়েছে।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল।

'ভারি কামান মনে হয়,' মন্তব্য করলাম আমি।

'ট্রেঞ্চ মর্টার,' সংশোধন করে দিল কাট। উঁচু একটা গাছের ডালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখো।'

দেখেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখটা। গাছের ডালে আটকে আছে একটা লাশ। শরীরে কোন কাপড় নেই। হেলমেটটা এখনও খুলির সাথে লাগানো আছে। শরীরের ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত আছে, বাকিটুকু অদৃশ্য হয়ে গেছে। পচা মাংস গলে গলে পড়ছে।

'কেমন করে হলো এটা?' কাটের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'ওর জামা-কাপড় পর্যন্ত উড়ে গেছে।'

কাট বলল, 'আগেও দেখেছি এরকম। মর্টারের ধরনই এই। গোলা ফাটার সাথে সাথে এমন প্রচণ্ড ঝটকা মারে যে ,জামা-কাপড় ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

গাছের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজলাম। দেখি কাটের কথাই ঠিক। ইউনিফর্মের টুকরো ঝুলছে এ-ডালে ও-ডালে। একটা ডালে রক্তমাংসের দলা, ওর মধ্যে একটা বুট দেখে বুঝলাম ওটা একটা পা ছিল একসময়। আরেক জায়গায় দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছে একজন, সারা শরীরে শুধু একটা অন্তর্বাস আর গলায় টিউনিকের কলার ছাড়া কিছুই নেই। পোশাকের ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো সব গাছের ডগায়। হাত দুটোর একটা গাছে, একটা বিশ গজ দূরে ঝোপের মধ্যে। মনে হচ্ছে হাত দুটো টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। রক্তে কালো হয়ে আছে মাটি। পায়ের কাছে মাটি ক্ষতবিক্ষত। স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কিভাবে পা ছুঁড়েছে মরার আগে।

মন থেকে হাসিখুশি ভাবটা একেবারেই চলে গেল। কাটকে বললাম, 'ভয়ঙ্কর অবস্থা।'

ও উত্তর দিল, 'পেটে আঘাত পাবার চেয়ে বেশি নয়।'

'বেশি ভয় পাবার কিছু নেই,' আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল জাদেন।

এ সমস্তই হয়তো অল্প সময় আগেই ঘটেছে। কে জানে আমাদের ভাগ্যেও আছে কিনা এসব। মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলাম চিন্তা-ভাবনাগুলো।

স্ট্রেচার বাহকদের পোস্ট আসতেই জানিয়ে দিলাম ওদের। এবারে যা কিছু করণীয় তার দায়িত্ব ওদের। আমরা এগিয়ে গেলাম সামনে।

ঠিক হয়েছে, ফরাসীদের ফ্রন্ট লাইনের নাড়িনক্ষত্র জেনে আসার জন্যে একটা সন্ধানী দল পাঠানো হবে।

ছুটি কাটিয়ে আসার পর থেকে ওদের প্রতি কেন যেন প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ বোধ করছি আমি। কারণটা বুঝলাম না। তাই খবরটা জেনেই আগ বাড়িয়ে নিজের নামটা ঢুকিয়ে দিলাম ওদের সাথে। বিকেলের দিকে একসাথে ঘণ্টাখানেক বসে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব ঠিক করে নিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নামতেই বেরোলাম আমরা। কাঁটাতারের বেড়ার ফোকর গলে ওপাশে চলে এলাম। তারপর প্ল্যান অনুযায়ী যার যার মত রওনা দিলাম বুকে হেঁটে।

খানিকক্ষণ পরে সামনে পড়ল ছোট একটা গর্ত। হালকা ধরনের কোন গোলা পড়েছিল বোধহয় ওখানে। গুড়ি মেরে নেমে গেলাম ওর ভেতরে। আস্তে করে মাথাটা একটু উঁচু করে তাকালাম সামনে।

যক্ষ্মারোগীর মত একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে কেশেই চলেছে মেশিনগান। সবদিকেই গুলি ছুঁড়ছে ওরা। খুব বেশি না, তবে মাথা উঠিয়ে চলার উপায় নেই।

শাঁ শাঁ করে একটা প্যারাশুট স্টার শেল উঠল আকাশে। চারপাশ আলো হয়ে গেল কিন্তু অন্ধকার কাটল না পুরোপুরি। ওটা নিবে যেতেই আরও ঘন হয়ে নামল অন্ধকার।

ট্রেঞ্চে থাকতেই শুনেছি, সামনে ব্ল্যাক ট্রুপস আছে। সেটাই ভাবিয়ে তুলছে বারবার। এই অন্ধকারের মধ্যে বোঝার উপায় নেই কিচ্ছু। তাছাড়া ওরা টহল দিতে ওস্তাদ। তবে যারা টহল দেয়, তাদের মধ্যে

বেশির ভাগই বোকার হদ্দ। একদিন কাট আর ক্রপ তো প্রায় চোখ বুজে খতম করে ওদের দিল একটাকে। সে বেচারার আবার টহল দিতে দিতে সিগারেট খাওয়ার সখ হয়েছিল। কাটের কিছু করতে হয়নি। লালচে একটা বিন্দু বরাবর গুলি পাঠিয়ে দিয়ে আর ফিরেও তাকায়নি।

হঠাৎ করে প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। খুব কাছে গোলা পড়েছে। তার আওয়াজ শুনতেই পাইনি, তাই ওটা ফাটার সাথে সাথে ধক করে উঠেছে বুকের মধ্যে।

একমুহূর্ত পরেই প্রচণ্ড আতঙ্ক ভর করল আমার ওপর। এখানে এই অন্ধকারের মধ্যে একা আমি, সম্পূর্ণ অসহায়। হয়তো সামনের কোন গোলার গর্ত থেকে ঠাণ্ডা দুটো চোখ বহুক্ষণ ধরে লক্ষ করছে আমাকে। নিঃশব্দে কুটিল হাসিতে ফেটে পড়ছে। ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

এরকম টহলে আগেও অনেকবার এসেছি, কিন্তু ছুটি থেকে ফেরার পর এই প্রথম। সবচেয়ে সমস্যা যেটা, সেটা হলো এখানকার সবকিছুই আমার সম্পূর্ণ অচেনা।

মনকে শান্ত করতে চাইলাম, বোঝাতে চাইলাম ওসব কিছু না। কেউ যদি আমাকে লক্ষ্য করত তাহলে আর এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ত না। একটা গুলিই জায়গামত পৌঁছে দিত এতক্ষণে।

বিফলে গেল সব চেষ্টা। আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল সমস্ত শরীরে, হাত পা অসাড় হয়ে গেল, মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল সব। হঠাৎ শুনলাম মায়ের গলা, বহুদূর থেকে যেন বলছে, 'পল, সাবধানে থাকিস, বাবা, সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ।'

থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাশিয়ান বন্দীদের ছবি। তিলে তিলে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। পরমুহূর্তেই দৃশ্য বদলে গেল, ক্যান্টিনে বসে আছি সবাই মিলে, হৈ চৈ করে খাবার খাচ্ছি।

কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত শরীরে। দাঁতে দাঁত চেপে থামানোর চেষ্টা করলাম। চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু কোন লাভ হলো না। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, শীতল ধূসর একটা নল তাকিয়ে

আছে আমার দিকে। আমি যেদিকে যাচ্ছি, নিঃশব্দে সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে মুখটা।

সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, জুলপি বেয়ে কুল কুল করে নামছে ঘামের ধারা। ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। কোনরকমে ঘড়ির দিকে তাকালাম, কয়েক মিনিট হয়েছে মাত্র। মনে হলো কয়েক যুগ পার হয়ে এসেছি।

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। জামা প্যান্ট ঘামে ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে, সপ সপ করছে ভেজা চুল। নোনতা ঘাম চোখে ঢুকতেই জ্বালা করে উঠল। মুছে ফেললাম সাথে সাথে। মাটি থেকে মাথা তুলে সামনে তাকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। এক চুল নড়াতে পারলাম না শরীর। যেন প্রচণ্ড ভারি একটা পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বুকের ওপর। মাথাটা যেন একটা সীসার বল, হাত পা সব আঠা দিয়ে মাটির সঙ্গে সাঁটা। সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করেছে একসাথে। ঠিক করলাম এখানেই পড়ে থাকব।

একমুহূর্ত পরেই প্রবল আত্মগ্লানি আর লজ্জা এসে গ্রাস করল আমাকে। মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করল।

খানিকক্ষণ পর মাথা তুলতে পারলাম। গর্তের বাইরে মাথা বের করতেই তীব্র আলোয় ঝলসে গেল চোখ। একটা স্টার শেল উঠছে আকাশে। সাথে সাথেই মাথা নামিয়ে নিলাম।

নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে আমাকে। গর্তের বাইরে যেতে চাইছি কিন্তু কে যেন আবার টেনে নিয়ে আসছে ভেতরে। নিজেকে শাসালাম, 'তোমাকে পারতেই হবে, তুমি না একজন সৈনিক? ভয়ে মরে যেতে লজ্জা করছে না তোমার?' 'মাত্র একটা জীবনই তো হারাতে হবে, এভাবে বার বার মরার চেয়ে সেও অনেক ভাল।'

এসব হচ্ছে ছুটির ফল। এতদিন বাইরে থাকার ফলে সব অনুভূতিগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না নিজেকে। কোনরকমে হাতে ভর দিয়ে গর্তের কিনারা থেকে মাথা তুললাম। শেষ শক্তিটুকু খরচ করে কোমর পর্যন্ত বাইরে আনতেই দম ফুরিয়ে গেল। বহুক্ষণ মড়ার মত পড়ে থাকলাম ওভাবে।

পেছনে একটা শব্দ হতেই চট করে গর্তে নেমে গেলাম আবার। কান থাকলে হাজার গোলাবর্ষণের মধ্যেও সন্দেহজনক কোন শব্দ আলাদা করে চেনা যায়।

কান খাড়া করে থাকলাম, শব্দটা ঠিক আমার পেছন থেকে আসছে। তার মানে আমাদের লোকজন। একটু পরেই অস্পষ্ট গলার স্বর ভেসে এল। কথা বলার ধরন শুনে মনে হলো কাট।

প্রচণ্ড একটা শক্তি এসে ভর করল শরীরে। এক মুহূর্তে যেন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলাম। আহ্, ওই শব্দ, ওই গলার স্বর যে আমার কত পরিচিত, কত কাছের। ওই শব্দ জীবনের চেয়েও বেশি, ও যে আমার কমরেডদের গলা। পৃথিবীতে ওদের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই।

লম্বা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, বেঁচে গেছি এ যাত্রায়। এখন অন্তত একা নই আমি। ওরা আছে আমার পাশে, কঠোর, বন্ধু বৎসল, তরতাজা কিছু প্রাণ।

সাবধানে গর্তের কিনারা থেকে মাথা তুললাম। কয়েক মুহূর্ত দেখে নিলাম চারপাশটা। নাহ্, সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ছে না। নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলাম। বুকে হেঁটে চারপাশে খানিকটা করে দেখে নিলাম, তবে গর্তের অবস্থানটা মনে রাখলাম ঠিকমত। বেগতিক দেখলেই খিঁচে দৌড় দেব ওখানে। দৌড় মানে দ্রুত বুকে হেঁটে যাওয়া। কান পেতে খানিকক্ষণ গুলির আওয়াজ শুনে ওদের অবস্থান আর গুলি ছোঁড়ার ধরন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলাম। তারপর একটা দিক ঠিক করে রওনা হয়ে গেলাম।

আমার আতঙ্কটা গেছে, কিন্তু ভয় কাটেনি এখনও। একদিক দিয়ে এটা খুবই ভাল, অতিরিক্ত সতর্ক থাকব আমি।

ঘন অন্ধকার রাত্রি। জোর হাওয়া দিচ্ছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। কামানের ঝলকানিতে ছায়াগুলো কামানের ঠিক উল্টোদিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

একটুখানি এগোই, তারপর একেবারে মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে

দিয়ে পড়ে থাকি, তারপর আবার এগোই। এভাবেই চলছি। কেন যে বারবার থামছি, নিজেও জানি না।

অনেকক্ষণ ধরে চললাম এভাবে। শেষে বিরাট একটা বাঁক নিয়ে থামলাম। প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা পাইনি কারও। ট্রেঞ্চের যত কাছে পৌঁছচ্ছি, ততই আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে, সেই সাথে ভয়ও পাচ্ছি প্রচণ্ড। ট্রেঞ্চের একেবারে কাছে এসে যদি গুলি খাই, মরে গেলেও দুঃখ থেকে যাবে।

একটু বিশ্রাম নেবার পর যখন অন্য কিছু ভাবার মত অবস্থা হলো তখনি মনে পড়ল কথাটা। ঘাড়ের ওপরের চুলগুলো সড় সড় করে খাড়া হয়ে গেল সাথে সাথে। দিক হারিয়ে ফেলেছি আমি।

আরেকটা গোলার গর্তে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। বহুবার এমন ঘটেছে যে কোন সৈনিক নিজেদের ট্রেঞ্চ মনে করে যখন খুশিমনে লাফিয়ে পড়েছে, তখন বিপক্ষ দল আরও খুশিমনে তাকে বরণ করে নিয়েছে।

বসে থাকতে থাকতে আবার মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম আমি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। মাথার মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে কোন্‌দিকে যাব তাও ঠিক করতে পারছি না। সম্ভবত আমি ট্রেঞ্চ লাইনের সমান্তরালভাবে চলেছি এতক্ষণ, সে কারণেই কারও দেখা পাইনি এখনও। ঠিক করলাম এবারে আরও ঘুরপথে যাব। গর্ত থেকে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

সেই মুহূর্তে আকাশে জ্বলে উঠল ফ্লেয়ার। ওহ্, অসহ্য এই ফ্লেয়ারগুলো। মনে হয় ঘণ্টাখানেক ধরে ঝুলতে থাকে আকাশে। আর যতক্ষণ আকাশে থাকে ততক্ষণ একেবারে নট নড়নচড়ন অবস্থা।

আলোটা নিভে যেতেই রওনা হলাম আবার। কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব মনের মধ্যে। ঠিক কোন্‌দিকে যাচ্ছি, কিছুই জানি না।

কাঁকড়ার মত হেঁটে এগোচ্ছি। বুকের নিচে মাটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। ইট, পাথর, শক্ত জিনিসের টুকরো আর স্প্লিন্টারে ভর্তি। ওর ওপরে হাত পড়লে মনে হয় রেজর ব্লেডের ওপর হাত পড়েছে। মাঝে

মাঝে মনে হচ্ছে দিগন্তের কাছটা যেন একটু ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। তার মানে দিনের আলো ফুটে উঠছে। সাথে সাথে আতঙ্ক এসে ভর করতে চাইল মনের মধ্যে। সাথে সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিলাম চিন্তাটা। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। দূর, যতসব মনের ভুল। বুকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হলো, আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এখন আমি কোনদিকে যাচ্ছি তার ওপর। কিন্তু সেটা ঠিক কি বেঠিক, কিছুই জানি না আমি।

কড়াৎ করে গোলা ফাটল একটা। প্রায় সাথে সাথে আরও দুটো। তারপর অবিশ্রান্তভাবে চলল গোলাবর্ষণ। হুপিং কাশির রোগীর মত একটানা কেশে চলল মেশিনগান। তার মানে শুরু হলো আক্রমণ। এখন মাটিতে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া আর করার কিছু নেই।

কোনরকমে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে একটা বড় গোলার গর্তের মধ্যে নেমে পড়লাম। নামতেই কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল কাদা পানিতে। ঠিক করলাম, বেগতিক দেখলে খালি নাকটা কাদার ওপর ভাসিয়ে রেখে মড়ার মত পড়ে থাকব।

হঠাৎ শুনলাম অসংখ্য পায়ের শব্দ, সাথে কামান টেনে নেয়ার ঘড়ঘড়ানি। রওনা দিয়েছে ওরা। সাথে সাথে বসে পড়লাম এই কাদাপানির মধ্যে। হেলমেটটা ঝোলানো আছে কাঁধে, সুতরাং ওই অন্ধকারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

নাকটা শুধু বের করে চুপচাপ মড়ার মত পড়ে রইলাম। একটু পরে সব আওয়াজের মধ্যেই একটা ঝন্‌ন্ ঝন্‌ন্ শব্দ শুনতে পেলাম, যেন দুটো খালি টিনের গায়ে গা লেগে শব্দটা হচ্ছে। আস্তে আস্তে শব্দটা কাছে আসতে লাগল। সমস্ত স্নায়ুগুলো সাথে সাথে ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে গেল, সেই সাথে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল হাত-পা।

প্রথম জনকে দেখা গেল, তারপরেই আরেকজন। এই অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার চেনা যায়, ওরা ফরাসী সৈন্য। একেবারে গর্তের ধার ঘেঁষে প্রথম লাইনটা পার হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা কিন্তু পরমুহূর্তেই ধক করে উঠল বুকের মধ্যে, যদি কেউ নামে গর্তের

মধ্যে?'

ঝট করে কোমর থেকে ছুরিটা বের করে শক্ত হাতে চেপে ধরলাম। যদি কেউ গর্তের মধ্যে নামেই, তাহলে কোন কথা নেই, সোজা গলা দু'ফাঁক করে দিতে হবে যাতে চিৎকার করতে না পারে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই বাঁচার। কাজটা খুব দ্রুত সারতে হবে যেন চমকে ওঠার সময়টুকুও না পায়।

এতক্ষণে আমাদের ব্যাটারিগুলো গোলাবর্ষণ শুরু করল। আওয়াজ শুনেই বুঝলাম। একটা গোলা আমার কাছাকাছি ফাটল। ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত-পা, শেষ পর্যন্ত এই ছিল কপালে? নিজেদের গোলার আঘাতেই মরতে হবে আমাকে? মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্যকেই অভিশাপ দিলাম। কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই আমার। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা শুরু করলাম। মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল একবার।

গোলা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার দশা হলো আমার। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কিনারার দিকে সরে গেলাম। শরীরটা পানির মধ্যে রেখে মাথাটা মাটির ওপর চেপে রাখলাম। একটু কমল যেন শব্দটা। মাঝে মাঝে মাথা উঠিয়ে গর্তের ধারেকাছে অন্য কোন শব্দ হয় কিনা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। যতক্ষণ আমাদের আক্রমণ চলছে, ততক্ষণ বাঁচার আশা আছে।

মেশিনগানের একঘেয়ে কাশি চলছে তো চলছেই। আমাদের দিক থেকে রাইফেলের গর্জন জোরাল হয়ে উঠল। বুঝলাম ওরা এখনও ঠিকই আছে, পিছিয়ে গিয়েছিল শুধু। আমাদের কাঁটাতারের বেড়াও অটুট আছে ওটা যথেষ্ট মজবুত করেই বসিয়েছি আমরা। তার ওপর ওর খানিকটা অংশ ইলেকট্রিফায়েডও করা আছে।

আস্তে করে কিনারা থেকে খানিকটা সরে এলাম। সমস্ত শরীর যেন কোন কিছু ঘটার অপেক্ষায় টানটান হয়ে আছে। ওপর থেকে চিৎকার, বুকে হাঁটার আওয়াজ, ধাতব আওয়াজ সব কানে এল। সব ছাপিয়ে একজনের বাজখাঁই গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, খানিকটা পিছু হটার হুকুম দিচ্ছে। এর অর্থ আমাদের আক্রমণ জোরেসোরে শুরু হচ্ছে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। গর্তের ওপরে নড়াচড়ার আভাস পেয়েই আস্তে করে ঘাড় ফেরালাম। একজনকে দেখা গেল, পিছু হটছে। তার পেছন পেছন পুরো দলটা। মেশিনগানের আওয়াজের বিরাম নেই। আস্তে করে আবার যেই ঘুরতে যাব, ছোট্ট একটা মৃদু চিৎকারের সাথে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে হুড়মুড় করে কে যেন গড়িয়ে পড়ল আমার পাশে।

মাথার মধ্যে বোমা ফাটল একটা। কিভাবে ছুরিসুদ্ধ হাত তুলেছি, কি করেছি কিচ্ছু মনে নেই। শুধু অনুভব করলাম, আমার হাতের নিচে কে যেন ছটফট করছে, মোচড় খাচ্ছে, তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল। হুঁশ ফিরতেই দেখি ছুরি ধরা হাতে গরম আর আঠালো কি যেন লেগে চটচট করছে।

একটা ঘড়ঘড় শব্দে চমক ভাঙল। দেখি লোকটা গোঙাচ্ছে। হাঁপরের মত উঠছে নামছে ওর বুকটা। মনে হলো প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলার সময় চিৎকার করে উঠছে ও। মাথা ঝাঁকিয়ে সুস্থির হতে চাইলাম, ওসব আমার মনের কল্পনা।

ওর গলার ভেতরে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছেই। ইচ্ছে হলো, মাটি ঠেসে ওর মুখ বন্ধ করে দিই চিরতরে। এই শব্দ আর সহ্য হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত নিজের ওপর আস্থা ফিরে এল। কিন্তু সাথে সাথে সমস্ত শরীর একসাথে বিদ্রোহ করল। এক চুল নড়তে পারলাম না ওখান থেকে।

বেশ কিছুটা পরে শক্তি ফিরে এল শরীরে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলাম ওর কাছ থেকে। গর্তের উল্টোদিকের পাড় পর্যন্ত পৌঁছতেই সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ধপ করে শুয়ে পড়লাম ওখানে। এখন কেউ যদি এসেও পড়ে, এক চুলও নড়তে পারব না আমি।

ওর দিক থেকে একবারের জন্যেও চোখ সরাইনি আমি। হাতের মধ্যে ছুরিটা তখনও শক্ত করে ধরে রেখেছি। ও চিৎকার করতে চাইলেই ছুরি বসিয়ে দেব আবার। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অনবরত ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে ওর গলার মধ্যে।

এখান থেকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি ওকে। মাথার মধ্যে

একটাই শুধু চিন্তা, যে করেই হোক, চলে যেতে হবে এখান থেকে। ভোরের আলো ফুটছে, একটু পরেই ফর্সা হয়ে যাবে চারদিক। তখনকার কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠল শরীর। খিঁচে দৌড় দেবার ইচ্ছেটা অতিকষ্টে দমন করতে হলো। মাথা তুলতে গিয়েই ঝট করে নামিয়ে নিলাম। মেশিনগানের গুলি যেভাবে সমস্ত মাঠটাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে গর্ত থেকে বেরোনোর সাথে সাথে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে শরীর।

পরীক্ষা করার জন্যে আমার হেলমেটটা উঁচু করে তুলে ধরলাম। গর্তের কিনারা থেকে একটুখানি উঠিয়েছি মাত্র, বিঙ...ঙ...ঙ...করে আওয়াজ হলো, ছিটকে গেল হেলমেটটা। গড়াতে গড়াতে কাদার মধ্যে গিয়ে থামল।

ফর্সা হয়ে গেছে চারদিক। ভীষণ উৎকণ্ঠায় এত জোরে মুঠি পাকিয়ে আছি যে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত শাদা হয়ে আছে। আমাদের কমরেডরা এখনও আসছে না কেন?

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। গর্তের নিচের দিকে এখনও অন্ধকার। পড়ে থাকা ফরাসীটার দিক থেকে অতিকষ্টে চোখ ফিরিয়ে রেখেছি, প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার চোখ চলে যায় ওদিকে। ওর কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। বাইরের দিকে তাকালাম। মেশিনগানের গুলি যেন একটা জাল টাঙিয়ে ফেলেছে গর্তের ওপরে। মনে হচ্ছে একটা খাঁচার মধ্যে আটকা পড়ে গেছি।

এতক্ষণে হাতের দিকে খেয়াল হলো আমার। রক্তমাখা হাত দেখেই গুলিয়ে উঠল শরীর, বমি ঠেলে এল গলার কাছে। এক খাবলা মাটি তুলে নিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেললাম রক্তটুকু। যেটুকু উঠল না, কাদা দিয়ে ঢেকে দিলাম। হাত থেকে তো মুছে ফেলতে পারলাম, মন থেকে তো মুছল না।

তুমুল গোলাগুলি চলছে দু'পক্ষ থেকেই। পালাবার কোন উপায়ই দেখতে পেলাম না। কাট, ক্রপ ওরা সম্ভবত আমাকে অনেক আগেই খরচের খাতায় লিখে ফেলেছে।

ভোরের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। গোলাবর্ষণ আগের মতই আছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রচণ্ড আওয়াজে। দু'হাতে কান বন্ধ করে

ফেললাম, কিন্তু একটু পরেই হাত সরিয়ে নিতে হলো, কারণ অন্য কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

উল্টোদিকে পড়ে থাকা দেহটা নড়েচড়ে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকালাম ওদিকে। তাকাতেই আঠার মত সেঁটে গেল চোখ। পড়ে আছে ও, মুখে ছুঁচোল একটু দাড়ি, একটা হাত ভাঁজ হয়ে আছে, মাথাটা অসহায় ভাবে ঝুলে আছে তার ওপর। আরেকটা হাত বুকের ওপরে, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গুলিয়ে উঠল শরীর, নিজের অজান্তেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখটা।

মনে করতে চাইলাম, ও মরে গেছে, ও আর কিছু ভাবছে না, শুধু ওর শরীরটা পড়ে আছে এখানে, ওর ভেতর থেকেই ঘড়ঘড় শব্দটা বেরিয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে মাথাটা সোজা করল ও, ওঠাবার চেষ্টা করল, সাথে সাথে বেড়ে গেল গোঙানি। একমুহূর্ত পরেই ঝপ করে হেলে পড়ল মাথাটা।

মনকে আর বোঝানো সম্ভব নয়, মরেনি ও। কিন্তু মরবে একসময়। সেই সময়টা কখন?

খানিকক্ষণ ইতস্তত করলাম, তারপর মনস্থির করে এগোতে শুরু করলাম ওর দিকে। থেমে থেমে, হাতে-পায়ে ভর দিয়ে এক অন্তহীন যাত্রার শেষে ফরাসীটার পাশে পৌঁছলাম আমি।

সম্ভবত আমার আসার শব্দ শুনছিল ও। পাশে যেতেই চোখ খুলল। সেই চোখে জীবনের সমস্ত আতঙ্ক নিয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে যে মনে হলো, ওই চোখের শক্তিতে সে একনিমেষে শত শত মাইল দূরে চলে যাবে। সমস্ত শরীর স্থির, নিথর হয়ে আছে কিন্তু চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আতঙ্কে। প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়তে চাইছে। জীবনের সমস্ত শক্তি যেন জমা হয়েছে চোখ দুটোতে, শুধু আমার ভয়ে, মৃত্যুভয়ে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। হাঁটু ভাঁজ হতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মাটিতে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করতেই দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। ও

যতক্ষণ তাকিয়ে থাকবে, একচুলও নড়তে পারব না আমি।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করে শুধু ফিসফিস করে বলতে পারলাম, 'ভয় পেয়ো না।'

বুকের ওপরে রাখা ওর হাতটা ইঞ্চিখানেক নড়ল। এটুকু পরিশ্রমেই যেন ওর সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেল। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল ও।

কোনরকমে শরীরটা টেনে তুললাম। এগিয়ে গেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না আমাকে।'

ওকে বোঝাতে হবে। সাহায্য করতে চাই আমি। আস্তে করে একটা হাত রাখলাম ওর কপালে। চোখ খুলল, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল আবার। এর ফাঁকেই দেখে নিয়েছি আতঙ্ক নেই আর ও চোখে। ওর কলার খুলে দিয়ে মাথাটা ঠিক করে দিলাম।

মুখ খুলল ও। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু জিভ নড়াতে পারল না। ঠোঁটদুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে ওর। সাথে পানির বোতল নেই। অগত্যা গর্তের মধ্যে নেমে গেলাম আবার। ওই কাদাপানিতে রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে এসে ওর মুখের ওপর চিপলাম রুমালটা। শব্দ করে পানিটুকু খেয়ে নিল ও। একইভাবে আরও বারদু'য়েক পানি খাওয়ালাম ওকে। তারপর ওর টিউনিকের বোতাম খুলে দিলাম। দেখি যদি ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারি ক্ষতস্থানগুলোয়। এতে ওরও শুশ্রূষা করা হবে, তারচেয়ে বড় কথা যদি কেউ এখন দেখে ফেলে তাহলে সাথে সাথে অন্তত গুলি করবে না আমাকে। প্যান্ট খোলার পর শার্ট খুলতে চেষ্টা করলাম। গায়ের সাথে লেপ্টে আছে শার্টটা। খুলতে গিয়ে দেখি বোতামগুলো পেছন দিকে। তার মানে না ছিঁড়ে খোলা যাবে না। ছুরিটা বের করতেই আতঙ্ক ফুটে উঠল ওর চোখে। ও চোখ খোলা রাখলে কিচ্ছু করতে পারব না আমি। চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দিলাম। নিচু গলায় বললাম, 'ভয় নেই, কমরেড, তোমাকে তো আমি সাহায্যই করতে চাই।' যতক্ষণ ধরে শার্টটা কেটে বের করলাম, ততক্ষণ ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বার বার বললাম, 'ভয় নেই, কমরেড, ভয় নেই।'

ওর বুকে গভীর তিনটে ক্ষত। পকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ বের করে ড্রেসিং করে দিলাম। সাথে সাথেই রক্তে ভিজে উঠল ওগুলো। শক্ত করে

বেঁধে দিতেই ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

আর আমার করার কিছু নেই। এখন শুধু অপেক্ষা, হয়তো বাঁচার, হয়তো বা মরার।

অসহ্য কষ্টে পিষে দিয়ে পার হতে থাকল ঘণ্টাগুলো। ফরাসীটা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার গোঙাতে শুরু করল। মানুষ মরতে কত সময় নেয়? ওকে দেখেই বুঝেছি, ওর কোন আশা নেই।

মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, এই তো এখনই মরবে ও। জীবনে এমন করে মৃত্যু কামনা করিনি কারও, কিন্তু তবু তো মরছে না ও। আর কতক্ষণ? দুপুরের পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। কতক্ষণ আর সহ্য করা যায় এই গোঙানি! রিভলভারটা থাকলে এই মুহূর্তে ওকে শেষ করে দিতাম, তাতে যা হয় হত। কিন্তু ওটা হারিয়ে ফেলেছি কোন এক গর্তে। এখন ওকে ছুরি মারার কথা ভাবতেও পারি না।

দাঁতে দাঁত চেপে আরও ঘণ্টাখানেক সহ্য করার পর পাগল হয়ে গেলাম একেবারে। অসহ্য গোঙানির সাথে জুটল খিদে। খিদের চোটে কেঁদে ফেলার অবস্থা। বার বার ওই কাদা মাখা পানি খেতে লাগলাম। রুমাল ভিজিয়ে ওকেও দিলাম প্রত্যেকবার।

এই প্রথম সামনাসামনি মারলাম কাউকে। এমন ভাবে যে, শুধু ওকে মারাটাই আমার একমাত্র কাজ ছিল। কাট, ক্রপ, মুলার, এদের জন্যে ব্যাপারটা পানির মত সোজা এখন। হাতাহাতি যুদ্ধে ওরা অনেক করেছে এসব। কিন্তু এখন প্রতিটা নিঃশ্বাস যেন আমার বুকটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে ফরাসীটার কাছেই আছে আমাকে হত্যা করার অমোঘ অস্ত্র। সময় এবং আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো, অদৃশ্য ছুরির মত আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে আমাকে।

সব কিছুরই শেষ আছে। বেলা তিনটার সময় মারা গেল ও।

চোখ বন্ধ করে মস্তবড় একটা শ্বাস নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে রাখলাম বুকের মধ্যে। তারপর সশব্দে ছাড়লাম ওটা। সমস্ত কিছু খুব শান্ত, খুব চুপচাপ মনে হলো। কিন্তু একটু পরেই এই নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল আমার কাছে। মনে হলো আবার ও গোঙাতে থাক, আরও জোরে গলা

দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করুক।

পাগলের মত অবস্থা হলো আমার। কিছু একটা করা দরকার। ফরাসী সৈনিকটাকে ভালমত শুইয়ে দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করে দিলাম। ওর চোখ দুটো বাদামী, চুলগুলো কালো আর কানের দু'পাশে কোঁকড়ানো। ভরাট নরম মুখ, সামান্য বাঁকানো নাক, বাদামী গায়ের রং। একদিন আগেও কত প্রাণবন্ত ছিল এই মুখ।

কোন সন্দেহ নেই ওর বউ এখন ওর কথাই ভাবছে। সে জানেও না আমি তার কত বড় সর্বনাশ করে ফেলেছি। ও যদি প্রায়ই বউকে চিঠি লিখত তাহলে হয়তো ওর বউ কালই ওর চিঠি পাবে, হয়তো এক সপ্তাহ পরে। একমাস পরেও পেতে পারে। যখন ওর বউ পড়বে, 'আমি এখন ট্রেঞ্চে বসে লিখছি,' তখন ও কথা বলবে ওর বউয়ের সাথে।

ধীরে ধীরে শোচনীয় হয়ে পড়ছে অবস্থা। এলোমেলো চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। আচ্ছা, ওর বউটা দেখতে কেমন? সে কি এখন আমার? মনে হয় আমার, কারণ যুদ্ধে তো আমি জিতেছি। প্রাচীন কালের নিয়ম অনুযায়ী তো ওকে আমারই পাবার কথা। ক্যান্টোরেককে যদি এখন কাছে পেতাম! যদি আমার মা দেখত এসব?

ছোট্ট একটা ভুল, অথচ তাতেই কত কিছু হয়ে গেল! শুধু যদি আমি আমার ট্রেঞ্চে ফিরে যাবার রাস্তাটা মনে করতে পারতাম, তাহলেই ও হয়তো আরও তিরিশ বছর বেঁচে থাকত। কিংবা ও যদি গজ দু'য়েক বাম দিকে ঘেঁষে হাঁটত, তাহলে এখন ট্রেঞ্চে বসে হয়তো বউয়ের কাছে আরেকটা চিঠি লিখত।

কিন্তু এরকম হলে তো অনেক কিছুই ঘটত না। কেমারিখের পা টা যদি ছয় ইঞ্চি ডানে থাকত কিংবা হাই যদি ইঞ্চি তিনেক সামনে ঝুঁকে থাকত, তাহলে এখনও ওরা আমাদের সাথেই থাকত। সবই ভাগ্য!

আর পারছি না। অসহ্য এই নীরবতা। মাতালের মত টলতে টলতে ফরাসী সৈনিকটার লাশের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'কমরেড, আমি সত্যি সত্যি তোমাকে মারতে চাইনি। আবার যদি তুমি লাফিয়ে পড়ো, আর যদি তুমি আমাকে মারতে না চাও,

আমিও তোমাকে কিছু বলব না। তুমি তো আগে আমার কাছে মানুষ ছিলে না, ছিলে একটা ভিন্ন মতাদর্শ। আমি তো তোমাকে ছুরি মারিনি, মেরেছি সেই মতাদর্শকে। কিন্তু এখন তো তুমি আমার মত মানুষ, কমরেড। আমি শুধু ভেবেছি তোমার অস্ত্রের কথা, তোমার জিঘাংসার কথা, কিন্তু এখন দেখছি, তুমিও মানুষ। তোমারও বউ, ছেলে-মেয়ে আছে, পরিবার আছে, ভালবাসা আছে, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো আছে। আমাকে ক্ষমা করো, কমরেড। কত দেরিতেই না সব কিছু বুঝি আমরা। তুমি কেন আমাকে বললে না, তুমিও আমার মত সাধারণ মানুষ, তোমার মা-ও আমার মায়ের মতই সন্তানের মঙ্গলের জন্যে সারাক্ষণ প্রার্থনা করে? কেন বললে না, আমাদের একই মৃত্যু-যন্ত্রণা, একই মৃত্যু ভয়! কেন, কেন? আমাকে ক্ষমা করে দাও, কমরেড। তুমি কেন আমার শত্রু হবে? এই রাইফেল, এই পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো তুমি কাট, ক্রপ ওদেরই মত আমার ভাই, আমার বন্ধু। আমার জীবনের কুড়িটা বছর নিয়ে নাও, আচ্ছা, না হয় আরও বেশি নাও, তবু জেগে ওঠো। আমার জীবনের সামনের দিনগুলো আমার চেয়ে তোমার বেশি দরকার। তোমার যতটুকু খুশি নিয়ে নাও, তবু জেগে ওঠো। কথা বলো আমার সাথে।'

পাগলের প্রলাপের মত বললাম, কিন্তু অনুভব করলাম, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে এল কথাগুলো।

সমস্ত ফ্রন্ট শান্ত। থেকে থেকে গর্জে উঠছে রাইফেল। আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে না কেউ। এর অর্থ, বাইরে বেরোতে পারছি না আমি।

'আমি তোমার বউয়ের কাছে চিঠি লিখব,' বিড়বিড় করে বললাম, 'আমিই তাকে সবকিছু জানাব। আমি তোমাকে যা যা বলেছি, সব তাকে জানাব, যাতে ও বেশি কষ্ট না পায়। আমি তাকে সাহায্য করব। আমি তোমার পরিবারের সবাইকে সাহায্য করব।'

ওর টিউনিকটা অর্ধেক খুলেছিলাম তখন। ওভাবেই আছে। পকেটে ওর নোটবুকের কোণা দেখা যাচ্ছে। বের করতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল আমার। নোট বুকে ওর নাম লেখা আছে নিশ্চয়ই। যদি ওর নাম

না জানি, একদিন ভুলে যাব ওকে। কিন্তু জানার পর সারা জীবন আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে থাকবে ওই নাম। মনে করিয়ে দেবে মানুষের নৃশংসতার কথা, মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা।

বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বের করলাম নোটবুকটা। কাঁপুনির চোটে হাতের ফাঁক গলে পড়ে গিয়ে খুলে গেল ওটা। ভেতর থেকে কতগুলো ছবি আর চিঠিপত্র ছিটকে পড়ল কাদার ওপর। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম। নোটবুকটার মধ্যে রাখতে গিয়েও থমকে গেলাম। এতগুলো ঘণ্টার অপরিসীম অত্যাচার, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, মৃত্যুভয় সব কিছু বেপরোয়া করে তুলল আমাকে। এক ঝটকায় সোজা করে নিয়ে তাকালাম ছবিটার দিকে।

সাধারণ ক্যামেরায় তোলা ছবি। শাদা ধবধবে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন স্ত্রীলোক আর একটা বাচ্চা মেয়ে। হাসছে দু'জনেই।

চিঠিগুলো খুললাম। পড়তে চেষ্টা করলাম। সব ফরাসী ভাষায় লেখা। ফরাসী বিদ্যায় আমার দৌড় তো জানাই আছে। কিন্তু দু'একটা শব্দ যার মানে করতে পারলাম, সোজা বুকের মধ্যে গিয়ে ঘা দিল। মনে হলো প্রতিটা শব্দ খচ্ করে ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছে বুকে।

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেছে একেবারে। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবার মত অবস্থাই নেই আর। তার মধ্যেও অনুভব করলাম ওদের কাছে চিঠি লিখতে হাত কাঁপবে না আমার। ছবিটার দিকে তাকালাম আবার। পরিষ্কার বোঝা যায়, ওরা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। ভবিষ্যতে যদি কিছু টাকা আয় করতে পারি, তখন বেনামীতে ওদের টাকা পাঠাতে পারব। মনে রাখলাম কথাটা। ও মরে গিয়ে অচ্ছেদ্য এক বাঁধনে বেঁধে রেখে গেছে আমাকে। ওর জন্যে এখন আমার অনেক কিছুই করতে হবে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, 'ওদের জন্যে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, সবই করব।' বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আজ থেকে আমার সমস্ত জীবন শুধু ওদের জন্যে।

কাঁপা কাঁপা হাতে নোটবুকটা খুললাম। প্রথম পৃষ্ঠায় গোটা গোটা

অক্ষরে নাম লেখা, 'গেরার্ড ডুভাল, কম্পোজিটর।'

ওর পকেট থেকে পেন্সিল বের করে একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে নিলাম। নোটবুক আর ছবিগুলো গুছিয়ে রেখে দিলাম ওর টিউনিকের পকেটে।

গেরার্ড ডুভাল, একজন কম্পোজিটর। আমি ওকে খুন করেছি। অসংলগ্নভাবে চিন্তাটা মাথায় এল, আমাকে কম্পোজিটর হতে হবে।

বিকেল নেমেছে ফ্রন্টে। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে মন। ঘোরটা কেটে গেছে। শুধু শুধুই ফরাসীটাকে ভয় পাচ্ছিলাম এতক্ষণ। শান্ত স্বরে বললাম, 'কমরেড, আজকে তুমি মরেছ, কালকে হয়তো আমি মরব। কিন্তু যদি বেঁচে ফিরতে পারি, কমরেড, আমি কথা দিচ্ছি, যে কারণে আজ তুমি মৃত, জীবন আমার কাছে অর্থহীন, তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করব। আর যেন কোনদিন কারও এমন না হয়।'

সূর্য হেলে পড়েছে আরও পশ্চিমে। সারা ফ্রন্ট লাল আলোয় ভরা, যেন রক্ত ঢেলে দিয়েছে কেউ। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্নের মত শুয়ে আছি। এমন ঘোরের মধ্যে ছিলাম যে কখন সন্ধ্যা নেমেছে টেরই পাইনি। পুরোপুরি অন্ধকার নামতে আরও একঘণ্টা। গরমের দিন হলে ঘণ্টা দুয়েক তো লাগতই।

হঠাৎ করেই শিরশিরে একটা অনুভূতি বয়ে গেল মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ঘটে গেছে। কারণ ফরাসীটা আমার মনে আর কোন দাগই কাটতে পারছে না। যেই মাত্র বাঁচার আশা ফিরে এসেছে, অমনি ওর কথা প্রায় ভুলেই গেছি। শেষে না আবার কোন অভিশাপ লাগে ওর, সেজন্যে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলাম, 'যা যা বলেছি, কমরেড, সব করব আমি, সব করব।' বার বার করে বলতে লাগলাম কথাটা, যদিও আমি নিশ্চিত যে ও সব কিছুই করব না।

হঠাৎ মনে হলো, আমাদের লোকেরাই আমাকে গুলি করতে পারে কারণ এতক্ষণে ওদের হিসেবের বাইরে চলে গেছি আমি। ঠিক করলাম, ট্রেঞ্চের কাছে পৌঁছে মাটির সাথে নিজেকে মিশিয়ে রেখে প্রথমে ডাকব

ওদের, উত্তর পেলে তবে রওনা হব আবার।

প্রথম তারা ফুটল আকাশে। মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল তারাটা। আশা জাগল মনে। এ যাত্রায় হয়তো বেঁচেই গেলাম। মনে মনে সাবধান করে দিলাম নিজেকে, 'অসতর্ক হয়ো না যেন, খবরদার।'

ঝপ্ করে অন্ধকার নামল ফ্রন্টে। প্রতি মুহূর্তে আরও ঘন হয়ে আসতে লাগল। আমার সমস্ত উত্তেজনা চলে গেছে, এখন শুধু সতর্কভাবে অপেক্ষার পালা।

প্রথম রকেটটা আকাশে উঠতেই বুকে হেঁটে বেরিয়ে এলাম গর্ত থেকে। ওই লাশটার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি আমি। আমার সামনে এখন ফ্রন্টের মৃত্যু ফাঁদ, অন্ধকার রাত আর আমার ভাগ্য।

একটা গোলার গর্ত বেছে নিলাম। যে মুহূর্তে রকেটটা নিবল, একছুটে গিয়ে নামলাম ওটার মধ্যে। একের পর এক গোলার গর্তে আশ্রয় নিয়ে এগোতে থাকলাম ট্রেঞ্চের দিকে।

অনেকটা কাছে এসে গেছি। গোলা ফাটার আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল কাঁটাতারের বেড়া। আরেকটা আলোর ঝলকানি, কে যেন নড়ছে ওখানে। স্থির হয়ে গেলাম সাথে সাথে। পড়ে থাকলাম মড়ার মত। আরেকটা রকেট আকাশে উঠতেই হেলমেট দেখে চিনলাম, আমাদেরই সৈনিক। চিৎকার করে ডাকলাম ওকে। সাথে সাথে ওপাশ থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'পল, পল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

মাটি ফুঁড়ে ছুটে বেরিয়ে এল দু'জন, হাতে স্ট্রেচার। অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে পারলাম ওদের, কাট আর ক্রপ। খুঁজছে আমাকে। কাট চিৎকার করে বলল, 'আহত হয়েছ নাকি?'

'না না, ভালই আছি আমি।'

দ্রুত বুকে হেঁটে পৌঁছলাম ট্রেঞ্চে। নতুন শক্তি এসে ভর করল শরীরে। আমি এখন আমাদের লোকজনের মধ্যে।

ট্রেঞ্চে নেমেই খাবার চাইলাম। রাক্ষসের মত খিদেয় পেট জ্বলছে আবার। একটা সিগারেট এগিয়ে দিল মুলার।

'কি হয়েছিল বলত,' জিজ্ঞেস করল ক্রপ।

'দাঁড়া, বলছি।'

কষে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়লাম। তারপর ধীরে সুস্থে পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলাম ওদের কাছে। তেমন অবাক হলো না কেউই। এমন অনেক সময়ই হয়। রাশিয়ায় কাট একবার রাশিয়ান ফ্রন্ট লাইনের পেছনে দু'দিন ধরে লুকিয়ে ছিল।

ওদের কাছে পুরো ঘটনাটা বললেও কম্পোজিটর আর আমার চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারগুলো সাবধানে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু পরদিন সকালেই পেট ফুলে উঠল আমার। কাউকে না বলতে পারলে আর শান্তি পাচ্ছি না। অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত কাট আর ক্রপকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বললাম সব।

'আরে, এতে হয়েছেটা কি,' হেসে উঠল দু'জনেই, 'এছাড়া কি করার ছিল তোমার? আমরা যুদ্ধে এসেছিই তো এই জন্যে। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

ওদের কথা শুনে শান্ত হয়ে গেল মনটা। আমি গোলার গর্তে শুয়ে শুয়ে একটা লাশের সঙ্গে আবোল-তাবোল কথা বলেছি, ভাবতেই কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

'ওখানে দেখো,' কাট ইশারা করল একদিকে, 'গুলি ছুঁড়ছে ওরা।'

গুলি ছোঁড়ার জন্যে জায়গাটা বিশেষভাবে তৈরি। কয়েকজন স্নাইপার টেলিস্কোপের সাইটে চোখ লাগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর পরই আওয়াজ হচ্ছে গুলির।

একটু পরেই চিৎকার করে উঠল একজন, 'মরেছে আরেকটা।' আমাদের দিকে ফিরতেই দেখি, সার্জেন্ট ওয়েলরিখ। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল, দেখেছ? ক'টাকে যে লাগালাম তা ঈশ্বরই জানে। তবে তিনটে শিওর শট্ এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।'

হাসলাম আমরা।

সার্জেন্ট চলে যেতেই ক্রপ বলল, 'এভাবে যদি সারাদিন চালাতে পারে, তাহলে সন্ধ্যার সময় বুকে কিছু না কিছু ঝুলাতে পারবে।'

'অথবা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকটিং সার্জেন্ট মেজর,' বলল কাট।
ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি এসব করব না।'
'তাতে কি, তোমার জন্যে এখন এসব দেখাই যথেষ্ট।'
সার্জেন্ট ওয়েলরিখ ফিরে এল একটু পরেই। জায়গামত বসে রাইফেলের সাইটে চোখ লাগিয়ে আগের কাজেই মগ্ন হয়ে গেল আবার।
'ঘুমটা বোধহয় দিয়ে নিলে ভাল হত, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল ক্রপ।
'তা হত, আসলে হয়েছে কি, ওই লাশের সঙ্গে থাকতে থাকতে মাথার মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আফটার অল্, যুদ্ধ যুদ্ধই।'
রওনা হলাম সেলারের দিকে। কড়াৎ করে গর্জে উঠল সার্জেন্ট ওয়েলরিখের রাইফেল।

দশ

অত্যন্ত মজার কাজ পেয়ে গেছি। আমাদের আটজনের ওপর ভার পড়েছে, একটা গ্রাম পাহারা দিতে হবে। গ্রামটাতে এত গোলা পড়েছে যে লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে ভেগে গেছে সব।
ওখানে কিছুদিন আগেও আমাদের লোকজন ছিল। সবাই চলে গেলেও সাপ্লাই ডিপোটা এখনও ওখানে। ওটাই বিশেষ করে পাহারা দিতে হবে। আমাদের খাবার দাবারও নিতে হবে ওখান থেকেই। ব্যস্, আর পায় কে! খবরটা শুনে খুশিতে ডিগবাজি দিয়ে ফেললাম সবাই। এ কাজের জন্যে আমাদের চেয়ে আর যোগ্য লোক নেই। আমি, জাদেন, মুলার, কাট, ক্রপ, ডেটারিং, পুরো গ্যাংটাই আছি একসাথে। ভয় হলো, খুশির চোটে আবার মারা না যাই।
খারাপ লাগল হাইয়ের জন্যে। ও থাকলে আরও মজা হত। তবু

আমাদের ভাগ্যটা অনেক ভাল। অন্যান্য স্কোয়াডের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় আমাদের স্কোয়াডের বলতে গেলে কিছুই হয়নি।

গ্রামে গিয়ে প্রথমেই খুঁজে বের করলাম নিরাপদ একটা সেলার। অল্প একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম। চমৎকার জায়গা। পুরোটা কংক্রিটের তৈরি। ওপর থেকে বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। ঢোকার মুখে একটা কংক্রিটের দেয়াল। সেলার থেকে বেরোলেই যেন আঘাত পেতে না হয়।

সেলারটাকে রাজসিকভাবে সাজানো দরকার। এমন সুযোগ তো জীবনে খুব কমই আসে। পেয়েই যখন গেলাম, সুযোগটা ছাড়ব কেন? নেমে পড়লাম কাজে।

সমস্ত গ্রামটাই আমাদের হাতে। ফলে কোন বাড়ি থেকে কিছু নেবার সময় একেবারে নিজের জিনিস মনে করে নিলাম।

প্রথমেই সেলারের মেঝেতে চমৎকার কয়েকখানা কার্পেট বিছালাম। সৈনিকদেরও তো নরম কিছুর ওপর বসতে ইচ্ছে হয়! এরপর জোগাড় করলাম, ধোপ দুরস্ত চাদর, বালিশ, কম্বল এইসব। বেশির ভাগই আবার পালকের। খুশিতে গান গেয়ে উঠলাম একেবারে। যত ধরনের বিলাসিতার সামগ্রী আছে, সবকিছু এনে জড়ো করলাম সেলারে। আর সারা গ্রামে ওসব জিনিসের অভাবও নেই।

আমি আর ক্রপ খুঁজতে খুঁজতে মেহগনি কাঠের এমন চমৎকার একখানা খাট পেয়ে গেলাম যে দেখে চোখের পলক আর পড়ে না। আকাশী নীল রঙের মশারি আর পালকের চাদর-বালিশ দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গের জিনিস। সাথে সাথে ঠিক করে ফেললাম, প্রাণ থাকতে ফেলে যাব না এটা।

ভূতের মত খেটে খাটটাকে খুলে নিয়ে সেলারে ঢোকালাম। তারপর আবার ঠিকমত জোড়া লাগিয়ে তোশক চাদর পাতার পর শরীরে আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট রইল না। ঘামে ভেজা শরীরেই ধপাস করে শুয়ে পড়লাম ওটার ওপর। পুরো আধঘণ্টা পরে কথা বলার মত শক্তি ফিরে পেলাম।

ঘরগুলো সাজানোর পরে আমি আর ক্যাট বেরোলাম গ্রামের

অলিগলির একটু খোঁজ খবর নিতে, মানে তাজা খাবার দাবারের সন্ধান করতে। কাট সাথেই আছে, সুতরাং বেশি সময় লাগল না। মুহূর্তের মধ্যে এক ডজন ডিম আর পুরো দু'পাউণ্ড ভাল মাখনের ব্যবস্থা করে ফেললাম।

হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল বাড়িঘর। পর মুহূর্তেই ছিটকে উঠল এক পাশের দেয়াল। আমাদের একগজ মত দূর দিয়ে লোহার একটা স্টোভ একদিকের দেয়াল ফুটো করে অন্যদিকের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেল। শেলটা পড়েছে রাস্তার ওপাশের বাড়িতে।

'শালা,' গাল দিল কাট। থুঃ করে একদলা থুথু ফেলে আবার খোঁজাখুঁজিতে মন দিল ও।

খানিক পরেই কান খাড়া হয়ে উঠল একটা শব্দে। ভুল শুনলাম নাকি? নাহ্, আবার শোনা গেল শব্দটা। সাথে সাথে ছুটলাম উৎসের দিকে। গিয়ে দেখি নাদুসনুদুস দুটো শূকর-ছানা। মনের সুখে ছুটোছুটি করছে আর মাঝে মাঝে ঘোঁত ঘোঁত করে শব্দ করছে। মনে হলো স্বপ্ন দেখছি না তো! দু'চোখ কচলে নিলাম একবার। নাহ্, এখনও আছে, তার মানে সত্যি। কান পর্যন্ত হাসি পৌঁছে গেল দু'জনেরই। রোস্টের গন্ধে জিভে জল এসে গেল সাথে সাথে। সুড়ুৎ করে টেনে নিলাম। কাট ততক্ষণে বগলদাবা করে ফেলেছে একটাকে। অন্যটাকে বগলদাবা করে রওনা দিলাম সেলারের দিকে।

আমাদের সেলার থেকে গজ বিশেক সামনে ছোট্ট একটা বাড়ি। বাড়িটা অফিসারদের থাকার জন্যে ব্যবহার করা হত। ওটাতেই ঢুকলাম আমরা। বাড়িটার রান্নাঘরের তুলনা হয় না। বিরাট চুলা। প্যান, কেটলি, যা যা লাগে সব আছে। সবচেয়ে বড় কথা, চেড়াই কাঠের স্তূপ আছে একটা।

দু'জন সেই সকালবেলা বেরিয়েছে খেত থেকে আলু, গাজর আর যা যা শাকসবজি পাওয়া যায়, আনতে। টিনের শাকসবজি খেতে খেতে ঘেন্না ধরে গেছে। কে যেন এর মধ্যে দু'খানা ফুলকপি জোগাড় করে এনেছে। ডাইনিং রুমের টেবিলে ও দুটো শোভা পাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে।

কাট এরই মধ্যে শূকরছানা দুটোকে জবাই করে ছালটাল ছাড়িয়ে

একেবারে রেডি। ঠিক করলাম আলুর কেক বানাব, রোস্টের সাথে জমবে ভাল। আলু কুচি করার জন্যে একটা ঝাঁজরি খুঁজলাম, পেলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অবশ্য বুদ্ধি বেরিয়ে গেল। একটা টিনের পাতের মধ্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুটো করলাম অনেকগুলো। ব্যস, হয়ে গেল ঝাঁজরি। এখন উল্টো দিকটা ব্যবহার করলেই হয়। দু'জন হাতে গ্লাভস্ পরে নিল যাতে আঙুল সুদ্ধ কুচি না হয়ে যায়। একজন আলু ছিলে এগিয়ে দিতে লাগল, অন্য দু'জম কুচি করে যেতে লাগল পুরোদমে।

কাট ভার নিল রোস্ট, গাজর, ফুলকপি আর শালগমের। কোত্থেকে জোগাড় করেছে এক বোতল সস্, সেটাও কাজে লাগিয়ে ফেলল এই ফাঁকে। আমি প্যানকেক ভাজতে লেগে গেলাম। একসাথে চারটে করে ভাজি, দশ মিনিট পরে উল্টে দিই। ওদিকে রোস্ট করার কাজ পুরোদমে চলছে। গন্ধে সারা রান্নাঘর ম ম করছে।

গন্ধের টানেই কিনা কে জানে, দু'জন গেস্ট এসে জুটল। ওরা অয়ারলেস অপারেটর। খুশিমনে খাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। কোন কথা না বলে রাজি হয়ে গেল ওরা।

লিভিং রুমে রাখা পিয়ানোটা দেখে উঠে গেল ওদের একজন। বাজাতে শুরু করতেই একসাথে হেঁড়ে গলায় গান ধরলাম আমরা। যে সুর বের হলো, তাতে ধারে কাছে কোন ফরাসী থাকলে সাথে সাথে হার্টফেল করত।

গান-বাজনা আর রান্নায় এত মশগুল ছিলাম যে ওদিকে যে খবর হয়ে গিয়েছে, সে খেয়ালই হয়নি। রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। অবজারভেশন বেলুন ঠিক ঠিক জানিয়ে দিয়েছে জায়গাটার অবস্থান। শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ, ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। গোলাগুলো সব লিটল্‌ডেইজী কাটার, ফাটার পরে গর্ত হয় ছোট্ট কিন্তু স্প্লিন্টারগুলো খুব নিচু দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত।

গোলা এখন আমাদের আশেপাশে পড়ছে। কিন্তু যাব কি করে? রোস্ট না হয় প্রায় হয়েই এসেছে কিন্তু প্যানকেক তো পুরোপুরি ভাজা হয়নি এখনও।

জানালা দিয়ে স্প্লিন্টার ঢোকা শুরু হলো। তাতে রোস্টের কোন অসুবিধা হলো না কিন্তু সমস্যা হলো প্যানকেক নিয়ে। এত ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়ছে যে স্প্লিন্টারের আঘাতে দেয়াল ঝাঁজরা হয়ে গেছে। আর প্রত্যেকবারই জানালা দিয়ে একটা না একটা ঢুকছেই। ফলে যেই শুনি গোলা পড়ছে, অমনি প্যান সুদ্ধ বসে পড়ি নিচে। গোলা ফাটার পরপরই লাফ দিয়ে উঠে কাজে লেগে যাই আবার। এভাবে চালালাম বেশ খানিকক্ষণ।

এতক্ষণে পিয়ানো বাজানো থামিয়েছে অয়ারলেস অপারেটর। না থামিয়েই বা করবেটা কি। স্প্লিন্টারের একটা টুকরো এইমাত্র ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

রান্নাবান্না শেষ, এবার সবকিছু নিয়ে ফিরতে হবে সেলারে। দুটো গোলা ফাটার মাঝখানে যেটুকু সময়, ওর মধ্যেই বিশ গজ খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে। শাকসবজির পাত্র নিয়ে তৈরি হয়ে গেল দু'জন। গোলা ফাটার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল ওরা। আরেকটা গোলা পড়ার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেলারের সামনের দেয়ালের আড়ালে। আরও দু'জন তৈরি হয়ে গেল। এবারে যাচ্ছে বড়সড়ো ক্যান একটা, চমৎকার কফিতে ভর্তি। ঠিকমতই পৌঁছল ওরা।

এবারে যাবে আসল জিনিস, রোস্ট। কাট আর ক্রপ নিয়েছে ও দুটো। গোলা পড়তেই হাঁ হাঁ করে এঁকেবেঁকে ছুটল ওরা। দেয়ালের আড়ালে পৌঁছতেই পড়ল আরেকটা গোলা।

এবারে আমার পালা, কিন্তু আরও চারখানা প্যানকেক যে চুলোর ওপর! ওগুলো ফেলে যাই কি করে! মাথা নিচু করার সময় দু'দু'বার মাটিতে পড়ে গেল ওগুলো। শেষ পর্যন্ত ভাজা শেষ হলো। হাজার হলেও ওগুলো আমার প্রিয় খাবার। তাও আবার চারখানা অতিরিক্ত হলো।

কেকের স্তূপ নিয়ে রেডি হয়ে গেলাম। গোলার আওয়াজও হলো আর আমি প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়লাম। খরগোশের মত ছুটতে ছুটতে প্রায় এসে পড়েছি, তীক্ষ্ণ শিষের শব্দ উঠল বাতাসে। শেষ লাফটা দিয়ে যেই আমি দেয়ালের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, পাশের

দেয়ালটাও স্প্লিন্টারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

হাচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নিজে পড়ে গেলেও একটা কেকও মাটিতে পড়তে দিইনি। কেকগুলো নিয়ে নেমে গেলাম সেলারে।

ঠিক দু'টোর সময় খাওয়া শুরু করলাম, ছ'টা পর্যন্ত চলল। কফি চালালাম সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত, সাথে চমৎকার সব সিগারেট আর চুরুট। রাতের খাওয়া শুরু হলো কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায়।

ঠিক দশটার সময় হাড়ের শেষ টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম আমরা। পেট একেবারে ঢাউস হয়ে গেছে। জাদেন আর মুলার খাবার ব্যাপারে ওদের পূর্ব সুনাম বাড়িয়ে নিয়েছে খানিকটা।

খাওয়াদাওয়ার পরে সিগারেট ধরালাম সবাই। কাট কনিয়্যাকের বোতল খুলে গ্লাসে ঢালল সবার জন্যে। রাজসিক চালে ধীরে সুস্থে চুমুক দিলাম গ্লাসে।

খানিকক্ষণ পরে মিউ মিউ শব্দে তাকিয়ে দেখি দরজার কাছে একটা বেড়াল। মানুষের আওয়াজ পেয়ে হয়তো চলে এসেছে। হাড়গোড় যা ছিল, দিলাম ওকে। এবার ঘুমোতে হয়। এত খেয়েছি যে নড়তে চড়তেও কষ্ট হচ্ছে। কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গামত গিয়েই ধপাস।

রাত্রি গভীর হবার সাথে সাথে পেটের মধ্যে গুড়গুড় করাও বাড়তে লাগল। বুঝলাম, লক্ষণ বেশি ভাল না। খাবার সময় মনেই হয়নি, কচি শূকরের মাংস খুব গুরুপাচ্য। কি করি, কি করি, ভাবতেই দেখি অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল একজন। দু'পা গিয়েছে, এমন সময় মুলার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'একটু বাইরে যাচ্ছি।' গলা শুনে বুঝলাম, জাদেন।

'ছোট না বড়?'

'বড়!'

'দাঁড়া, আমিও আসছি,' বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুলার, 'চল।'

'আমিও যাই চলো,' লাফিয়ে উঠল কাট।

'আমিই বা তাহলে শুয়ে থাকি কেন,' উঠতে উঠতে বলল ডেটারিং।

ওরা রওনা হতেই ওদের পেছনে পেছনে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল

আরেকজন।

সারারাত ধরে চলল এরকম। একদল আসে, আরেকদল যায়। আসার সময় কেউ কেউ মাঝপথ থেকেই আবার সঙ্গ দেয় নতুন দলের। ভোর চারটের দিকে একেবারে রেকর্ড করে ফেললাম। সব ক'জন একসাথে। মাঠের ওপাশে এক সারিতে বসে একবারে একটা ফ্রন্ট খুলে বসলাম যেন।

ফরাসীদের গোলাবর্ষণ অবশ্য অনেক আগেই থেমে গেছে।

চোদ্দদিন ধরে আছি এখানে। সুখের সাগরে ভাসছি একেবারে। গোলাবর্ষণ হচ্ছে প্রতিদিনই। পুরো গ্রামটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সাপ্লাই ডাম্পের একটা অংশও ধসে গেছে। কোন অসুবিধা নেই আমাদের। সাপ্লাই-ডাম্প যতদিন আছে, আমাদেরও ততদিন থাকতে কোন আপত্তি নেই।

জাদেন আজকাল খুব খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। একটা চুরুট কিংবা সিগারেটের আধখানা খেয়েই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছু বললে নাকখানা আকাশের দিকে তুলে গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, 'আগে তো তাই করতাম।'

কাট আবার আরেক কাঠি সরেস। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই হাঁক লাগায়, খানসামা, টেবিলে খানা লাগাও। যেন বিরাট কোন রাজা-বাদশাহ হুকুম দিচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ওপর খাস চাকর হিসেবে হুকুম চালাই আর মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ি।

'আমার পায়ের নিচে কি যেন চুলকাচ্ছে, ক্রপ, দেখত উকুন-টুকুন বোধ হয়, বের করে মেরে ফেল ওটাকে,' লিয়ার পা-টা লম্বা করে বাড়িয়ে দিল ক্রপের দিকে। ক্রপ ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওকে নিয়ে ফেলল সিঁড়ির ওপর।

'জাদেন,' গম্ভীর গলায় বলল ক্রপ।

'কি?'

'ভদ্রতা শেখোনি?' ধমকে উঠল ক্রপ, 'ডাকলে সব সময় উত্তর নেবে "জী, স্যার" বলে, মনে থাকবে?'

আরও আটদিন পরে হুকুম হলো ফেরার। আহা রে, স্বর্গ থেকে বিদায়! দুটো বিরাট লরিতে মালপত্র বোঝাই করা হয়েছে। ক্রপ আর আমি ওই খাটটার মায়া ছাড়তে পারলাম না। তোশক বালিশ সুদ্ধ কোনরকমে ঠেলেঠুলে তুলে দিলাম লরিতে।

প্রত্যেকের ঘাড়ে একটা করে বড়সড়ো পোটলা। পছন্দসই খাবার-দাবার যতটুকু পেরেছি, ঠেসে ভরেছি। সবার পকেটে বোঝাই সিগারেট আর চুরুট। ক্রপ আর আমি শেষ মুহূর্তে লাল রঙের ভেলভেটে মোড়া চমৎকার দু'খানা আর্মচেয়ার তুলে দিলাম লরিতে। ও দুটোর স্থান হলো বিছানাটার ওপরে। আর্মচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলাম আমরা। বিছানার নীল মশারিটা দেখে মনে হচ্ছে চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। আমাদেরকে মনে হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ যাত্রা পার্টি। প্রত্যেকের মুখে লম্বা চুরুট। গম্ভীর, মন খারাপ সবারই। এমন স্বর্গসুখ ছেড়ে কারই বা যেতে মন চায়, তাও আবার ওই নরকে!

আমাদের মাঝখানে একটা খাঁচা, তার মধ্যে বিড়াল আর তার খাবার পাত্রটা। খাঁচার মধ্যে থেকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। মাঝে মাঝে গড়গড় করে উঠছে।

ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হয়ে গেল লরি। দুঃখ ভোলার জন্যে গান ধরলাম একসাথে। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে আছি সবাই। গোলা পড়ছে, মাঝে মাঝেই ফোয়ারার মত ছিটকে উঠছে মাটি আর ঘর বাড়ির টুকরো। তাকিয়েই থাকলাম যতক্ষণ দেখা যায়। একটা বাঁক ঘুরতেই আড়ালে চলে গেল গ্রামটা।

দিনকয়েক পরে আমাদের পাঠানো হলো একটা গ্রাম খালি করে দেবার জন্যে। রওনা হয়ে গেলাম। রাস্তায় দেখা হলো পালিয়ে আসা লোকজনের সাথে। বন্যার মত আসছে তো আসছেই, বাচ্চা-বুড়ো, নারী-পুরুষ সব। যে যা পেরেছে, নিয়েছে সাথে। পিঠে, প্যারাম্বুলেটরে, ঠেলায় করে মালপত্র নিয়ে চলেছে সবাই। কুঁজো হয়ে গেছে বেশির ভাগই, চোখে-মুখে গভীর দুঃখ-কষ্টের ছাপ। দেখলেই বোঝা যায়, সবকিছুর আশা ছেড়ে দিয়েছে ওরা, হার স্বীকার করে নিয়েছে।

বাচ্চারা মায়ের হাত ধরে হাঁটছে। মাঝে মাঝে কোন তরুণী, বাচ্চারা যাতে ঠিকমত হাঁটে সেদিকে লক্ষ রাখছে। বাচ্চাদের কারও কারও হাতে অদ্ভুত দর্শন সব পুতুল। নিঃশব্দে হাঁটছে সবাই যুদ্ধ যেন ওদের ভাষা কেড়ে নিয়েছে চিরতরে।

লাইন ধরে হাঁটছি আমরা। কারণ গোলাবর্ষণের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। যে গ্রামে অসামরিক লোকজন আছে, সেখানে ফরাসীরা গোলাবর্ষণ করবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত।

বাতাসে তীব্র শিষের শব্দে খানখান হয়ে গেল নিস্তব্ধতা। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে কেঁপে উঠল মাটি। চিৎকার, কান্নাকাটি ছুটোছুটিতে এক মুহূর্তে নরক গুলজার হয়ে উঠল। ঠিক তখনি গোলা পড়ল আমাদের পেছনের স্কোয়াডের মধ্যে।

মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লাম চারপাশে। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলাম। সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হলো আমার, অবচেতন মনেও বিপদের যে আগাম আভাস পাবার ক্ষমতা ছিল আমার, চলে গেছে সেটা। মনের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সব শেষ।' একমুহূর্ত পরেই আমার বাঁ পায়ের ওপর যেন চাবুকের বাড়ি মারল কেউ। সাথে সাথে পাশ থেকে আর্তনাদ করে উঠল ক্রপ।

চিৎকার করে বললাম, 'ক্রপ, শিগ্‌গির, সম্পূর্ণ খোলা মাঠ, পালা।'

কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল ও। আমিও দৌড়োতে লাগলাম ওর পাশে পাশে। দৌড়োতে দৌড়োতে সামনে পড়ল আমাদের চেয়ে উঁচু একটা বেড়া। ক্রপ কঞ্চিমত একটা কিছু ধরতেই ঠেলে তুলে দিলাম ওকে। পায়ে মোচড় লাগতেই চিৎকার করে উঠল ও। আমি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেড়ার ওপর চড়ার আগেই ওপাশে নেমে পড়ল ক্রপ। আমিও নামলাম লাফ দিয়ে। নেমেই দেখি সামনে ডোবা। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সারা শরীর ডুবে গেল ডোবার কাদা, পচা পাতা আর হাঁস মুরগির বিষ্ঠার মধ্যে। তার মধ্যেই কান পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে রইলাম। গোলা পড়ার আওয়াজ শুনলেই ডুব দেই, ফাটার পর মাথা তুলি কাদাপানি থেকে। বারদশেক এমন করার পর ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠলাম।

'চল যাই এখান থেকে,' যন্ত্রণামাখা অসহিষ্ণু গলায় বলল ক্রপ, 'আর খানিকক্ষণ থাকলে মারা পড়ব।'

'কোথায় লেগেছে তোর?'

'মনে হচ্ছে হাঁটুতে।'

'দৌড়োতে পারবি?'

'পারব মনে হয়।'

'চল তাহলে।'

ডোবা থেকে উঠেই রাস্তার পাশ দিয়ে দৌড়ানো শুরু করলাম। গোলাও আসতে লাগল পিছন পিছন।

রাস্তাটা গেছে অ্যামুনিশন ডাম্পে। ওখানে যদি গোলা পড়ে তো ধারে কাছে থাকলে ছাতু হয়ে যাব। সুতরাং ওদিকে যাওয়া যাবে না। দিক পাল্টালাম সাথে সাথে। আড়াআড়িভাবে ছুটলাম এবার।

ক্রপ ধপ করে বসে পড়ল মাটির মধ্যে। গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'তুই যা, আমি পরে আসছি।' বলেই শুয়ে পড়ল মাটিতে।

হাত ধরে টেনে তুললাম ওকে, 'শিগ্‌গির ওঠ, একবার বসলে আর উঠতে পারবি না। চল, আমি তোকে ধরে থাকব।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে, মাটিতে হুমড়ি খেয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম ছোট্ট একটা সেলারে। ওর পা-টা লম্বা করে রেখে মুখ ঘুরিয়ে রাখতে বললাম ওকে। ও মুখ ঘোরাতেই প্যান্টটা হাঁটুর ওপর তুলে দিলাম। হাঁটুর সামান্য ওপরে গভীর একটা ক্ষত। রক্ত পড়ছে অঝোর ধারায়। ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে খেয়াল হলো নিজের কথা। দেখি আমার প্যান্ট আর জামার হাতা লাল হয়ে উঠেছে। ক্রপ হাত লাগাল এবার। ব্যাণ্ডেজ করে দিল ঠিকঠাক মত।

মেঝেতে শুয়ে পড়ল ক্রপ। ওর নড়াচড়ার ক্ষমতা শেষ একেবারে। যে রকম আঘাত দেখলাম তাতে এতটা পথ দৌড়ে এল কি করে সেটাই আশ্চর্য। প্রাণের মায়া, বড় মায়া। মনে হয়, হাঁটু পর্যন্ত কাটা গেলেও হাতে ভর দিয়েই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পারি, পালাব।

আমার অবস্থাও বিশেষ সুবিধার না। হাঁটার মত শক্তিও নেই এখন। বুকে হেঁটে বেরোলাম সেলার থেকে। একটু পরেই দেখি অ্যাম্বুলেন্স

যাচ্ছে একটা, আহত সৈনিকে ভর্তি। চিৎকার করে থামালাম ওটাকে। স্ট্রেচারে করে তুলে নিল আমাদের। এক আর্মি মেডিক্যাল ল্যান্স কর্পোরাল পুঁচ করে অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশনের সুইটা ঢুকিয়ে দিল শরীরে।

ড্রেসিং স্টেশনে পৌঁছলাম। স্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিল আমাদের। ওর মধ্যেই আমি আর ক্রপ পাশাপাশি থাকার ব্যবস্থা করে ফেললাম। একটু পরেই এক বাটি স্যুপ দিয়ে গেল। বুভুক্ষুর মত চামচ ডোবালাম ওতে। কিন্তু এক চামচ মুখে দিতেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। থুঃ, এটা একটা স্যুপ হলো নাকি? আসলে গত ক'দিন চর্বচোষ্য খেয়ে খেয়ে মুখের স্বাদই বদলে গেছে। এখন কি আর এই জঘন্য স্যুপ মুখে দেয়া যায়? কিন্তু উপায়ও নেই। প্রচণ্ড খিদে পেটে। চোখকান বুজে খেয়ে ফেললাম ওটাই।

ক্রপকে বললাম, 'এবারে বাড়ি, তাই না?'

'আশা করতে থাকো। আমি শুধু জানতে চাই, আঘাতটা কতটা খারাপ।'

পাশাপাশি শুয়ে দু'জনেই। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল ব্যথা। খানিক পরে মনে হলো আগুন ধরে গেছে পায়ে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেতে লাগলাম।

'হাঁটুর কতটা ওপরে লেগেছে রে?' যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ক্রপ।

'কমপক্ষে চার ইঞ্চি ওপরে,' মিথ্যা বললাম আমি, আসলে এক ইঞ্চিও না।

'আমি ঠিক করে ফেলেছি, ওরা যদি পা কেটে ফেলে, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ নেই। সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে পারব না আমি।'

কিচ্ছু বললাম না। শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিসের জন্যে নিজেও জানি না।

বিকেলে আমাদের নিয়ে গেল কাটাকুটির ঘরে। ভয় পেয়ে গেলাম সাথে সাথে। শুনেছি, এখানকার অবস্থায় সামান্য আঘাত হলেও সার্জনদের

কাছে ড্রেসিং করার চেয়ে পা কেটে ফেলাটা নাকি অনেক সোজা। কেমারিখের কথা মনে পড়ল। ঠিক করলাম, যাই হোক না কেন, অজ্ঞান করতে দেব না আমাকে। দরকার পড়লে দু'এক জনের মাথা ফাটিয়ে দেব।

সার্জন ক্ষতটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখা শুরু করতেই ভীতিটা জেঁকে বসল মনের মধ্যে।

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে ফেলছি,' একেবারে মায়াদয়াহীন গলায় বলল সার্জন। প্রাণের সুখে খোঁচাচ্ছে ক্ষতটার মধ্যে। ব্যথার চোটে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার দশা হলো আমার।

একজন আর্দালি ট্রলিতে করে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এল। উজ্জ্বল আলোয় ঝক ঝক করছে ওগুলো। আমার কাছে মনে হলো কসাইয়ের ছুরি ওগুলো, সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দু'জন আর্দালি হাত চেপে ধরতেই ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিলাম ডান হাতটা। সোজা ঘুষি চালালাম সার্জনের চশমা লক্ষ্য করে। সময় থাকতে সরে গেল বলে লাগল না ঘুসিটা। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠল সার্জন 'ব্যাটাকে অজ্ঞান করো আগে।'

সাথে সাথে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'স্যার। স্যার; আর কিছু করব না, কিন্তু অজ্ঞান করবেন না আমাকে।'

'ঠিক আছে,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল সার্জন। যন্ত্রপাতিগুলো তুলে নিল ট্রে থেকে।

আর্দালি দু'জন শক্ত করে হাত চেপে ধরতেই কাজ শুরু করল সার্জন। মনে হলো ইচ্ছে করেই বেশি খোঁচাখুঁচি করতে লাগল। আমার ঘুসি মারার শাস্তি হিসেবে। ঘাম জমে গেল কপালে। ব্যথার চোটে টক লালা এসে গেল মুখে। মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। আর পারলাম না। লাথি মেরে সবকিছু ফেলে দেবার জন্যে তৈরি হবার আগেই আমার হাঁটুর ভেতর থেকে একটা স্প্লিন্টারের টুকরো বের করল সার্জন। মনে হলো আমার যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা দেখে খুশিই হয়েছে। মৃদু হাসি নিয়ে বলল, 'কালকেই বাড়ি যেতে পারবে আশা করি।' ধীরেসুস্থে প্লাস্টার করে দিল পায়ে। ফিরে এলাম ক্রপের কাছে।

'শুনতে পাচ্ছি, কালকে নাকি একটা হসপিটাল ট্রেন আসবে।' ক্রপকে বললাম, 'দেখি, মেডিক্যাল সার্জেন্ট মেজরকে ম্যানেজ করতে পারি কিনা, তাহলে আমি আর তুই একসাথে থাকতে পারব।'

ক্রপ মাথা তুলল বিছানা থেকে। বলল, 'দেখ চেষ্টা করে, পারিস কিনা।'

একসময় ফাঁক পেয়ে সার্জেন্ট মেজরের হাতে দুটো চমৎকার চুরুট চালান করে দিয়ে বললাম, 'শুনলাম, কাল নাকি একটা হসপিটাল ট্রেন আসছে?'

হাসলেন সার্জেন্ট মেজর। বুঝলেন কি বলতে চাইছি। বললেন, 'তোমাদের কাছে এসব চুরুট আরও আছে নাকি?'

'অনেক, আমার কাছে, ওর কাছেও,' ক্রপকে দেখিয়ে বললাম, 'তবে শুনেছি হসপিটাল ট্রেনের জানালা দিয়ে একসাথে দু'জনের দেয়া চুরুটের স্বাদই নাকি আলাদা।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন সার্জেন্ট মেজর, 'ঠিক আছে, হবে।' চলে গেলেন উনি।

সারা রাত্রি একমিনিটের জন্যেও ঘুমোতে পারলাম না যন্ত্রণায়। আমাদের ওয়ার্ডেই সাতজন মারা গেল। একজন তো প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উচ্চ স্বরে ভাঙা গলায় গান ধরল, চালাল গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি না ওঠা পর্যন্ত। আরেকজন বিছানা থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল জানালার ওপর। ঝুলে থাকল ওভাবেই, যেন মৃত্যুর আগে শেষবারের মত বাইরের দৃশ্য দেখতে চেয়েছিল সে।

প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছি স্ট্রেচারের ওপর। দু'ঘণ্টা ধরে। ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি।

কাল থেকে সার্জেন্ট মেজর এমন ভাবে আমাদের দেখাশোনা করছেন যে আমরা যেন ওঁর নিজের ছেলে। শুধু যে চুরুটের জন্যেই করছেন এসব তা হয়তো নয়। কিন্তু কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না একেবারে। সেজন্যেই কষ্ট লাগছে বেশি। মাঝে মাঝেই এমন ভাবে চুরুটের বাক্সটা বের করছি যেন সার্জেন্ট মেজরের চোখে পড়ে।

ভাবখানা এমন যেন আনমনেই বের করে ফেলেছি। প্রতিবার বের করার পরই একটা করে চুরুট এগিয়ে দিচ্ছি ওঁর দিকে। এগুলো অ্যাডভান্স।

খানিক পরেই শুরু হলো বৃষ্টি। একে তো প্ল্যাটফর্মে নেই ছাদ, তার ওপর আমাদের কম্বলগুলোও পাতলা। ভিজে একেবারে ঝোড়ো কাক হয়ে যেতে হবে আমাদের। অ্যাডভান্স চুরুট কাজ দিল এসময়। সার্জেন্ট মেজর একটা ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে ঢেকে দিলেন আমাদের।

শুয়ে শুয়ে পাশ ফিরলাম, ডাকলাম, 'ক্রপ, আমাদের সেই বাদশাহী পালঙ্ক আর বিড়ালটা–।'

'আর ভেলভেটের চেয়ারগুলো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। আহা, কী চমৎকার জিনিসই না ছিল আমাদের। লাল ভেলভেট মোড়া চেয়ারগুলোতে রোজ বিকেলে বসতাম আমরা। তখন একেকজনের ভাবভঙ্গিই বদলে যেত একেবারে। পরের দিকে ওগুলো ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দিতাম, প্রতি ঘণ্টায় একটা সিগারেট। ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছিল।

বিষণ্ণ স্বরে বললাম, 'আর আমাদের খাবারদাবার ভর্তি পোঁটলাগুলো!'

মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ট্রেনটা যদি একদিন পরে আসত, তাহলেই কাট আমাদের খুঁজে বের করে ফেলত। তখন তো জিনিসপত্র সব আমাদের হাতের মুঠোয়। কপাল আর কাকে বলে! আমাদের ব্যাগের মধ্যে শূকরের রোস্ট পড়ে আছে, আর আমাদের খেতে হচ্ছে হাসপাতালের দেয়া পানির মত স্যুপ। কিন্তু শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে ওকথা আর ভাবতেও ইচ্ছে করছে না।

ভোরবেলা এসে পৌঁছল ট্রেন। স্ট্রেচারগুলো ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। সার্জেন্ট মেজর তদারক করলেন আমাদের নিয়ে যাবার সময়। ফলে একই কামরায় জায়গা পেলাম আমরা। আমি ওপরের বাঙ্কে, ক্রপ নিচেরটাতে।

রেডক্রসের নার্সরা ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। একজন এগিয়ে এল আমাদের কাছে।

'হিস্‌...স্‌...স্‌,' শিষ দিয়ে উঠলাম আমি।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সিস্টার।

বিছানার দিকে তাকালাম একঝলক। বরফের মত ধবধবে শাদা লিনেনের চাদর দিয়ে ঢাকা বিছানাটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এইমাত্র ভাঁজ খুলে রাখা হয়েছে ওখানে। নিজের জামার দিকে তাকালাম. ছ'সপ্তাহ ধোয়া হয়নি শার্টটা, তারপর ডোবায় আর গোলার গর্তে থেকে থেকে ওটার চেহারা যা দাঁড়িয়েছে তা বলার নয়।

'কি ব্যাপার, একা উঠতে পারবে না?' মৃদু স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল সিস্টার।

'খুঁব পারব,' অস্বস্তির সাথে বললাম, 'তবে এই চাদরটা সরিয়ে নিতে হবে আগে।'

'কেন?'

কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া শুয়োরের মত মনে হলো নিজেকে। বললাম, 'মানে, আমি মানে আমার...।'

'জামা-কাপড় খুব নোংরা, এই তো?' হেসে উঠল সিস্টার, 'কোন অসুবিধা নেই, আমরা ধুয়ে নেব আবার।'

'না, মানে হ্যাঁ, মানে ঠিক তা না...,' আসল কথাটা বলতেই পারলাম না। আসলে এইসব ধোপ দুরস্ত বিছানাপত্রের কাছে বড্ড বেমানান লাগছে নিজেকে। মনের কথাটা বোধহয় বুঝল সিস্টার। বলল, 'তোমরা যদি ট্রেঞ্চের মত জায়গায় ঘুমোতে পারো, আমরাও তাহলে এরকম একটা চাদর ধুয়ে নিতে পারব। নাও ওঠো, শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি।'

তাকিয়ে তাকিয়ে সিস্টারের চলে যাওয়া দেখলাম। সুন্দর দেখতে, হাঁটার ভঙ্গিটাও। নিটোল শরীর, হাসিটিও মিষ্টি। দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। বয়স খুব বেশি হলে বছর পঁচিশেক হবে।

কিন্তু সুন্দরীটা জ্বালাল দেখছি। একটু পরে ঘুরে এসে আমাকে একইভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো আবার?'

'কিচ্ছু না, মানে...,' আবার আটকে গেল কথাটা।

'মানে কি?'

বলেই ফেললাম কথাটা, 'মানে সার, শরীরে উকুন ভর্তি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল সিস্টার, 'একদিন ওরাও না হয় আরামেই

থাকল। ট্রেঞ্চে থাকতে ওদেরও তো কষ্ট হয়!'

ব্যস, আর পায় কে। চড়ে বসলাম ওপরের বাঙ্কে। আয়েস করে গায়ের ওপর চাদরটা টেনে দিলাম।

নিঃশব্দে একটা হাত ঢুকে গেল চাদরের নিচে। চুরুটের বাক্সটা পেতেই বেরিয়ে এল সেটা। বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন সার্জেন্ট মেজর।

ঘণ্টাখানেক পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা দিল ট্রেন।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না কোথায় আছি। দুলুনিতে মনে হলো, ছোটবেলায় চলে গেছি, দোলনায় দোল দিয়ে গান শোনাচ্ছে মা। পরমুহূর্তেই পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলাম। মুখটা বের করে ডাকলাম, 'ক্রপ।'

'কি রে?'

'ঘুমিয়েছিস?'

'না।'

চুপচাপ থাকলাম। বুঝলাম, যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারেনি ও। একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ল্যাট্রিনটা কোন্‌দিকে জানিস?'

'যতদূর মনে হয়, দরজাটার ডানদিকে।'

'দাঁড়া, দেখে আসি অবস্থাটা।'

কামরাটা অন্ধকার। সব লাইট নিবিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘষটে ঘষটে বিছানার ধারে এসে একটা পা ঝুলিয়ে দিলাম নিচে। কিচ্ছু বাধল না পায়ে। আরেকটু পা নামিয়ে কিছু খুঁজতে যেতেই পিছলে গেল শরীরটা। ধড়াম করে পড়লাম মেঝেতে। ক্রপ জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, এত তাড়াতাড়ি নামলি যে, খুব জোরে চেপে গেছে নাকি?'

'তোর মাথা,' ঝাঁঝাল গলায় বললাম আমি, 'ইস্, মাথার মধ্যে বোধহয় আলু উঠে গেছে একটা।'

পেছনের দিকের একটা দরজা খুলল। আলো এসে পড়ল কামরার মধ্যে। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই সুন্দরী সিস্টার। আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'ও-না বিছানা থেকে পড়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল ক্রুপ।

আস্তে করে এগিয়ে এল সিস্টার। কপাল দেখে, নাড়ি দেখে বলল, 'জ্বর তো নেই দেখা যাচ্ছে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করল সিস্টার, 'স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?'

'না, না, আসলে...' আবার কথা আটকে গেল আমার।

সিস্টার গভীর চোখে নিরীক্ষণ করা শুরু করল আমাকে। আসলে সিস্টার এত সুন্দরী যে ওর কাছে কি করে বলি যে আমি কি চাই।

ঠেলেঠুলে আবার বিছানায় উঠিয়ে দিল সিস্টার। এ-ও ভাল। ও চলে গেলেই আবার নামার চেষ্টা করব আমি। আসলে সিস্টারটা কমবয়েসী আর সুন্দরী হওয়াতেই হয়েছে যত গোলমাল। দেখতে বদখত কিংবা বুড়ি হলে কখন আসল কথাটা বলে ফেলতাম।

ক্রুপ এগিয়ে এল আমাকে বাঁচাবার জন্যে। ওর লজ্জাশরমের বালাই নেই বললেই চলে। কে কি মনে করল না করল, তার ধারই ধারে না ও। সিস্টার চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাকল ও। সিস্টার ঘুরে দাঁড়াতেই বলল, 'সিস্টার, ও একটু...,' বলেই চুপ করে গেল। কথাটা কি করে বলা যায়, ভাবছে ও। শেষ পর্যন্ত স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা, 'মানে ও একটু বাইরে যেতে চায়।'

'ও এই কথা, তা তার জন্যে তো আর ওই পা নিয়ে নিচে নামতে হবে না।' আমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌টা আনব?'

লজ্জায় কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল আমার। ফ্রন্টে এগুলো কোন ব্যাপারই ছিল না, অথচ ওর সামনে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আমার। চুপচাপ আছি দেখে সিস্টার বলল, 'ঠিক আছে, বলো ছোট না বড়?'

কান দিয়ে ভাপ বেরোতে লাগল এবার। কোনমতে বললাম, 'না না, একটুখানি, মানে ছোট।'

চলে গেল সিস্টার। একটু পরেই একটা বোতল এনে দিল আমার হাতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অভ্যেস হয়ে গেল ভালমত। সকালের মধ্যে সকলেই একবার না একবার ব্যবহার করে ফেলল ওরকম বোতল।

বেশ আস্তে আস্তে যাচ্ছে ট্রেনটা। মাঝে মাঝেই থামছে লাশ নামিয়ে

দেবার জন্যে।

ক্রপের গা গরম, জ্বর আসছে। আমার অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগছে না। পায়ে তেমন ব্যথা নেই কিন্তু মুশকিল হয়েছে উকুনগুলোকে নিয়ে। প্লাস্টারের মধ্যে প্রাণের সুখে কুটকুট করে কামড়াচ্ছে আর আমি প্লাস্টারের ওপরে খামচাখামচি করে মরছি। মাঝে মাঝে চুলকানির চোটে গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

সারাদিন ধরে ঘুমোলাম। পাহাড়, বন, নদী পেরিয়ে দ্রুত ছুটছে ট্রেন। তৃতীয় দিনে পৌঁছলাম হারবেজথ্যালে। সিস্টার জানাল, ক্রপকে সামনের স্টেশনে নামিয়ে নেয়া হবে। কারণ ওর জ্বর এসে গেছে জোরেসোরে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ট্রেনটা কতদূর পর্যন্ত যাবে?'

'কোলন পর্যন্ত।'

'ক্রপ,' সিস্টার চলে যেতেই ডাকলাম আমি, 'দেখিস, একসাথেই থাকব আমরা, ব্যবস্থা একটা করছি, দাঁড়া।'

সিস্টার পরবর্তী রাউণ্ডে আসতেই নাক-মুখ চেপে ধরে দম বন্ধ করে রাখলাম। খানিকপরই লাল হয়ে উঠল চোখমুখ, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল কপালে। সিস্টার কাছে এসে এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা করছে?'

গোঙাতে গোঙাতে বললাম, 'হ্যাঁ, হঠাৎ করে।'

সিস্টার মুখের মধ্যে একটা থার্মোমিটার পুরে দিয়ে চলে গেল। চোখের আড়াল হতেই মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বের করে ফেললাম। দু'আঙুলে পারদের জায়গাটা ঘষতে লাগলাম দ্রুত। একশো ডিগ্রি পর্যন্ত উঠল জ্বর। নাহ্ এত কমে হবে না। ম্যাচের কাঠি জ্বাললাম একটা। সাবধানে ধরতেই জ্বর উঠে গেল একশো দুই-এ। এসব বিদ্যা কাটের কাছে শেখা। কাজে লেগে গেল আজ।

সিস্টার আসার আগেই মুখে পুরে দিলাম থার্মোমিটারটা। সিস্টারের শাদা পোশাকের আভাস পেতেই শুরু হলো আমার ছটফটানি। দ্রুত ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে গোঙাতে শুরু করলাম, 'উহ্, আহ্, মরে গেলাম, পানি, মা।'

সিস্টার একটা কাগজে আমার নামে কি যেন লিখল। বুঝলাম কেল্লা

ফতে।

পরের স্টেশনে দু'জনকেই একসাথে নামিয়ে দিয়ে গেল।

ক্যাথলিক হাসপাতালে জায়গা হলো আমাদের। একই রুমে পাশাপাশি। ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে। ভাল খাবার আর ভাল চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালটার সুনাম আছে বেশ।

ট্রেন থেকে যতজন নেমেছি আমরা, তা দিয়েই প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে হাসপাতালটা। আমাদের মধ্যে বেশ ক'জনের অবস্থা খুব খারাপ।

প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার কম বলে আমাদের পরীক্ষা করল না কেউ। আশপাশের বেডের রোগীর সাথে গল্প করেই কাটালাম সময়টা।

খুব খারাপভাবে কাটল রাত্রিটা। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না কেউই। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত এসেছিল, আলো ফুটতেই কেটে গেল। রুমের দরজাটা খোলা। করিডর থেকে জোরাল আওয়াজ ভেসে আসছে। তাকিয়ে দেখি অন্যেরাও জেগে উঠেছে।

'সিস্টাররা প্রার্থনা করছে,' বলল একজন। ও কয়েকদিন ধরে আছে এখানে, সেজন্যে জানে ব্যাপারটা। 'ওরা এটাকে বলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। সবাই যাতে তার ভাগ পায় সেজন্যে দরজাটা খোলা রেখে দেয়।'

খুব ভাল কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু অসুস্থ শরীরে সারারাত জেগে থাকার পর ভোরের দিকে যার চোখটা কেবল একটু লেগে এসেছে, তার কাছে এটা প্রচণ্ড বিরক্তিকর। আমার তো গা মাথা ব্যথা করছে।

'যত্তো সব,' গজ গজ করে উঠলাম আমি। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

'এখানে যাদেরকে রাখে, তাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল, সেজন্যেই এখানের করিডরটাকেই প্রার্থনার জায়গা বানিয়েছে।'

ক্রুপ গুঙিয়ে উঠল। মুহূর্তে মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। চিৎকার করে উঠলাম, 'থামাও!'

মিনিটখানেক পরে একজন সিস্টার এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। শাদা

কালো পোশাকে তাকে মনে হচ্ছে চমৎকার একটা টি-কোজি। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

'আমরা বাইরে প্রার্থনা করছি, সেজন্যেই দরজাটা খোলা রাখা হয়েছে।'

'আমরা ঘুমাব এখন,' বলল একজন।

'নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা ভাল,' হাসি হাসি মুখে বলল সিস্টার, 'তাছাড়া এখন সাতটা বেজে গেছে।'

ক্রপ গোঙানির মধ্যে চিৎকার করে উঠল, 'দরজাটা বন্ধ করো!'

রাগের চোটে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। কিন্তু সিস্টারের মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই বোধহয়। বোকার মত জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমরা তো তোমাদের জন্যেও প্রার্থনা করছি।'

'দরজাটা বন্ধ করো,' সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন। চলে গেল সিস্টার, দরজাটা খোলা রেখেই।

রাগে জ্বালা করে উঠল সারা শরীর। বললাম, 'আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণব, এর মধ্যে যদি দরজা বন্ধ না করে তো ছুঁড়ে মারব যা পাই।'

'আমিও,' সায় দিল আরেকজন।

মনে মনে পাঁচ পর্যন্ত গুণলাম। তারপর পাশের টুল থেকে বোতল তুলে নিলাম একটা। তাক করে দরজা সোজা ছুঁড়ে মারলাম। ঝন্‌ঝন্ করে ভাঙল বোতলটা, হাজারটা কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। থেমে গেল প্রার্থনা। একটু পরেই সব ক'জন সিস্টার একসাথে ঢুকল রুমের মধ্যে। বোঝানোর চেষ্টা করল ব্যাপারটা। একসাথে চিৎকার করে উঠল সবাই, 'দরজা বন্ধ করো।'

ঘুরে দাঁড়াল সিস্টাররা। একে একে বেরিয়ে গেল। সবচেয়ে শেষের জন নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। যাবার আগে বলে গেল 'পাপী!'

যাকগে, জিতে তো গেছি।

বিকেলের দিকে একজন ইন্সপেক্টর এল জেরা করতে। খুব হম্বিতম্বি

করল খানিকক্ষণ। ভয় দেখাল এটা করব সেটা করব বলে। পাত্তা দিলাম না ওর কথায়। হসপিটাল ইন্সপেক্টর আর কমিশারিয়েট ইন্সপেক্টর একই কথা। যতই হামবড়া ভাব দেখাক না কেন, ও তো ক্লার্ক ছাড়া কিছুই নয়। কচুটা করবে আমাদের। সুতরাং চুপচাপ থাকলাম। করুক বক্‌বক্‌, যত পারে। তাতে যদি কানের দু'একটা পোকা বেরিয়ে যায়, যাক না।

'বোতল ছুঁড়েছে কে?' ধমকে উঠল ও।

বলব কি বলব না ভাবার আগেই ওপাশের বেড থেকে একজন বলে উঠল, 'আমি ছুঁড়েছি।'

দেখি খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর, 'কে, তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কারণ অহেতুক আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে। অনেকবার বলেছি দরজা বন্ধ করতে, করেনি কেউ। তাই শেষ পর্যন্ত বোতল ছুঁড়েছি। এছাড়া আর কি করা যায়, ভেবে পাইনি।' একেবারে নাটকের ডায়লগ ঝেড়ে দিল ও।

'কি নাম তোমার,' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর।

'রিইনফোর্সমেন্ট রিজার্ভিস্ট জোশেফ হ্যামাখার।'

চুপসে গেল ইন্সপেক্টর। একটা কথাও না বলে চলে গেল ঘর থেকে।

ইন্সপেক্টর বেরিয়ে যেতেই ছেঁকে ধরলাম হ্যামাখারকে 'তুমি নিজে বোতল ছুঁড়েছ বলতে গেলে কেন?'

হাসল ও। বলল, 'আরে, বাদ দাও ওসব। আসলে আমার একটা সুটিং লাইসেন্স আছে।'

এতক্ষণে আসলে ব্যাপারটা বুঝলাম। যার সুটিং লাইসেন্স আছে, সে যা খুশি তাই করতে পারে।

'ব্যাপারটা হয়েছিল কি, মাথার মধ্যে ঘা খেয়েছিলাম জোরেসারে, সেজন্যে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে যে সবসময় আমি বুঝেশুনে সব কাজ করতে পারি না। ব্যস্‌, সেই থেকেই রাজা বনে গেছি। কেউ আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। আর কিছু করলেও বলতে পারে না

কিছু। খাসা আছি!'

হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা।

'তাছাড়া আরও বেশি করে নিজের নামটা বললাম এইজন্যে যে বোতল ছোঁড়াটা চমৎকার হয়েছিল। ফাঁকতালে ক্রেডিটটা নিজেই নিয়ে নিলাম। কাল যদি দরজা খোলা রাখে তো আবার বোতল ছুঁড়ব।'

খুশি হয়ে উঠল সবাই। এতদিনে পাওয়া গেছে আসল লোক। হ্যামাখার থাকতে আর চিন্তা কিসের?

খানিক পরেই নিঃশব্দে রবারের চাকা লাগানো ট্রলি ঠেলে নিয়ে এল ওয়ার্ডেন। নিয়ে গেল আমাদের। প্রথমেই ব্যাণ্ডেজগুলো খোলা হলো। যন্ত্রণায় পানি এসে গেল। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেললাম। বলির পাঁঠার মত চিৎকার শুরু করল কেউ কেউ।

আটজন আছি আমরা এক রুমে। আমার পাশে ক্রপ, ওর পাশে পিটার। কালো কোঁকড়ানো চুল, আমাদের মধ্যে ওরই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। ওর পরে ফ্রাঞ্জ ভেখটের, হাতে ঘা খেয়েছে, দেখে তেমন সিরিয়াস কিছু মনে হয় না। কিন্তু তৃতীয় রাতেই চিৎকার করে উঠল ও। শিগ্‌গির ঘণ্টা বাজাতে বলল। মনে হচ্ছে রক্তপাত শুরু হয়েছে হাত থেকে।

জোরে ঘণ্টা বাজালাম আমি। অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। নাইট সিস্টারের পাত্তা নেই। নিশ্চয়ই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে কোথাও। আমরা কতবার করে বললাম আমাদের রুমে আজ সারারাতের জন্যে একজন সিস্টার দেবার জন্যে। নতুন ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে, সেজন্যে আজকের রাতটাই সবচেয়ে কষ্টকর হবে। তাছাড়া কতজনের কত কি দরকার হয়, কেউ পা এদিকে রাখতে চায়, কেউ ওদিকে রাখতে চায়, কেউ পানি খেতে চায়, কারও বালিশটা ঠিক করে দিতে হয়।

এখনও সিস্টারের পাত্তা নেই। দরজার কাছে বেড়ে যে শুয়ে ছিল, দরজাটা খুলে দড়াম করে বন্ধ করে দিল রাগে। তাতেও যদি কানে ঢোকে কারও। কিন্তু কোন লাভ হলো না। সিস্টার যদি শুনেও থাকে, তাহলে মনে করেছে যে সকালের মত ব্যাপার ঘটেছে কিছু একটা।

সেজন্যেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছে নিশ্চয়।

ভেখটের বলল, 'আবার ঘণ্টা বাজাও দেখি।'

বাজালাম। কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমাদের পুরো উইং-এ একজন মাত্র নাইট সিস্টার। সম্ভবত অন্য কোন রুমে কিছু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, সত্যি সত্যিই কি রক্ত পড়া শুরু হয়েছে? না হলে সিস্টার এসে খ্যাচখ্যাচ শুরু করবে।'

ভেখটের কাতর গলায় বলল, 'ব্যাণ্ডেজ ভিজে গেছে, কেউ একটা লাইট জ্বালাতে পারো নাকি?'

উত্তর দিলাম না কেউ। ওটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমরা কেউ হাঁটতে পারি না। সুইচটা যে দিকে, তার কাছে কোন বেড নেই। তাছাড়া সুইচটা অনেকটা উঁচুতে।

হাত অবশ না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার বোতামটা চেপে ধরে থাকলাম। কেউ এল না। মনে হচ্ছে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর গভীর ঘুমে অচেতন আছে সব। তাছাড়া সকালে উঠে তো আবার প্রার্থনায় যোগ দিতে হবে।

'একটা বোতল ভাঙব নাকি?' জিজ্ঞেস করল হ্যামাখার।

'ঘণ্টার আওয়াজই শুনছে না, তো বোতল!'

শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলল। বিড়বিড় করতে করতে ভেতরে ঢুকল বুড়ি একজন নার্স। আলোটা জ্বেলে ভেখটেরের অবস্থা দেখে ঝাঁঝাল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ডাকল না কেন আমাকে?'

একসাথে কথা বলে উঠলাম কয়েকজন, 'অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছি আমরা, কেউ আসে না।'

অনেক রক্ত পড়েছে ভেখটেরের। রক্তে বিছানার একটা পাশ পুরোপুরি ভিজে গেছে। সকালে দেখি, ওর চেহারা একেবারে হলুদ হয়ে গেছে, অথচ গতকাল বিকেলেই ওকে একেবারে তরতাজা দেখাচ্ছিল।

এর পর থেকে নাইট সিস্টাররা মাঝে মাঝেই ঘুরে যেত আমাদের রুমে।

ভেখটেরের অবস্থা আর ভাল হলো না। একদিন ট্রলিতে করে নিয়ে গেল

ওকে। কিন্তু ফেরত এল না। হ্যামাখার বেশ কিছুদিন ধরে আছে ওখানে, ও জানে সবকিছু। বলল, 'ওকে আর দেখতে হচ্ছে না, মড়ার ঘরে নিয়ে গেছে ওকে।'

ক্রপ জিজ্ঞেস করল, 'মড়ার ঘর মানে?'

'মড়ার ঘর মানে, এই বিল্ডিং-এর শেষে ছোট্ট একটা ঘর আছে, একেবারে মর্গের সাথে, ওটাকেই বলে মড়ার ঘর। দুটো বেড আছে ওখানে। যাদের একেবারেই বাঁচার আশা নেই, তাদেরকে ওখানে রাখে।'

'কিন্তু ওখানে নিয়ে করেটা কি?'

'বেশি কিছু করতে হয় না, মরে গেলে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। কত সহজে ঝামেলা চুকে গেল। তবে আমার মনে হয়, ওয়ার্ডে মারা গেলে অন্য রোগীরা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্যে ওদের আলাদা করে রাখে।'

'কিন্তু ভেখটেরের কি হবে?'

'কি আর হবে, কপালে যা আছে, তাই হবে। তবে ও নিয়ে ভাবার মত অবস্থা ওর নেই।'

'মড়ার ঘরের কথা সবাই জানে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'যারা বেশ কিছুদিন ধরে আছে, তারা জানে।'

বিকেলেই ভেখটেরের বিছানায় নতুন একজন এল। কয়েকদিন পরে ওকেও নিয়ে গেল ট্রলিতে করে। দিন কয়েকের মধ্যেই কত যে যাওয়া আসা দেখলাম।

মাঝে মাঝে এর ওর আত্মীয়স্বজন আসে। বিছানার পাশে বসে নিচুস্বরে কথা বলে, নয়তো কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় এক বুড়ি এল তার নাতিকে দেখতে। কিছুতেই যাবে না সে, রাতে নাতির কাছে থাকবে। বোঁচকা-বাচকি নিয়ে এসেছে সেজন্যে। বহু কষ্টে ঠেলেঠুলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বাড়িতে। পরদিন ভোরবেলা চলে এসেছে আবার, হাতে আপেলের ঠোঙা। এসে দেখে ওর নাতির বিছানায় অন্য একজন শুয়ে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটল মর্গে। পরে এসে আমাদের হাতে আপেলের ঠোঙাটা দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে চলে গেল।

পিটারের অবস্থা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল একদিন। প্রচণ্ড জ্বর, মাঝে মাঝে প্রায় বেহুঁশ হয়ে যায়।

একদিন ট্রলি এসে থামল ওর বিছানার পাশে।

'কোথায় নিয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ব্যাণ্ডেজ করতে।'

টেনেটুনে ট্রলিতে শোয়ানো হলো ওকে। তখনি ভুলটা করল সিস্টার। আবার যাতে আসতে না হয় সেজন্যে ওর টিউনিকটা নিল, কিন্তু রাখল ট্রলির ওপরে। সাথে সাথে বুঝে গেল পিটার। চিৎকার করে ট্রলি থেকে গড়িয়ে নামতে চাইল ও, 'থাম, রেখে যাও আমাকে।'

ওয়ার্ডবয়গুলো ঠেলে নিয়ে চলল ট্রলি। ফুটো ফুসফুস নিয়েই আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগল ও। 'আমি মড়ার ঘরে যাব না, আমি মড়ার ঘরে যাব না।'

সিস্টার বলল, 'মড়ার ঘরে কে যাচ্ছে? আমরা তো ব্যাণ্ডেজ করতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহলে আমার জামা-কাপড় নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

চুপ করে রইল সিস্টার। কোন সন্দেহই রইল না আর। কান্নাজড়ানো ভাঙা গলায় পিটার বলল, 'রেখে যাও আমাকে, আমি মড়ার ঘরে যাব না।' দরজার কাছে আসতেই খামচে ধরল দরজার পাল্লা। ওয়ার্ডবয় আস্তে করে ছাড়িয়ে দিল হাতটা। শেষ মুহূর্তে মাথা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল ও। দু'চোখ ভর্তি পানি। কোন রকমে বলল, 'আমি আবার ফিরে আসব, দেখো, আবার ফিরে আসব।'

ও চলে যাবার পর বহুক্ষণ একটা কথাও বলতে পারলাম না কেউ। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট হলো ওর জন্যে। মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথা বলে উঠল হ্যামাখার, 'কতজনই তো ওকথা বলে যায়, এখন পর্যন্ত তো কেউ ফেরত এল না!'

দিন কয়েক পরেই আমাকে নিয়ে গেল ট্রলিতে করে। ব্যাণ্ডেজ করার ওয়ার্ডে নিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যা করার করল। পরের দুটো দিন বমি করে কাটালাম। একটু সুস্থ হবার পর একদিন সার্জনের সেক্রেটারি জানাল, আমাদের হাড় নাকি ঠিকমত জোড়া লাগেনি। আরেকজনেরও

নাকি এমন হয়েছিল। বাঁকা হয়ে গিয়েছিল পা, এখন আবার হাড় ভেঙে গেছে। শুনে সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। জানি না, কপালে কি আছে!

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হলো। ক্রপের পা কেটে বাদ দিয়েছে। একেবারে উরু থেকে। অপারেশনের পর থেকে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ও, কোন কথাই বলে না কারও সাথে। এমনকি আমার সাথেও না। একবার শুধু বলেছিল, একটা রিভলভার পেলে জীবনটা শেষ করে দিত ও।

নতুন রোগী এসেছে অনেক। আমাদের রুমে দু'জন অন্ধ রোগী এসেছে। ওদের মধ্যে একজন অল্পবয়েসী মিউজিশিয়ান। খাবার সময় সিস্টাররা ওকে খাইয়ে দেয়, কিন্তু কখনও ছুরি ব্যবহার করে না। একবার নাকি ছিনিয়ে নিয়েছিল হাত থেকে। কিন্তু এত সতর্কতার মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল একসময়। একদিন ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে ডাক পড়ায় কাঁটাচামচটা প্লেটের ওপর রেখেই উঠে গেছে সিস্টার, হাতড়ে হাতড়ে ও তুলে নিল কাঁটাচামচটা। ডান হাতে শক্ত করে ধরে ঘ্যাচ করে নামিয়ে আনল বুকের ওপর। খাটের নিচ থেকে একটা জুতো নিয়ে ওটার গোড়ালি দিয়ে ঠুকে ঠুকে আরও গভীরে নামিয়ে দিতে লাগল।

চোখের সামনে দেখলাম সব, কিচ্ছু করতে পারলাম না। চিৎকার করে উঠলাম সবাই। ছুটে এল লোকজন। শেষে তিনজন মিলে টেনে বের করল চামচটা। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, আগেই হয়ে গেছে। কাঁটার ভোঁতা মাথাগুলো গভীরভাবে ঢুকে গেছে হৃৎপিণ্ডে। সারারাত ধরে এমন চিৎকার করল যে দু'চোখের পাতা এক করতে পারল্যম না কেউই। সকালবেলায় চোয়াল আটকে গেল ওর।

মাঝে মাঝে আশেপাশের বেডগুলো খালি হয়ে যায়, আবার ভর্তি হয়। দিনের পর দিন কাটছে এভাবে। সারাক্ষণ মৃত্যুভয়, চিৎকার, গোঙানি আর মুমূর্ষু রোগীর ঘড়ঘড়ানি শুনতে শুনতে পাগল হবার দশা। মাঝে মাঝে এত রোগী আসে যে মড়ার ঘরেও জায়গা হয় না। তখন রুমের মধ্যেই মারা যায় অনেকে। আমাদের রুমেই মরল কতজন।

মাঝে মাঝে এত বেশি মারা যায় যে তাদের মধ্যে অনেকে থাকে যাদের সিস্টাররা পরীক্ষাই করতে পারেনি।

একদিন আমাদের রুমের দরজা খুলে গেল। ট্রলি ঢুকল একটা। ট্রলির ওপর শুয়ে আছে পাতলা, ফ্যাকাসে চেহারার একটা লোক। কোঁকড়ানো চুল। হাসি হাসি মুখে তাকাল আমাদের দিকে। পিটার। মড়ার ঘর থেকে ফিরে এসেছে। খুশি হয়ে উঠলাম সবাই। ওকে ওর আগের বেডেই থাকতে দেয়া হলো।

'কিহে, বলেছিলাম না-যে ফিরে আসব আবার?' হ্যামাখারের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল পিটার।

'তাইতো দেখছি,' লজ্জিত হাসি দিয়ে বলল হ্যামাখার, 'তোমার নাম এই হাসপাতালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

আমাদের কয়েকজনকে মাঝে মধ্যে উঠে দাঁড়াবার অনুমতি দিয়েছে। একজোড়া ক্র্যাচ পেয়েছি আমি এদিক ওদিক সামান্য হাঁটাহাঁটি করার জন্যে। কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার করি না ওগুলো। কারণ হাঁটতে গেলেই ক্রুপ স্থির দৃষ্টিতে যেভাবে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, তাতে অস্বস্তি লাগে, কষ্টও লাগে ওর জন্যে। সেজন্যে মাঝে মাঝে করিডরে চলে যাই। অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি ওখানে।

আমাদের নিচের ফ্লোরে পেট, শিরদাঁড়া, মাথায় আঘাত পাওয়া কিংবা যাদের দুটো হাত বা পা-ই কেটে ফেলতে হয়, তাদের বিভাগ। আমাদের তলার ডানপাশে নাক, কান, ঘাড় কিংবা চোয়ালের আঘাত আর গ্যাসে আক্রান্তদের বিভাগ। বামপাশে চোখ, ফুসফুস, নিতম্ব, কিডনী, অন্ত্র, আর হাড়ের জোড়ায় আঘাত প্রাপ্তদের বিভাগ। এখানে এলে বোঝা যায় যে মানুষ কত জায়গায় আঘাত পেতে পারে।

আমাদের ফ্লোরে দু'জন মারা গেল টিটেনাসে। বীভৎস দৃশ্য। চামড়া হলুদ হয়ে গেছে, হাত পা শক্ত হয়ে বেঁকে গেছে, খোলা চোখ দুটোতে প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ।

বেশির ভাগ আহত রোগীরই আঘাত পাওয়া হাত কিংবা পা একটা স্ট্যাণ্ডের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। নিচে থাকে গামলা। ওর মধ্যে রক্ত

আর পুঁজ টপটপ করে পড়ে জমা হয়। দু'তিন ঘণ্টা পর পর পরিষ্কার করা হয় ওগুলো। একজনের দেখলাম ব্যাণ্ডেজ করে টেনে রাখার জন্যে বিছানার পাশ দিয়ে ওজন ঝুলিয়ে দিয়েছে। অন্ত্রে যারা আঘাত পেয়েছে, সারাক্ষণই প্রায় মল দিয়ে ভর্তি থাকে তাদের গামলাগুলো। সার্জনের ক্লার্ক মাঝে মাঝে আমাকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়া হিপ বোন, কাঁধ কিংবা হাঁটুর এক্স-রে রিপোর্ট দেখায়। ওগুলো দেখে বিশ্বাসই হয় না যে এরপরেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আর এ-তো মাত্র একটা হাসপাতাল, তারই একটা মাত্র ওয়ার্ড। সারা জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া জুড়ে এমন হাজার হাজার হাসপাতাল আছে। তারপরেও মানুষ যুদ্ধ করে, হাজার হাজার টর্চার চেম্বার তৈরি করে। এ সমস্ত দেখে মনে হয়, মানুষের হাজার বছরের সভ্যতাও যখন মানুষের এই নৃশংসতা, এই রক্তপাত বন্ধ করতে পারেনি, তখন এ নিয়ে কথা বলা, লেখা বা চিন্তা করাও নিরর্থক। এগুলোর কোন দামই নেই মানুষের কাছে। অথচ একটা হাসপাতাল দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধে মানুষ কতটা হিংস্র হতে পারে, কতটা নির্মম হতে পারে।

কতই বা বয়স আমার, বিশ বছরও পুরো হয়নি, কিন্তু আমার সামনে এখন হতাশা, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য আর দুঃখের বিশাল একটা কালো পর্দা ছাড়া কিছুই নেই। আমি দেখছি, মানুষ কত সহজে একজন আরেকজনকে খুন করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। যাকে কোনদিন দেখেনি, যার সাথে তার কোন বিরোধ নেই, তাকেই খুন করার জন্যে একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত কোন কথা না বলে ছুটে গেছে। তাদের মনে কি একবারও প্রশ্নটা এল না, কেন এই হত্যাকাণ্ড, কেন তাদের এ কাজ করতে হচ্ছে? আমি দেখছি, পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান যারা, তারাই তৈরি করে এসব মারণাস্ত্র আর সুন্দর সুন্দর শব্দমালা, যাতে করে এইসব মারণাস্ত্রগুলো আরও বেশি করে ব্যবহার করা যায়, ওগুলোর উন্নতি করা যায়। এখানে, এই জার্মানীতে কিংবা রাশিয়ায় কিংবা ফ্রান্সে, সারা পৃথিবীতে আমার মত বয়সের যারা, যাদের সামনে জীবনের পুরোটাই পড়ে আছে, তারা দেখছে এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু, এই নৃশংসতা। কি হবে, যদি কোনদিন আমরা, এই তরুণেরা, সেই সব যুদ্ধবাজদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের

সমস্ত কিছুর হিসেব চাই? যুদ্ধশেষে যদি পিতার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, এখন আমাদের কাছে কি চাও? জীবন যখন সত্যিকার অর্থে শুরু হতে গেল, তখন থেকেই বছরের পর বছর শুধু মানুষই মেরে যাচ্ছি আমরা। আমাদের সমস্ত জ্ঞান এখন মানুষ আর মানবতার মৃত্যুতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর পরে কি হবে! আমাদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যাবে?

আমাদের রুমে লিউ-ই বয়সে সবচেয়ে বড়। মাসদশেক ধরে পড়ে আছে এখানে। ওর আঘাতটা ছিল মারাত্মক। অস্ত্রে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিল ও। ডাক্তাররা ওর বাঁচার আশাই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু সবাইকে কলা দেখিয়ে এখনও বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে ও। এবং গত কয়েক সপ্তাহে এতটা সেরে উঠেছে যে ও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াতে পর্যন্ত পারে।

গত কয়েকদিন ধরে খুশিতে একেবারে বাকবাকুম হয়ে আছে ও। ওর বউ থাকে পোল্যাণ্ডে। লিখেছে ভাড়ার পয়সা জমাতে পেরেছে, ওকে দেখতে আসছে।

ওর বউ এরমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, যে কোনদিন এসে পড়তে পারে। লিউ বউয়ের চিন্তায় এতটা মশগুল হয়ে আছে যে, খাওয়া দাওয়াও ঠিকমত করে না। দু'এক চামচ মুখে দিয়েই রেখে দেয়। বউয়ের চিঠি হাতে সারাক্ষণ রুমের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুটছে আর দেখাচ্ছে সবাইকে। এর মধ্যেই একেক জনের দশ বারোবার করে পড়া হয়ে গেছে, ঈশ্বরই জানে, পোস্ট মার্কটা কতবার পরীক্ষা করা হয়েছে। ময়লা, ঘামে ঠিকানা আর পড়ার মত নেই। তবুও ওর উৎসাহে কমতি নেই। ও এত ছুটোছুটি করছিল যে, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই হলো। জ্বর বাধিয়ে বসল ও, ফলে আবার সটান বিছানায়।

বউয়ের সাথে দু'বছর ধরে দেখা নেই ওর। এর মধ্যে একটা বাচ্চা হয়েছে ওদের। বাচ্চাটাকে সাথে করেই আসছে ওর বউ। কিন্তু লিউ-এর মাথার মধ্যে ঘুরছে অন্য চিন্তা। বউ ছেলেকে দেখতে পাচ্ছে, খুব খুশির খবর, কিন্তু দু'বছর পরে বউয়ের সাথে যার দেখা হচ্ছে শুধু চোখের

দেখার চেয়েও বেশি কিছু দরকার তার।

লিউ এ ব্যাপারে কোন রাখঢাক না করেই খোলাখুলি আলোচনা করেছে আমাদের সাথে। সেনাবাহিনীতে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এর মধ্যে সঙ্কোচের কিছু নেই। আমাদের মধ্যে যারা বাইরে যেতে পেরেছে, ওরা বেশ কয়েকটা জায়গার সন্ধান দিলো, যেখানে ওদেরকে কেউ বিরক্ত করবে না। একজন তো একটা ঘরের খবরই জানিয়ে দিল।

কিন্তু এত কিছুর পরে এই হলো যে, লিউ বিছানায় পড়ে,আছে। ওর কথা, যদি এই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যায় তো জীবনে আর থাকলটা কি! আমরা ওকে আশ্বাস দিলাম, কোন না কোনভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ হয়েই যাবে। পরদিন বিকেলে দেখা গেল ওর বউকে। উদ্বিগ্ন, ভীত চোখে পাখির মত বারবার তাকাচ্ছে। বেণী করা কালো একটা ক্লোক পরেছে রিবন দিয়ে, ঈশ্বরই জানে, এসব অদ্ভুত জিনিস কোত্থেকে জোগাড় করেছে ও।

লজ্জায় দরজার কাছে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অস্ফুট গলায় কি জিজ্ঞেস করল তা ও-ই জানে। আসলে ঘরের মধ্যে ছয় ছয়জন পুরুষ মানুষ দেখে ঘাবড়ে গেছে।

'এসো, ভেতরে এসো,' লিউ বিপজ্জনকভাবে ওর গলার শিরা উপশিরা ফুলিয়ে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই, ওরা সবাই আমার বন্ধু।'

ঘরে ঢুকল ও। সবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খোঁজখবর নিল। এরপর বের করল মেয়েটাকে। কোলের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু কোন্ ফাঁকে ন্যাপকিন ভিজিয়ে ফেলেছে। কোল থেকে নামিয়ে, একহাত দিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বড় একটা ন্যাপকিন বের করল ওর মা। ভেজা ন্যাপকিনটা বদলে, নাক মুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিউ-এর কাছে দিল ওকে। বিছানার কাছে বসে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল দু'জনে।

লিউ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই অস্বস্তির সাথে আড়চোখে তাকাতে লাগল আমাদের দিকে।

ওর দুঃখ বুঝলাম। সময়টা চমৎকার। ডাক্তার টহল দিয়ে গেছে, বড়জোর নার্স আসতে পারে একবার। একজন দরজার কাছে গিয়ে উঁকি

মেরে দেখে নিয়ে বলল, 'নাহ্, কোন কাক পক্ষীরও পাত্তা নেই, নিশ্চিন্তে তোমার কাজ শুরু করতে পারো।'

দু'জনে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল। একটু পরেই দেখলাম ওর বউয়ের গাল দুটো লাল হয়ে উঠল, বিব্রতভাবে আমাদের দিকে তাকাল একবার। মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করলাম আমরা। ধুৎ, কি আসে যায় এতে। চুলোয় যাক সব নিয়ম কানুন, ওসব অন্য সময়ের জন্যে। এখনকার কথা আলাদা। বেচারা লিউ–এতদিন পরে ওর বউয়ের দেখা পেয়েছে, ঈশ্বর জানে, আর দেখা হবে কিনা, এখন অত ভদ্রতা করলে কি চলে? ওর দরকার ওর বউকে, ওর বউয়ের দরকার ওকে, ব্যস মিটে গেল।

সুতরাং নেমে পড়লাম কাজে। দু'জন গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে, কাউকে আসতে দেখলেই জানান দেবে, দরকার পড়লে কোন ছুতোয় আটকে রাখবে। পনেরো মিনিট বা সামান্য কিছু বেশি সময় থাকবে ওরা ওভাবে।

লিউ কেবল এক দিক পাশ ফিরতে পারে, তাই একজন ওর একপাশে কয়েকটা বালিশ গুঁজে দিল। ক্রপ ওর মেয়েটাকে নিয়ে আদর করতে লাগল। আমরা ঘুরে বসে জোরে জোরে কথাবার্তা বলে তাস পেটানো শুরু করলাম। চাদরের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো ক্লোক।

ভালমতই হয়ে গেল সবকিছু। তাস পেটাতে পেটাতে লিউ-এর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ পরেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার জুড়ল মেয়েটা। গলা বটে একখানা, একেবারে লাউডস্পিকার। ক্রপ 'এইযে, এইযে, সোনামণি' বলে এদিক ওদিক দোল দিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না।

খেলা থেমে গেল আমাদের। তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতর থেকে খুঁজে পেতে দুধের বোতলটা মুখে দিতেই চিৎকার থেমে গেল ওর। আবার খেলায় মন দিলাম আমরা। খানিক পরেই চাদরের নিচ থেকে বেরিয়ে এল কালো ক্লোক।

হঠাৎ করেই নিজেদেরকে বড়ো একটা পরিবার বলে মনে হলো। সবার প্রতি প্রাণের টান অনুভব করছি সবাই। লিউ-এর বউকে খুশি খুশি

দেখাচ্ছে, লিউ-এর বত্রিশটা দাঁত বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। ঘামে চকচক করছে ওর মুখ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লিউ-এর বউ হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে চমৎকার সসেজ বের করল খানিকটা। লিউ ছুরি দিয়ে ওটাকে টুকরো টুকরো করে কাটল। এককামড়ে বড় একটা টুকরোর সিংহ ভাগ মুখে পুরে দিয়ে অনাবিল একটা হাসি উপহার দিল আমাদের। ওর বউ সসেজ-এর টুকরো নিয়ে প্রত্যেকের বিছানার কাছে গিয়ে বিলি করতে লাগল। সবাইকে দেয়া শেষ হলে, আমাদের যার যার বালিশ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মেয়েটাকে ক্রপের কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে নিল।

কয়েক সপ্তাহ পর থেকে রোজ সকালে হাজিরা দিতে লাগলাম ম্যাসেজ ডিপার্টমেন্টে। ওখানে আমার পায়ের জড়তা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিকঠাক হয়ে গেল সব।

নতুন কনভয় এসেছে ফ্রন্ট লাইন থেকে। এখন ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ সব করা হয় কাগজের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে, কাপড়েরগুলো নেই বললেই চলে।

ক্রপের অবস্থা বেশ ভাল। ঘা-টা প্রায় শুকিয়ে গেছে। আর দিনকয়েক পরেই ওকে পাঠিয়ে দেবে নকল পা লাগানোর জন্যে। এখনও বেশি কথাবার্তা বলে না ও, তবে আগের সেই অস্থিরতাটা আর নেই। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে চুপ হয়ে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। আমার মনে হয় ও যদি এখানে আমাদের সঙ্গে না থাকত, তাহলে অনেক আগেই আত্মহত্যা করত। তবে এখন আর সেই ভয় নেই। আমরা তাস খেলা শুরু করলে মাঝে মাঝে দু'একটা পরামর্শও দেয় ও।

ছুটি পেয়েছি কয়েকদিনের। বাড়ি গেলাম সাথে সাথে। গিয়ে দেখি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে মা, আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম তার চেয়েও অবস্থা অনেক খারাপ। মা এবার কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় পরিষ্কার বুঝলাম, আর কোনদিন দেখতে পাবো না মাকে।

ফেরার পথে ক্রপের সাথে দেখা করলাম। ওর কাছ থেকে বিদায়

নেবার সময় চোখ দিয়ে প্রায় পানি বেরিয়ে এল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে এমন বিদায় তো কতই নিতে হয়!

কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ফ্রন্টে।

এগারো

আর দিন সপ্তাহ গণি না আমরা। যখন এসেছিলাম, তখন ছিল শীত। সমস্ত মাঠঘাট বরফে ঢাকা। গোলা ফাটলে বরফের টুকরোগুলো স্প্লিন্টারের মত ছুটত চারপাশে। এখন বরফ গলছে, গাছে গাছে উঁকি দিয়েছে সবুজ পাতা। আমাদের জীবনে আর কিছু নেই, শুধু ক্যাম্প আর ফ্রন্ট ছাড়া। ক্যাম্প থেকে ফ্রন্টে ছুটি আর ফ্রন্ট থেকে ক্যাম্পে। সংখ্যায় বেশি যাই, ফিরে আসি কম। এই যাওয়া আসায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আসলে যুদ্ধটাও টি-বি, ক্যান্সার, ডায়রিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জার মত একটা রোগ। পার্থক্য কেবল এতে লোক মরে খুব বেশি, খুব তাড়াতাড়ি আর অসহ্য কষ্ট পেয়ে।

আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো যেন একতাল কাদা। সারাক্ষণ বদলে যাচ্ছে। যখন মানুষ মারি, তখন মনে হয় এটাই ঠিক, যখন ক্যাম্পে বসে থাকি, তখন ভেবে দেখি এটা অন্যায়। কোনটাই ফেল না নয়। আর আমাদের চারপাশে সবকিছু কত তাড়াতাড়ি বদলে গেল। কোথায় গেল আমাদের সেই শিক্ষা, সেই মূল্যবোধ, চিন্তা, ধ্যান ধারণা, স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কার। এখন আমাদের একমাত্র পরিচয়, আমরা সৈনিক।

মনে হয়, এ বোধ থেকেই আমাদের জন্ম নিয়েছে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এ যেন সেই বন্ধুত্ব যা শুনতে পাওয়া যায় পুরানো লোক গাথায়, অমৃতের মত যে বন্ধুত্ব উঠে এসেছে জীবনের সমুদ্র মন্থন করে।

আমরা সামান্য জিনিস নিয়েই তৃপ্ত এখানে। সামান্য ব্যাপারেই খুশি

হয়ে উঠি, মেতে উঠি আনন্দ উল্লাসে। কিন্তু এই আনন্দ যে কতটা বীরত্বের কতটা দুঃখের, কেউ জানবে না কোনদিন। এই যেমন দেখা গেল, প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হচ্ছে, এগিয়ে আসছে ফরাসীরা, তার মধ্যেই গপাগপ খেয়ে যাচ্ছে মুলার। কারণ একটাই, খিদে পেয়েছে, খেতে হবে। এখন না খেলে জীবনে আর কোনদিন খাওয়া হবে কি না কে জানে!

এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আলোচনার শেষে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি; জীবন-মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সবচেয়ে জরুরী জিনিসটা ছাড়া বাকিগুলোর কোন মূল্যই নেই আমাদের কাছে। ফ্রন্টে সবার একটাই মাত্র লক্ষ্য, বেঁচে থাকা। সেজন্যে খেতে হবে, অন্যাকে মারতে হবে। এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে গেলে পাগল হয়ে যেতাম, মারা পড়তাম অনেক আগেই।

মাঝে মাঝে আয়নায় ধূসর ছবির মতো আমার আগের দিনগুলো ভেসে ওঠে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ওদের দিকে, এই ছিলাম আমি? সবকিছু এত বদলে গেছে?

ফ্রন্টে জীবনের সমস্ত অনুভূতিগুলো মৃত, একটাই শুধু চিন্তা, বেঁচে থাকতে হবে। এজন্যেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে ভয় পাই না, জীবনের এই শূন্যতা দেখেও ভেঙে পড়ি না হতাশায়। সেজন্যেই হয়তো বেঁচে আছি এখনও।

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে আমাদের বন্ধুত্ব, এ বন্ধুত্ব তো মনের মিল থেকে হয়নি। শুধু একই অবস্থায় পড়েছি বলেই হয়েছে। আমাদের মধ্যে গোলমাল হয়নি কখনও। কিন্তু যে আক্রোশ চাপা আছে আমাদের মধ্যে, যদি কোনদিন সুযোগ পায়, আগ্নেয়গিরির মত লাভার স্রোত বইয়ে দেবে। একেকবার মনে হয় বনমানুষের যুগে ফিরে গেছি আমরা, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়, ওরাও আমাদের চেয়ে ভাল ছিল। ওরা উন্নতির পথ খুঁজে সভ্য হতে চাইত, আমরা আমাদের সমস্ত সভ্যতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আরও অসভ্য হতে চাচ্ছি।

রক্ত, বারুদ আর ধোঁয়ার গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে রাত নামে। চারপাশে যেন অশরীরী প্রেতাত্মার আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। কল্পনা করতে ভয়

হয়, জীবন মৃত্যুর মাঝখানের পর্দাটা কত সূক্ষ্ম, কত অস্পষ্ট এখানে। জীবনটাকে মনে হয় ভাঙা কুটিরের মধ্যে টিমটিমে একটা মাটির প্রদীপ। বাইরে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, এক ফুৎকারে কখন যে নিভিয়ে দেবে প্রদীপটা!

আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে হয়তো প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হলো। চমকে উঠি, আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। আস্তে আস্তে গোলাবৃষ্টি ঘিরে ফেলল আমাদের। তার মধ্যেই কানে আসে কারও গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ, ঘুমোচ্ছে ও। সাথে সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, যাক, আমি একা নই, আমার পাশে আরও কেউ আছে। এখনও বেঁচে আছি আমরা।

যার জোরে এখনও যুদ্ধ করছি, মনে হচ্ছে দিনকে দিন সেটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রথমে ঘটল ডেটারিং-কে নিয়ে।

ডেটারিং মোটামুটি নিজেকে নিয়েই থাকত বেশিরভাগ সময়। একদিন ফ্রন্ট থেকে ক্যাম্পে ফিরছি, ক্যাম্পের কাছে রাস্তার বাঁকটা ঘুরতেই চোখে পড়ল চেরী গাছটা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে ভোরের আলো কেবল চুইয়ে আসছে; সেই আলোয় ফুলে ফুলে ছাওয়া চেরী গাছটাকে অপূর্ব লাগছিল। যেন হীরের মেলা বসেছে ওখানে। ওই দেখাটাই কাল হলো ওর।

বিকেলে ডেটারিংকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পরে দেখা মিলল তার। হাতে ফুল ভর্তি চেরীর ডাল। খানিকক্ষণ হাসাহাসি করলাম ওকে নিয়ে। খেপালাম, ডেটারিং আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে। কোন উত্তরই দিল না ও। গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। রাত্রে খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে ও। কেন জানি না, অস্বাভাবিক কিছু একটার গন্ধ পেলাম। বিছানা থেকে নামলাম। স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'ঝোঁকের মাথায় যা তা একটা কিছু করে বসো না যেন।'

যেন কিছু হয়নি এমনভাবে ও বলল, 'আরে না, কিচ্ছু না, ঘুম আসছে না তাই জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছি।'

'চেরী ফুল আনলে কেন?'

এটুকু কথাতেই খেপে উঠল ও। ঝাঁঝের সাথে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই এনেছি।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার শান্ত স্বরে বলল, 'জানো, বাড়িতে আমার বাগান আছে, ওতে চেরী গাছ আছে একটা। এখন নিশ্চয়ই ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটা। রাতে চাঁদের আলোয় দেখলে মনে হয় রূপোর স্তূপ একটা।'

ওর কষ্টটা বুঝলাম। নরম গলায় বললাম, 'ভাবছ কেন? অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো ছুটি পাবে তুমি। চাই কি গিয়ে আগের মতই চাষবাসও করতে পারবে।'

কথাটা শুনে শুধু মাথা নাড়ল ও। আসলে এ ধরনের লোকজন যখন কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তার মাথার মধ্যে একবার যা ঢোকে, তা আর বেরোয় না।

এক টুকরো রুটি চাইলাম ওর কাছে। কোন কথা না বলে দিয়ে দিল ও। একটু অবাক হলাম। ডেটারিং যেমন কিপটে, তাতে তো এমন হবার কথা নয়। তার মানে ঘাপলা আছে কোথাও।

বিছানায় ফিরে এলাম। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোলাম না, চোখে চোখে রাখলাম ওকে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সকালে অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক রইল ও।

সারাদিন খেয়াল রাখলাম ওর দিকে। সে-ও বুঝতে পেরেছে, আমি তাকে চোখে চোখে রাখছি। ভাব দেখাল যেন কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, উধাও হয়ে গেছে ও।

আমিই প্রথমে খেয়াল করলাম ব্যাপারটা। কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বললাম না। যতটা সময় পায়, পাক্ ও। তাতে যদি ঠিকমতো পার হয়ে যেতে পারে। অনেকেই এর মধ্যে হল্যাণ্ডে চলে গেছে।

কিন্তু রোল কলের সময় সবাই বুঝে গেল যে ও নেই। সপ্তাহ খানেক পর শুনলাম মিলিটারি পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেছে ও। সোজা বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁটছিল এমনি গাধা ও। সবাই বুঝেছিল, কোনদিকে যাবে ও। এ হচ্ছে হোম সিকনেস, বাড়ির জন্যে মন কেমন করা। কিন্তু ফ্রন্ট থেকে যারা কয়েকশো মাইল পেছনে বসে আছে, তাদের কাছে কি

সে কথাটা পৌঁছয়?

এর পরে আর কোন খোঁজখবর পাইনি ওর।

কিন্তু এই একই জিনিস মাঝে মাঝে অন্যভাবে প্রকাশ পায়। মনের সমস্ত ক্ষোভ, দুঃখ কষ্ট বয়লার থেকে বাষ্পের মত বেরিয়ে আসে। বার্জারের এরকম হলো একদিন।

আমাদের ট্রেঞ্চগুলো কিছুদিন হলো ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন যেভাবে যুদ্ধ করি, তাকে সত্যিকার অর্থে ট্রেঞ্চযুদ্ধ বলা যায় কিনা সন্দেহ। সামনে বা পেছনে যাবার সময় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এক গর্ত থেকে অন্য গর্তে ছুটে যাই। এ ভাবেই যুদ্ধ করছি এখন।

একদিন এমনি একটা গোলার গর্তে মাথা গুঁজে আছি, ওদিকে কোনাকুনি ভাবে এগিয়ে আসছে ইংরেজরা, আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলছে আমাদের। তবে অত সহজে হার মানছি না আমরা, কেউ ভাবছেও না তা। পুরো মাঠ ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঢাকা। বুঝতে পারছি, হ্যাণ্ডগ্রেনেড ফাটার শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের মেশিনগানগুলো অর্ধবৃত্তাকারে ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল, বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে কুলিং ওয়াটার। তাড়াতাড়ি প্যান্টের বোতাম খুলে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম বেশ কয়েকজন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কুলিং ওয়াটার জমা হয়ে গেল ওখানে। আবার গর্জে উঠল মেশিনগান, কিন্তু মনে হচ্ছে, পিছন থেকে আওয়াজটা আরও কাছে চলে এসেছে।

মিনিটখানেক পরেই বুঝলাম। ঘেরাও হয়ে গেছি আমরা। সব শেষ এবার। তক্ষুণি, পেছনে, খুব কাছ থেকে গর্জে উঠল আরেকটা মেশিনগান। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল। যারা এগিয়ে এসেছিল আমাদের পেছনে, একেবারে কচুকাটা হয়ে গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি পেছনে আমাদের লোকদের সাথে যোগ দিলাম।

খানিকক্ষণ পর অনেকটা ভাল কাভার নিয়ে ওত পেতে বসে আছি, একজন খবর দিল, কয়েকশো গজ দূরে একটা বার্তাবাহী কুকুর আহত হয়ে পড়ে আছে।

বার্জার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

যে খবর এনেছিল, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিল জায়গাটার। শুনে বার্জার তৈরি হয়ে গেল যাবার জন্যে। হয় ওটাকে নিয়ে আসবে, নয়তো মেরে রেখে আসবে। ছয় মাস আগে হলেও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাত না, কিন্তু এখন অনেক বদলে গেছে ও।

বাধা দিলাম ওকে। এক ধাক্কায় আমাদের সরিয়ে দিয়ে রওনা হলো ও। চিৎকার করে বললাম, 'পাগল হলে নাকি?' কানেই তুলল না কথাটা। ফ্রন্ট লাইনে এরকম পাগলামি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে সাথে সাথে মাটিতে পেড়ে ফেলতে না পারলে কিছুই করা যায় না। কিন্তু বার্জারের ধারেকাছে যাবার সাহস আমাদের নেই। ঝাড়া ছয়ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও।

গোলার গর্ত থেকে বেরিয়ে দু'পা-ও যেতে হলো না, একঝাঁক গুলি এসে শুইয়ে দিল ওকে। রক্ত হিম করা চিৎকার দিয়ে উঠল ও। ফলে যা হবার তাই হলো। গর্তের ভেতরের লোকজন চিৎকার করে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল। একজন তো হাত-পা আর দাঁত দিয়ে মাটিতে খুঁড়তে শুরু করল, ওর মধ্যে লুকোবে বলে।

মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে আজকাল। এতেই বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে কি ঘটছে সবার।

খানিক পরে দেখা গেল নড়াচড়া করছে বার্জার, তার মানে মরেনি ও। আঘাতটা লেগেছে নিতম্বে। ওকে সরাতে গিয়ে পায়ে গুলি খেল একজন।

মুলার মারা গেছে। কেউ তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে পেটে। গুলি খাবার পরেও সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আধঘণ্টা বেঁচে ছিল। সেই সময়টুকু নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে ও।

মারা যাবার আগে ওর নোট বই আর বুটজোড়া দিয়ে গেছে আমাকে। সেই বুটজোড়া, যেটা কেমারিখের কাছ থেকে পেয়েছিল ও। পরে দেখলাম, ঠিকঠাকমত পায়ে লাগল আমার। জাদেনকে কথা দিলাম, আমি মরলে ও পাবে এগুলো।

কোনরকমে মাটিচাপা দিলাম মুলারকে, কিন্তু মনে হয় বেশিক্ষণ শান্তিতে থাকতে পারবে না ও। ক্রমাগত পিছু হটছি আমরা। না হটে কি করব। ওপক্ষে অনেক নতুন ইংরেজ আর আমেরিকান সৈন্য এসেছে। সাথে প্রচুর পরিমাণে খাবার-দাবার, কামান, এরোপ্লেন আর গোলা-বারুদ।

এদিকে আমরা খেতে না পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছি। আমরা এমনিতেই খাবার পাই কম, তারপরে যা পাই, একেবারে জঘন্য। যতসব অখাদ্য কুখাদ্য। যারা খাবার সাপ্লাই দেয়, টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে তারা। মাঝখান থেকে মরছি আমরা। সারাক্ষণ পেট খারাপ হয়েই আছে। একেকজন সারাদিনে কতবার যে ল্যাট্রিনে যায় তার হিসেব নেই। চোখমুখ গর্তে বসে গেছে সবার, হলুদ হয়ে গেছে শরীর, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না কেউ। অধিকাংশই প্রচণ্ড পেট ব্যথায় ঠোঁট কামড়ে আছে। মনে হয় ওইসব লোকদের এনে দেখাই এসব। পরমুহূর্তেই মনে হয় কি লাভ এতে। যারা নিজের দেশের যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন খাবার সাপ্লাই করতে পারে, তাদের বোধ বলতে তো আর কোন কিছু অবশিষ্ট নেই।

আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে গোলাবারুদের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কামানগুলোর ব্যারেল ক্ষয়ে গেছে। ফলে গোলাবর্ষণ মাঝে মাঝে যা করে, অধিকাংশই এলোপাতাড়ি হয়, দু'একটা তো আমাদের মধ্যেই পড়ে। আমাদের ঘোড়ার সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। নতুন রিক্রুটদের চেহারা দেখলে মনে হয় সবক'টা রক্তশূন্যতায় ভুগছে। কোন কাজই হয় না ওদের দিয়ে। তবে মরতে পারে ওরা। হাজারে হাজারে। যুদ্ধের 'য' ও জানে না ওরা। রাইফেল বন্দুক নিয়ে শুধু এগিয়ে যায় গুলি খেয়ে ঝাঁজরা হবার জন্যে।

'জার্মানী শিগ্‌গিরই খালি হয়ে যাবে,' ঘোষণা করল কাট।

এতদিন আশা ছিল, সবকিছু বোধহয় শেষ হতে যাচ্ছে। এখন সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। এখন মরে গেলে নয়তো আহত হয়ে হাসপাতালে না গেলে আর শান্তি আসছে না। তবে হাসপাতালে গিয়ে যদি হাত-পা

কাটা না যায় তো আরেক ঝামেলা। কোন হাতুড়ে সার্জনের হাতে পড়লেই হলো। বুকে ওয়ার সার্ভিস ক্রস ঝুলিয়ে বিজ্ঞের মত বলবে, 'কি, একটা পা ছোট? ঠিক আছে, ফ্রন্টে ফেরত যাও, না হয় নাই দৌড়োলে ওখানে।' ব্যস, পাঠিয়ে দেবে ফ্রন্টে।

কাট একটা গল্প বলেছিল। সেটা এখন সারা ফ্রন্টে সৈন্যদের মুখে মুখে। একবার এক সার্জনের ওপর ভার পড়েছে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া সৈন্যদের পরীক্ষা করার, কাদেরকে আবার যুদ্ধে পাঠানো যাবে। একজন সামনে এল, লিস্ট দেখে নামটা পড়ে মুখ না তুলেই বলল, 'যোগ্য, ওখানে আমাদের সৈন্য দরকার।' একজন একটা কাঠের পা লাগিয়ে তার সামনে আসতেই সার্জন যথারীতি মুখ না তুলেই বলল, 'যোগ্য।'

সৈন্যটি বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি ফ্রন্টে। কিন্তু এবার যদি মাথাটা উড়ে যায় তো ফিরে এসে কাঠের একটা মাথা লাগিয়ে নিয়ে তারপর সার্জন হয়ে বসব।' গল্পটা শুনে হাসিতে গড়াগড়ি খেত সবাই।

আসলে ভাল ডাক্তারও আছে, কিন্তু বেশির ভাগ সৈনিকই পড়ে ওই সব বীরপুঙ্গবদের হাতে যারা সবাইকে 'যোগ্য' করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। ভাবখানা, 'দেখো, এমন চিকিৎসা করেছি যে প্রায় সবাই ভাল হয়ে গেছে। এখন আবার ওরা যুদ্ধে যেতে পারছে।'

এরকম আরও অনেক গল্প চালু আছে ফ্রন্টে। সবগুলোই তিক্ত অভিজ্ঞতার। কিন্তু তার পরেও তো কেউ বিদ্রোহ করে না। সৈনিকদের ওপর এই যে এত অত্যাচার, অবিচার, প্রতারণা, সব মুখ বুজে সহ্য করে সবাই। তারপরেও রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট সৈন্য আসে ফ্রন্টে, ধ্বংস হবে জেনেও আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করে, পিছু হটে।

কিছুদিন হলো ট্যাঙ্ক নামিয়েছে ওরা। এগুলো দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠি সবাই।

এতদিন যারা ওপাশ থেকে গোলা ছুঁড়ত, যদিও চোখে দেখতাম না, তবু জানতাম, ওরাও আমাদের মত মানুষ। কিন্তু এই ট্যাঙ্কগুলো যদিও সচল, কিন্তু এগুলো তো যন্ত্রমাত্র, নির্মম নিষ্ঠুর, মানুষ মারার যন্ত্র।

ট্যাঙ্কের চেনের ঘড়ঘড়ানি বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সমস্ত গর্তগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, আহত, নিহত মানুষকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে ট্যাঙ্ক। আদি অন্তহীন যুদ্ধের মত অবিরাম ঘুরতে থাকে ট্যাঙ্কের চেন।

জীবন যেন শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, গোলা, গ্যাস, আর ট্যাঙ্কের অবিরাম শব্দে ভরা। হিংস্র শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে টাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি, টাইফাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ট্রেঞ্চ, হাসপাতাল, গণকবর, এছাড়া আর সবকিছুর অস্তিত্ব মুছে গেছে জীবন থেকে।

আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার বার্টিঙ্ক মারা গেছে। ফ্রন্ট লাইনে সত্যিকার অর্থে সাহসী, হাতে গোণা যে ক'জন ছিল বার্টিঙ্ক ছিল তাদের মধ্যে সেরা। দু'বছর ধরে আমাদের সাথে ছিল সে কিন্তু কোনদিন গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। মনে হয় একটা মাত্র দিনই যেন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

আমরা একটা গর্ত দখল করে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। খানিকপরে বুঝলাম ঘেরাও হয়ে গেছি। হঠাৎ করে আগুনের ঝলকানির সাথে পেট্রলজাতীয় কিছুর গন্ধ পেতেই চমকে উঠলাম। একটু পরেই দু'জন লোককে দেখা গেল। একজনের পিঠে তেলের ক্যান, অন্যজনের হাতে ফ্লেম থ্রোয়ার। ভয়ে হাত-পা জমে গেল সাথে সাথে। আছি তো গর্তের মধ্যে, আরেকটু কাছে যদি আসতে পারে ওরা, তাহলে রোস্ট বানিয়ে ছাড়বে আমাদের।

গুলি চালানো শুরু করলাম। কিন্তু দমানো গেল না ওদের। ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বার্টিঙ্কও আমাদের সাথেই ছিল। অবস্থা দেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। একটা রাইফেল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেল গর্তের ওপরে। কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগারে চাপ দিল ও। একই সাথে একটা বুলেট ফুটো করে ফেলল ওকে। ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল বার্টিঙ্কের শরীরটা, তবু দাঁতে দাঁত চেপে আবার তাক করল ও। গুলির শব্দ হতেই

হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়ল ওর। শুধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মরেছে।' বলেই হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে। মারা গেছে ও। মরার আগে দু'জনের একজনকে খতম করেছে। সে পড়ে যেতেই তেল ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। দ্বিতীয় জনের হাত থেকে খসে গেছে ফ্লেম থ্রোয়ার। সাথে সাথে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ওখানে। পুড়ে কুঁকড়ে গেল প্রথম জন। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে ভরে উঠল গর্ত। নাকে রুমাল চাপা দিলাম সাথে সাথে। ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল কয়েকজন।

বার্টিঙ্ক-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, বুকের বামদিকে হাতের মুঠোর মত বড় একটা গর্ত। পরমুহূর্তেই বাতাসে তীব্র শিষ কেটে ছুটে এল গোলার একটা টুকরো। সাবধান হবারও সময় পেলাম না। সোজা লিয়ারের নিতম্বে গিয়ে লাগল। মাটিতে গেঁথে যাবার আগে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেল ওর নিতম্বকে। প্রাণফাটানো চিৎকার বেরিয়ে এল লিয়ারের গলা দিয়ে। গর্তের দেয়াল খামচে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ধপ্ করে পড়ল মাটিতে। ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কলকল করে বেরিয়ে এল রক্ত। মিনিট খানেকের মধ্যে মারা গেল লিয়ার।

স্কুলে খুব ভাল অঙ্ক করতে পারত ও।

উনিশশো আঠারোর গ্রীষ্মকাল। দিনগুলো যেন নীল সোনালী রংয়ের দেবদূত। কিন্তু আমাদের কাছে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে সব। এত ভয়াবহ রক্তপাত আগে কখনও হয়নি। প্রত্যেকেই জানি, হেরে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলি না কখনও।

ক্রমাগত পিছু হটছি আমরা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই প্রচণ্ড আক্রমণকে আর প্রতিহত করতে পারব না। আমাদের জনবল নেই, খাবার নেই। গোলাবারুদ নেই, তারপরও ফ্রন্টে যাই, মারা যাই।

এই গ্রীষ্মের আগে জীবনকে এতটা মায়াভরা মনে হয়নি কখনও। বুঝিনি কোনদিন, জীবনকে যে এতটা ভালবাসি। ক্যাম্পের চারপাশে

লাল লাল পপি ফুলে ছেয়ে গেছে, ঘাসের সবুজের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় হালকা ঘাসফুল, ভোরের রহস্যময় আলোয় কালো গাছগুলো হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যেতে চায়। মনে পড়ে কুলকুল বয়ে যাওয়া নদী, ঝিকিমিকি তারার আলো। জীবন এত সুন্দর, এত ভাললাগার?

এই গ্রীষ্মের আগে ফ্রন্টে যেতে এত কষ্ট হয়নি কখনও। গুজব শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধবিরতি আর শান্তির। ফ্রন্টে ফিরে যাবার সময় বুকের মধ্যে কে যেন খামচে ধরে, ফালাফালা করে দেয় একেবারে।

এই গ্রীষ্মের আগে ফ্রন্ট লাইনে কখনও এত ভয়, এত আতঙ্ক বাসা বাঁধেনি বুকে। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে যখন মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম, তখনও এমন হয়নি। এখন ফ্রন্টে গেলেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটা জিনিসই কামনা করি, এখন নয়, এই শেষ মুহূর্তে যেন কিছু ঘটে না যায়।

উনিশশো আঠারোর এই গ্রীষ্মে ক্ষতবিক্ষত মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যায় আশার উষ্ণ হাওয়া, সেই সাথে হতাশা, মৃত্যু, ভয়, অসহিষ্ণুতা আর প্রচণ্ড হাহাকার—কেন? কেন শেষ হয়ে যায় সবকিছু? কেন শান্তির কথাটাই শুধু শুনি?

ওদের রসদ, গোলাবারুদ, সৈন্য, সবকিছু আমাদের চেয়ে অসম্ভব রকমের বেশি। একটা জার্মান প্লেন দেখলেই হলো: আর কথা নেই, কমপক্ষে পাঁচখানা ইংরেজ নয়তো আমেরিকান প্লেন ছুটে আসবে। যেন কুকুর নিয়ে খরগোস শিকার করতে এসেছে। অথবা একজন দুর্বল, শীর্ণ জার্মান সৈনিকের বিরুদ্ধে পাঁচজন তরতাজা সৈনিক গুলি ছুঁড়ছে। আমরা যখন কোনরকমে একটা রুটি পাই, ওদের কাছে তখন পঞ্চাশ টিন মাংস গড়াগড়ি খাচ্ছে। তবুও হার মানিনি আমরা, ওদের চেয়ে আমরা অনেক দক্ষ, অনেক অভিজ্ঞ সৈনিক। আমরা হারছি, কারণ ওদের শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

বর্ষাকাল। আকাশের রং ইস্পাতের মত ধূসর। সারাক্ষণ কাঁদছে তো কাঁদছেই, অঝোর ধারায়। যেন সমস্ত দুঃখ গলে গলে পড়ছে, ঘোলাটে

হয়ে জমা হচ্ছে গর্তে। তার মধ্যে ধূসর মৃত্যুর ছায়া।

বাইরে বেরোনোর সাথে সাথে জামাকাপড় ভিজে একাকার। ওগুলো শুকোনোর অবকাশ পাওয়া যায় না। ফলে ভিজে জামাকাপড় পরে আছি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। যারা গামবুট পরে তারা বুটের একেবারে ওপরে চটের টুকরো বেঁধে নেয় যাতে কাদাপানি ঢুকতে না পারে। প্রত্যেকটা রাইফেলের ওপর চাপ চাপ কাদা, পোশাক তো কাদা থেকে আলাদা করে চেনাই যায় না। সমস্ত কিছু যেন গলে গলে পড়ছে। পৃথিবীটা যেন মস্তবড়ো একটা তৈলাক্ত ডোবা। তার ভেতরটা হলদে হলদে পদার্থ আর রক্তে ভর্তি। যারা মরে গেছে কিংবা আহত অথবা জীবিত, তারা সবাই ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে ডুবে যাচ্ছে ওই পাঁকে।

বিবর্ণ আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার সাথে ঝরে পড়ে গোলার টুকরো। গোলার প্রচণ্ড ঝাপটায় মনে হয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে একেবারে। আহতদের চিৎকারে মনে হয় ধ্বংস হয়ে যাক সমস্ত পৃথিবী। গাঢ় অন্ধকার রাত জীবনের শেষ চিহ্নটুকু শুষে নিয়ে আরও গাঢ় হয়ে ওঠে।

হাত-পা কাদায় মাখামাখি, সারা শরীর কাদায় থকথক করছে। দু'চোখে বৃষ্টির অঝোর ধারা। সত্যিই জানি না, বেঁচে আছি না মরে গেছি। গর্তের মধ্যে ভ্যাপসা গরম। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

একদিন আমরা দু'জন শুধু আছি এক জায়গায়। কাট খাবার আনতে গেছে। বসে আছি ওর জন্যে। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল ওকে। হাতে খাবার। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই দেখলাম মাটিতে পড়ে গেছে ও। মাথার মধ্যে যেন বোমা ফাটল। বুকে হেঁটে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছুটে গেলাম ওর কাছে। দেখলাম হাঁটুটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে। কোনরকমে বেঁধে দিলাম পা-টা। হাহাকার করে উঠল কাট, 'একেবারে শেষ মুহূর্তে...।'

সান্ত্বনা দিলাম ওকে। বললাম, 'তবু তো এখন বেঁচে গেলে তুমি। আর ফ্রন্টে আসতে হবে না। আরও কতদিন যে যুদ্ধ চলবে, কে জানে!'

রক্তে ভিজে যাচ্ছে ব্যাণ্ডেজ, ওকে এখন একা রেখে স্ট্রেচার খুঁজতে

যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ধারেকাছে স্ট্রেচার বাহকের পোস্টটা কোথায়, তা-ও জানি না। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। কাটের ওজন খুব বেশি নয়, ওকে পিঠে করেই নিয়ে যাব। এক ঝটকায় ওকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটলাম ড্রেসিং স্টেশনের দিকে।

বিশ্রাম নেবার জন্যে দু'বার থামলাম রাস্তায়। ঝাঁকুনিতে কাটের যে কী অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু করার নেই। কোন কথা বলছি না ওর সাথে। ঘামে ভিজে গেছে শরীর, কুলকুল করে নামছে বুক বেয়ে। শার্টের বোতাম দুটো খুলে দিলাম। ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন যেতে পারবে?'

'পারতেই হবে!'

'তাহলে চলো।'

হাত ধরে ওঠালাম ওকে। অক্ষত পা-টায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। আহত পা-টা সাবধানে তুলে ধরলাম। তারপর ওর দিকে পিঠ দিয়ে নিচু হতেই পিঠে চড়ে বসল ও। অক্ষত পা-টাকেও বদলদাবা করে ছোটা শুরু করলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর।

ছোটাটা ধীরে ধীরে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। প্রায়ই তীব্র শিষ কেটে গোলা পড়ছে ধারেকাছে। তবুও প্রাণপণে ছুটছি আমি, কারণ রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর পা। মাটির ওপরে রক্তের মোটা একটা ধারা আসছে পেছনে পেছনে।

খানিক পরে অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল যে একটা গোলার গর্তে নেমে পড়া ছাড়া আর উপায় থাকল না। গোলাবর্ষণ না থামলে আর বেরোনো যাবে না। আমার পানির বোতলে চা ছিল, ঢেলে দিলাম ওকে। সিগারেট ধরিয়ে একটা ওকে দিয়ে নিজেও টানতে লাগলাম আরেকটা। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসছে আমার। প্রচণ্ড দুঃখের সাথে বললাম, 'আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

কোন কথা বলল না ও। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। ছলছল করে উঠল ওর চোখদুটো।

'তোমার মনে আছে, কাট, সেই হাঁস চুরির কথা? আর সেই যে আমি যেবার প্রথম আহত হয়েছিলাম, মাঠের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে এনেছিলে আমাকে?' কথাটা শেষ করার আগেই ঝরঝর করে পানি ঝরে পড়ল চোখ থেকে। 'তিন বছর হয়ে গেল, তাই না?'

একটু হাসল ও। চোখের কোণে জমে থাকা পানিটুকু টপ করে পড়ল মাটিতে।

বুকের মধ্যে কেমন খালিখালি লাগল। কাট চলে গেলে আমার বন্ধু বলতে আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

'কাট, তোমার ফিরে আসার আগেই যদি শান্তি এসে যায়, তাহলেও তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে।'

'তোমার কি মনে হয় আবার ফিরে আসতে পারব আমি?' তিক্ত গলায় বলল কাট।

'আমার তো মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। জোড়া তো ঠিকই আছে, খানিকটা বিশ্রাম নিলেই ভাল হয়ে যাবে পা।'

'আরেকটা সিগারেট দাও।'

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম ওকে। বললাম, 'পরে আমরা দু'জনে একসাথে কিছু একটা করব কাট।' কথাগুলো একেবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল আমার। কাট, আমার বন্ধু, সেই ঝুঁকে পড়া কাঁধ, পাতলা গোঁফ, ওকে আমি যতটা জানি, অন্য কাউকে এতটা জানি না। সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলো কাটিয়েছি, ভাবতেই পারি না, তাকে আর দেখব না কোনদিন।

'কাট, তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও। দরকার হলে তোমার বাড়িতে যাব আমি। আমারটা লিখে দিচ্ছি তোমাকে।'

নোটবুক থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে আমার ঠিকানাটা লিখে ওর পকেটে রেখে দিলাম। ওরটা লিখে নিলাম নোটবুকে।

ও আমার পাশে বসে আছে, অথচ মনের গভীরে কে যেন বলছে, আর দেখা হবে না ওর সাথে। গভীর দুঃখে ভেঙে যেতে চাইছে বুকটা। একবার মনে হলো, আমিও গুলি করি না কেন নিজের পায়ে। ওর সাথে

থেকে যেতে পারব তাহলে।

হঠাৎ কাটের গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে উঠল। চট্ করে তাকালাম ওর দিকে। দেখি, কেমন সবুজ আর হলুদ হয়ে গেছে মুখটা। ঢোক গিলতে গিলতে কোনরকমে বলল, 'চলো এবার।'

লাফিয়ে উঠলাম আমি। সাবধানে ওকে পিঠে নিয়ে এবার কিছুটা আস্তে আস্তে দৌড়োতে লাগলাম, যাতে ওর পায়ে বেশি ব্যথা না লাগে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। থুথু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। চোখের সামনে লাল-কালো সব ফুটকি নাচানাচি শুরু করেছে। হাত-পা আর নিজের আয়ত্তে নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাচ্ছে কেউ, কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে। একসময় দেখি পৌঁছে গেছি ড্রেসিং স্টেশনে।

হাঁটুতে একফোঁটা শক্তি নেই আর। বসে পড়লাম মাটিতে। সাবধানে পিঠ থেকে নামালাম কাটকে। খেয়াল রাখলাম ওর ভাল পা-টা যেন আগে পড়ে মাটিতে।

মিনিটখানেক বিশ্রাম নেবার পর ধাতস্থ হলাম খানিকটা। উঠে দাঁড়ালাম। এখনও কাঁপছে হাত-পা। ওয়াটার বটলটা ধরতে বেশ কষ্ট করতে হলো। শেষ পর্যন্ত খুলতে পারলাম ওটা। যতটুকু চা ছিল শেষ করে ফেললাম। মাথার মধ্যে এখনও ধোঁয়াটে লাগছে, তার মধ্যেই খুশির ঝিলিক দিচ্ছে একটা, 'কাটকে নিয়ে আসতে পেরেছি, বেঁচে যাবে ও।'

আমার চারপাশে আওয়াজ হচ্ছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে, এতক্ষণে খেয়াল করলাম মানুষের গলা ওগুলো।

'এত কষ্ট না করলেও পারতে,' একজনের কথা শুনে তাকিয়ে দেখি হাসপাতালের আর্দালি। আমি তাকাতেই কাটের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'মরে কাঠ হয়ে গেছে।'

কথাটা মাথায় ঢুকল না আমার। ওকে বললাম, 'হাঁটুতে ঘা খেয়েছে ও।'

'হ্যাঁ, হাঁটুতেও ঘা খেয়েছে।'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। এখনও কিছুই মাথায় ঢোকেনি আমার। বিভ্রান্তভাবে তাকালাম চারদিকে। চোখের মধ্যে

ঘাম ঢুকতেই জ্বালা করে উঠল। চোখ মুছে তাকালাম কাটের দিকে। একইভাবে শুয়ে আছে ও। দ্রুত বললাম, 'অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

হালকা শিষ দিয়ে উঠল আর্দালিটা, 'তোমার চেয়ে ভাল জানি আমি। বাজি ধরতে চাও?'

বোকার মত মাথা নাড়ালাম আমি, 'তা কি করে হয়। দশ মিনিট আগেও কথা বলেছি ওর সাথে। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

কাটের হাতগুলো এখনও গরম। ওর কপালের কাছে একটু ঘষে দিতে চাইলাম। ওর মাথাটা ধরে উঁচু করতেই হাতটা কেমন ভেজা ভেজা লাগল। হাতটা মাথার নিচ থেকে বের করে আনলাম, রক্ত লেগে আছে হাতে।

'বলেছিলাম না,' শিষ দিয়ে বলে উঠল আর্দালি।

আসার পথে টেরই পাইনি কখন একটা স্‌প্লিন্টার ঢুকে গেছে ওর খুলিতে। খুব ছোট্ট একটা স্‌প্লিন্টার, খুলির মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটো।

আমার বন্ধু কাট নেই।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম।

ল্যান্স কর্পোরাল জিজ্ঞেস করল, 'ওর সবকিছু নিয়ে যেতে চাও?'

মাথা নাড়লাম শুধু। কর্পোরাল কাটের জিনিসগুলো দিয়ে দিল আমাকে।

আর্দালি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আত্মীয় নাকি?'

না, না, ও আমার আত্মীয় নয়, কাট কেন আমার আত্মীয় হতে যাবে? আমার কোন আত্মীয় নেই, কোন আত্মীয় নেই।

আমি কি এখনও পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি? আমি কি এখনও হাঁটছি? চোখ তুললাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন বনের কাছে চলে এসেছি, নিজেও জানি না। পায়ের ওপর ছেড়ে দিলাম নিজেকে। চারপাশে পপি ফুলের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, গাছে গাছে পাতার মর্মর ধ্বনি, নীল আকাশ। সব তেমনি আছে, শুধু আমার বন্ধু কাট নেই।

বারো

শরৎকাল এসে গেছে। পুরানোদের মধ্যে বেশি কেউ নেই। আমাদের ক্লাসের সাতজনের মধ্যে আমিই কেবল বেঁচে আছি।

সবাই বলছে যুদ্ধবিরতির কথা, শান্তির কথা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এবারেও যদি দেখা যায় সব মিথ্যা, সব গুজব, ভেঙে পড়বে সবাই। আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করতে পারবে না কেউ। যদি শান্তি না আসে, বিদ্রোহ করবে সবাই।

চোদ্দ দিনের জন্যে বিশ্রাম পেয়েছি। খানিকটা গ্যাস ঢুকে গিয়েছিল ফুসফুসে। ছোট্ট বাগানে সারাদিন বসে থাকি। আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, যুদ্ধবিরতি হচ্ছে, শান্তি আসছে। ঠিক করেছি, বাড়ি যাব সোজা। কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা থেমে যায় এরপরই। মনের মধ্যে ভিড় করে আসে সব স্মৃতি, জীবনকে বড়ো ভালবাসতে ইচ্ছে করে, বাড়ির কথা মনে পড়ে খুব। মুক্তির কথা ভাবলে শিরায় শিরায় নেচে ওঠে রক্ত। সব আছে, কিন্তু জীবনের কোন লক্ষ্য খুঁজে পাই না।

যদি দু'বছর আগে ফিরতে পারতাম, তাহলে ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারতাম সব। কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। এবার যখন ফিরে যাব তখন আমরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত, উন্মূল, হতাশার প্রতিচ্ছবি। আমরা আর কোনদিনই খুঁজে পাব না জীবনের স্রোতধারা।

ফিরে যাবার পর কেউ আমাদের বুঝবে না, বুঝতে চাইবেও না হয়তো। আমাদের আগের জেনারেশন যুদ্ধ থেকে সোজা ফিরে যাবে তাদের আগের পেশায়। যুদ্ধের স্মৃতি মনেই থাকবে না আর। আমাদের পরের জেনারেশনের কাছে আমরা হয়ে যাব অদ্ভুত কিছু একটা, দূর

থেকে দেখবে ওরা আমাদের, কাছে টানবে না কখনও। তার মানে বিচ্ছিন্নভাবে ভেসে বেড়াব আমরা, কোথাও শেকড় নামাতে পারব না কখনও। কেউ কেউ আপোস করে নেবে জীবনের সাথে, কেউ হাল ছেড়ে দেবে, কেউ বন্য আক্রোশে তছনছ করতে চাইবে সবকিছু। কিন্তু সবার জন্যে একই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তিলে তিলে আত্মধ্বংস।

কিন্তু এমন তো নাও হতে পারে! হয়তো সবই আমার বিষণ্ন মনের কল্পনা। আবার যখন আমি পপলার বীথির নিচে দাঁড়িয়ে শুনব হাওয়ার সঙ্গে পাতার খেলা, কুলকুল করে বয়ে যাবে নদী, নীল আকাশে দেখব শাদা মেঘের ভেলা, তখন এসব চিন্তা হয়তো ধুলোর মত কোথায় উড়ে যাবে। এই যে রক্তে তারুণ্যের তুমুল মাতামাতি। অজানা অচেনা রোমাঞ্চে ভরা ভবিষ্যতের হাজারো কল্পনা, মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নের মত সুন্দর ছবি, ভালবাসার স্বপ্নিল হাতছানি, সে কি যুদ্ধের দিনগুলোর স্রোতে ভেসে যেতে পারে?

গাছে গাছে সোনার মত পাতা, হাওয়ায় হাওয়ায় উচ্ছল, সবুজ পাতার ফাঁকে লাল রোয়ান বেরীর মিষ্টি হাসি, ধুলোয় ভরা রাস্তাটা মিশেছে দিগন্তে, চারপাশে শান্তির গুঞ্জন।

উঠে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ শান্ত আর নিশ্চিন্ত আমি। আসুক, মাস বছরগুলো আসুক। ওরা আমার কাছ থেকে আর কিছুই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমি এত নিঃসঙ্গ, এত রিক্ত যে ভবিষ্যৎকে ভয় পাবার মত কিছু নেই আমার। মনের যে শক্তিতে পার হয়ে এলাম এতগুলো বছর, সে এখনও আছে আমার সাথে। সে শক্তিকে পোষ মানাতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু যতক্ষণ সে আছে, আমি জানি, আমার মনের শত বাধার মধ্যেও সে নিজের পথ ঠিকই খুঁজে নেবে।

অক্টোবর, উনিশশো আঠারো।

অসম্ভব শান্ত একটা দিন। ঝকঝকে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে শাদার ছোপ। বাতাস বইছে মৃদুমৃদু। ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দু এখনও শুকোয়নি। লাল লাল ফুলগুলোর ওপর ছোটাছুটি করছে দুটো রঙিন

প্রজাপতি। নির্মল বাতাস, বারুদের গন্ধ নেই, গোলার গর্জন নেই। চারদিকে এমন নিঃশব্দ যে একটা মাত্র লাইনে শেষ হয়েছে আর্মি রিপোর্ট: 'পশ্চিম রণাঙ্গন সম্পূর্ণ শান্ত'(All Quiet On The Western Front)।

গাছটার নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পল, যেন ঘুমিয়ে আছে। ওকে যখন ওল্টানো হলো, দেখা গেল মুখে তখনও হাসি লেগে আছে একটুকরো। যেন কোন কষ্টই পায়নি ও। যেন জেনেই গেছে, সব শেষ হতে চলেছে।

প্রজাপতি দুটো উড়েই চলেছে ফুলে ফুলে।

* * *

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan